NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিস্যাৎ করতে পারি।

—**সুভাষচন্দ্র বসু**

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—**Subhas Chandra Bose**

Price: ₹400.00
[Not for sale]

Printed at Gita Printers, 51A, Jhamapukur Lane, Kolkata 700009

6

CBCS • UG • HBG • BENGALI • CC-BG-06

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

SELF LEARNING MATERIAL

UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMME

HBG 6

CC-BG-06

HONOURS IN BENGALI

ছন্দ, অলঙ্কার ও ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাণ্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

'UGC (Open and Distance Learning programmes and Online Programmes Regulations, 2020' অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক— উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন— যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) রঞ্জন চক্রবর্তী
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

স্নাতক পাঠক্রম

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
Subject : BENGALI

কোর কোর্স : ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার

কোর্স কোড : CC-BG-06

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, 2023

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত ।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

Netaji Subhas Open University

স্নাতক পাঠক্রম

Choice Based Credit System (CBCS)

Subject : BENGALI

কোর কোর্স : ছন্দ, অলঙ্কার ও ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব

কোর্স কোড : CC-BG-06

কোর কোর্স ঃ ০৬	লেখক	সম্পাদক
মডিউল ঃ ১ ও ২ Module : 1 & 2 বাংলা ছন্দ ও অলঙ্কার	ড. আশিস খাস্তগির সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল ঃ ৩ Module : 3	অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	

ঃ স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি ঃ

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ
বাণীমঞ্জরী দাস, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বেথুন কলেজ, কলিকাতা
ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গালর্স কলেজ, কলিকাতা
ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা
আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ ও
অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ড. অসিত বরণ আইচ
কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

Netaji Subhas
Open University

UG : Bengali
(HBG)

Choice Based Credit System (CBCS)
Subject : BENGALI
ছন্দ, অলঙ্কার ও ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব
কোর্স কোড : CC-BG-06

মডিউল - ১ ঃ বাংলা ছন্দ

একক ১-২	❑ বাংলা ছন্দের পরিভাষা	৯
একক ৩	❑ বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ	৩৪
একক ৪	❑ বাংলা ছন্দোবন্ধ	৪৬
একক ৫-৭	❑ বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ	৬১

মডিউল - ২ : বাংলা অলঙ্কার

একক ৮	❑ অলঙ্কার কী ও তার প্রকারভেদ	১০৩
একক ৯-১০	❑ শব্দালংকার	১০৬
একক ১১	❑ অর্থালংকার	১২৭
একক ১২	❑ বিরোধমূলক অর্থালংকার	১৬১
একক ১৩-১৪	❑ অলঙ্কার নির্ণয়	১৭১

মডিউল - ৩ : ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব

একক ১৫	❑ ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের বিভিন্ন প্রস্থান	১৯৪
একক ১৬	❑ অলংকারবাদ	২০৭
একক ১৭	❑ রীতিবাদ	২১৬
একক ১৮	❑ বক্রোক্তিবাদ	২২২
একক ১৯	❑ ধ্বনিবাদ	২২৯
একক ২০	❑ রসবাদ	২৩৭

মডিউল - ১

বাংলা ছন্দ

একক ১-২ : বাংলা ছন্দের পরিভাষা

একক গঠন :

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ মূলপাঠ : বাংলা ছন্দের পরিভাষা

১.৩.১ বর্ণ, ধ্বনি

১.৩.২ অক্ষর, দল

১.৩.২.১ মুক্তদল

১.৩.২.২ রুদ্ধদল

১.৩.৩ মাত্রা, কলা

১.৩.৪ যতি, ছেদ

১.৩.৫ পর্ব, অতিপর্ব

১.৩.৬ উপপর্ব

১.৩.৭ পদ

১.৩.৮ পঙ্‌ক্তি

১.৩.৯ স্তবক, শ্লোক

১.৩.১০ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ

১.৩.১১ মিল

১.৩.১২ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল বাংলা কবিতায় ছন্দ-প্রয়োগের পরিচিতির প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ। ছন্দবিচার বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন ছন্দের পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে পরিচিতি। এর সাহায্যেই শিক্ষার্থীর ছন্দের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার ঘটবে। এই এককে আমরা দেখে নেব পারিভাষিক শব্দগুলির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা। সঙ্গে থাকবে বোধযোগ্য উদাহরণ।

১.২ প্রস্তাবনা

ছন্দ নিয়ে আলোচনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছন্দ-পরিভাষা ও ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই বিতর্ক এড়ানোর একমাত্র উপায় হল এমন নির্দিষ্ট কিছু পরিভাষা, যা সবার কাছে মান্য হতে পারে, যার প্রয়োগে বাংলা ছন্দের সূত্র এবং তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীর কাছে একটিমাত্র রূপ নিয়ে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হতে পারে। বাংলা ছন্দচর্চায় অগ্রণী ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন আর অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা দুটি পৃথক স্রোতে প্রবাহিত হলেও কিছু কিছু পরিভাষা দুজনের কাছেই গ্রাহ্য, অবশ্য অনেকগুলিই রূপে বা অর্থে পৃথক।

ছন্দ :

'ছন্দ' বলতে আমরা কী বুঝি? প্রথমেই বলি, মুখের ভাষায় 'ছাঁদ' শব্দটি এসেছে 'ছন্দ' থেকে। অর্থাৎ সাধারণভাবে ছন্দ হল নির্দিষ্ট গড়ন। এই গড়নের নিয়ম আছে, রীতি আছে, পদ্ধতি আছে। সেই সব নিয়ম, রীতি, পদ্ধতি দ্বারা গড়নটিকে করে তুলতে হয় সুন্দর। দর্শন এবং শ্রবণ — এই দুয়ের মাধ্যমেই আমরা বস্তু বা অ-বস্তুর গড়ন-সৌন্দর্য অনুভব করে থাকি। বস্তু বলতে তা হতে পারে শারীরিক বা অন্য কিছু দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়। অন্যদিকে দর্শন আর শ্রবণের সমবায়ে ধরা পড়ে ভাষারূপের গড়ন-সৌন্দর্য। ভাষারূপ বলতে বোঝাতে চাইছি মুখের ভাষা এবং লিখিত ভাষা—দুই-কেই। কিন্তু 'ছন্দ' যখন পারিভাষিক রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তখন শুধুমাত্র লিখিত ভাষার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে লিখিত ভাষার কাব্যরূপের গড়ন-সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা-বিচার-বিশ্লেষণই ছন্দের আওতায় বাঁধা পড়ে।

কবিতাকে শ্রুতিমধুর করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতিকে কেউ বলতে চান 'ছন্দ'। কারোর মতে ছন্দ হল 'উচ্চারণ আর বিরামের সুশৃঙ্খল আবর্তনময় বিন্যাস'। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে 'সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্‌বিন্যাসের নাম ছন্দ। 'শৃঙ্খলা', 'পরিমিতি', 'নিয়ন্ত্রণ' যা-ই বলি না কেন, ছন্দের মূল কথা এক নিয়মবদ্ধ প্রণালী। এই রীতি, শৃঙ্খলা, বিন্যাসের পদ্ধতি জানতে হলে প্রথমেই আমাদের জেনে নিতে হবে নির্দিষ্ট কিছু পারিভাষিক শব্দের পরিচয়, যা দিয়ে গড়ে ওঠে ছন্দের শরীরী গঠন।

১.৩ মূলপাঠ ও ছন্দের পরিভাষা

১.৩.১ বর্ণ, ধ্বনি

আমরা যা উচ্চারণ করি, তার লিখিত চিহ্নের নাম হরফ বা বর্ণ। অর্থাৎ, ধ্বনির লিখিত রূপকেই বর্ণ বলে। বর্ণের উচ্চারিত রূপটিই ধ্বনি। ছান্দসিকের ভাষায় বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ। এ কথা প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় দুজনেই মানেন। কিন্তু, 'ধ্বনি' বোঝাতে দুজনেই অনেক সময় 'বর্ণ' কথাটি প্রয়োগ করে থাকেন। প্রবোধচন্দ্র বর্ণকে বা ধ্বনিকে সরাসরি স্বর-ব্যঞ্জনে ভাগ

করেননি। তিনি বাংলা বর্ণ আর ধ্বনিকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, রুদ্ধস্বর আর ব্যঞ্জন। মুক্তস্বর ছ-টি—অ আ ই উ এ ও। যে কোনো মুক্তস্বর বাংলা উচ্চারণের হ্রস্ব হতে পারে, দীর্ঘও হতে পারে। অন্য স্বরের সহায়তা ছাড়াই এদের উচ্চারণ সম্ভব। ইউ এ ও—এই চারটি স্বর কখনও কখনও পরনির্ভর হয়ে পড়ে। তখনই তার খণ্ডস্বর। তখন তাদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়। 'মুক্ত আ'-এর পাশে খণ্ড 'ই' আশ্রয় নিলেই তৈরি হয় 'আ-ই' (খাই, নাই)। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তস্বরের দরজাটি রুদ্ধ হয়ে যায়, তৈরি হয় রুদ্ধস্বর 'আই'। 'রুদ্ধস্বর হচ্ছে একটি মুক্তস্বর আর একটি খণ্ডস্বরের যৌথ উচ্চারণ।

অমূল্যধন ভাগ করেছেন ২টি শ্রেণিতেস্বর আর ব্যঞ্জন, স্বরের ২টি ভাগ—মৌলিক আর যৌগিক। অমূল্যধনের বিচারে 'বর্ণ' হচ্ছে 'লিখিত হরফ'। বর্ণকে বা ধ্বনিকে তিনি অবশ্য পরোক্ষে স্বর আর ব্যঞ্জনেই ভাগ করেছেন। স্বরধ্বনি তার কাছে দুটি জাতিতে বিভক্ত—মৌলিক আর যৌগিক। অ আ ই উ অ্যা এ ও—এই ৭টি মৌলিক স্বর, ওই আই আও ইত্যাদি যৌগিক স্বর। দেখা গেল, প্রবোধচন্দ্রের ৬টি মুক্তস্বরই অমূল্যধনের কাছে মৌলিক স্বরধ্বনি, অমূল্যধনের 'অ্যা' স্বরধ্বনিটি কেবল প্রবোধচন্দ্রের তালিকার বাইরে। আর, প্রবোধচন্দ্রের রুদ্ধস্বরের সঙ্গেও অমূল্যধনের যৌগিক স্বরের পার্থক্য খুব বেশি নেই। বাংলা কবিতায় কবি ব্যবহার করেন ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, পাঠক উচ্চারণ করেন ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি।

১.৩.২ অক্ষর, দল

আমাদের এক একটা ধ্বনির উচ্চারণ বাগ্‌যন্ত্রের নানা অংশের মিলিত চেষ্টার ফল। একটানা কথা বলতে গেলে ধ্বনিগুলি পৃথকভাবে আমাদের কানে ধরা পড়ে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ২টি-৩টি ধ্বনির একসঙ্গে উচ্চারণ হয়ে যায়, কখনো-সখনো একটি ধ্বনিরই উচ্চারণ হয়। এক এক বারের চেষ্টার যে-কটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, ইংরেজিতে তার নাম Syllable, বাংলায় একে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন দল, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন অক্ষর।

প্রবোধচন্দ্র Syllable-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অক্ষর' কথাটির বদলে 'দল' কথাটি ব্যবহার করেন। তার মতে দল হচ্ছে 'বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ড। দল' 'ছন্দ' আর 'ছান্দসিক' শব্দ তিনটি ভেঙে তিনি দেখালেন ১টি (দল্‌), ২টি (ছন্‌-দ) আর ৩টি (ছান্‌-দ-সিক্‌) দল। প্রতিটি দলে থাকবে একটিমাত্র স্বরধ্বনি (মুক্ত বা রুদ্ধ। যা-ই হোক), ব্যঞ্জন থাক বা না-থাক। যেসব দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর, তার নাম মুক্তদল; আর, যে দলের শেষে রুদ্ধস্বর (বৈ=ব্‌-ঐ, গৌ=গ্‌-ঔ, সাই=স্‌-আই) বা ব্যঞ্জনধ্বনি (অ-গ্‌, আ-ল্‌, ই-ন্‌), তার নাম রুদ্ধদল।

অমূল্যধনের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি এই রকম ঃ 'বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর।' ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে অক্ষর হচ্ছে বাক্যের অণু। একটি শব্দ ভাঙলে তা থেকে পাওয়া যাবে কয়েকটি অক্ষর। অমূল্যধন শ্রেণিদুটির নাম দিলেন 'স্বরান্ত' (শেষে স্বরধ্বনি আছে বলে) আর 'হলন্ত'

(শেযে যার ব্যঞ্জনধ্বনি)। তবে অক্ষরের শেষধ্বনি যৌগিক স্বর হলেও তাকে হলন্ত-ই বলা হবে। স্বরান্ত অক্ষরের শেষধ্বনি কখনো ব্যঞ্জন, কখনো যৌগিক স্বর।।

অমূল্যধনের 'অক্ষর' আর প্রবোধচন্দ্রের 'দল' একই। অমূল্যধনের 'স্বরান্ত অক্ষর'-ই প্রবোধচন্দ্রের 'মুক্তদল', আর অমূল্যধনের 'হলন্ত অক্ষর' প্রবোধচন্দ্রের ভাষায় 'রুদ্ধদল'। যেসব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে, তার নাম অমূল্যধনের ভাষায় 'স্বরান্ত অক্ষর'। অক্ষরের শেষধ্বনি ব্যঞ্জন বা যৌগিক স্বর হলে তিনি তাকে বলেন 'হলন্ত অক্ষর'।

'দল'-এর অবস্থান বিষয়ে দু'চার কথা—

আদি মুক্তদল—শব্দের আদিতে অবস্থিত মুক্তদল। যেমন, সমাপ্ত, দিগন্ত, চমৎকার, কখন ইত্যাদি।

মধ্য মুক্তদল—শব্দমধ্যে অবস্থিত মুক্তদল। যেমন, যুবতী, থমকি, শুনিয়া, পেয়েছি, জুড়ালে ইত্যাদি।

অন্ত্য মুক্তদল—শব্দান্তে অবস্থিত মুক্তদল। যেমন, জগতে, কাছে, যাচে ইত্যাদি।

একক মুক্তদল—যখন শব্দটিই একটি মুক্তদল। যেমন, সে, ও, তা, যে, মা ইত্যাদি।

আদি রুদ্ধদল—শব্দের আদিতে অবস্থিত রুদ্ধদল। যেমন, প্রশ্ন - (প্রশ্.ন), কণ্ঠ - (কণ্.ঠ), চন্দ্র - (চন্.দ্র) ইত্যাদি।

মধ্য রুদ্ধদল—শব্দমধ্যে অবস্থিত রুদ্ধদল। যেমন, সুগন্ধ, চিরজন্ম, সমাপ্ত ইত্যাদি।

অন্ত্য রুদ্ধদল—শব্দান্তে অবস্থিত রুদ্ধদল। যেমন, চালক, যৌগিক, নীরব, কোকিল, ময়ূর ইত্যাদি।

একক রুদ্ধদল—যখন শব্দটিই একটি রুদ্ধদল। যেমন, তাই, নেই, সব, ঠিক, যাক, বন ইত্যাদি।

১.৩.৩ মাত্রা, কলা

'মাত্রা' পরিভাষার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা চমৎকার দিয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন। তিনি বলেছেন—'মাত্রা' মানে আদর্শ মান। অর্থাৎ যে স্বল্পায়তন বস্তুর আনুপাতিক সংখ্যা গণনা করে কোনো বৃহত্তর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, তাকে বলা হয় 'মাত্রা'। ব্যাখ্যা করে আরও বলেছেন মাত্রা মানে পরিমাপক বা পরিমাণ-নির্ণায়ক। তবে ছন্দের 'বন্ধ' বা 'রীতি' ভেদে তার মাত্রাও হয় ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, পঙ্‌ক্তির মাত্রা পদ, পদের মাত্রা পর্ব। যেমন, দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি, ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি, চৌপদী পঙ্‌ক্তি; দ্বিপর্বিক পদ, ত্রিপর্বিক পদ ইত্যাদি। আবার কখনো পর্বের মাত্রা 'দল', কখনো বা 'কলা'। এ কারণে এই দুই রকম মাত্রাকে বলা হয় 'দলমাত্রা' বা 'কলামাত্রা'। অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কালপরিমাণ, অবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনিপরিমাণ। প্রবোধচন্দ্র স্পষ্ট করে বলেছেন 'ছন্দের কারবার ধ্বনিপরিমাণ নিয়ে, কালপরিমাণ নিয়ে নয়।

মুক্তদলের উচ্চারণ সাধারণত কাটা-কাটা, আর রুদ্ধদলের উচ্চারণ কেটে কেটেও হয়, টেনে টেনেও হয়। এ কথার অর্থ—মুক্তদল সাধারণ ১-মাত্রার, আর রুদ্ধদল ১-মাত্রার বা ২-মাত্রার। কোন্ অক্ষরে বা দলে কত মাত্রা, এ নিয়ে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্র কার্যত কোনও বিরোধ নেই।

দল হ্রস্ব হয় তখনই, যখন তার ভেতরকার ধ্বনি একটুখানি কুঁচকে যায়। আর দলের দীর্ঘ হওয়ার অর্থ

ধ্বনিগুলির আয়তনে বেড়ে যাওয়া। এইরকম একটি কোঁচকানো বা হ্রস্ব দলের সমপরিমাণ ধ্বনির নাম প্রবোধচন্দ্র দিয়েছেন কলা। অর্থাৎ একটি হ্রস্বদলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, একটি দীর্ঘদলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, মাত্রার আর কলার সম্পর্কটা দাঁড়াল এই রকম-প্রতিটি হ্রস্ব দলে থাকে প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ১-কলা, অমূল্যধনের হিসেবে ১-মাত্রা; প্রতি দীর্ঘ এঁদের হিসেবে ২-কলা বা ২-মাত্রা। অর্থাৎ, মাত্রা আর কলা কার্যত একই।

এবার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

প্রথমে চার মাত্রার পর্ব। চতুর্মাত্রক পর্ব তিন রীতিতেই সাধারণতঃ দুটি সমায়তন উপপর্বে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ তিন রীতিতেই চার মাত্রার পর্বে দুটি করে দ্বিমাত্রক উপপর্ব থাকে। দৃষ্টান্ত—

ক. দলবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্ব

১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১।। ১ ১ ১ ১ । ১ ১
বাহুর : দন্ত। রাহুর : মতো ।। একটু : সময় । পেলে 8+8। 8+২
১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১ ১ । ১ ১
নিত্য : কালের । সূর্য : কে সে।। এক গ : রাসে। গেলে। 8+8। 8+২
১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১ ১ । ১ ১
নিমেষ : পরেই। উগরে : দিয়ে । মিলায় : ছায়ার। মতো, 8+8। 8+২
১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১ ১ । ১ ১
সূর্য : দেবের। গায়ে : কোথাও।। রয় না : কোনো। ক্ষত। 8+8। 8+২
—পূরবী, চিঠি

খ. কলাবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্ব (8+8। 8+২)

২ ১১ । ১১ ১১ ।। ২ ২ । ১ ১
দুন্ : দুভি। বেজে : ওঠে।। ডিম্ : ডিম্ । রবে, 8+8 । 8+২
২ ২ । ২ ১ ১ ।। ২ ২ । ১১
সাঁও : তাল। পল্ : লীতে।। উৎ : সব । হবে।... 8+8 । 8+২
২ ১১ । ১১ ১১ ।। ২ ২ । ২
ওই : শুনি । পথে : পথে।। হৈ : হৈ। ডাক, 8+8 । 8+২
২ ২। ১১ ১১ । ১১ ২ । ২
বং : শীর। সুরে : তালে। বাজে : ঢোল। ঢাক। 8+8 । 8+২
২ ১১ । ২ ২ ।। ২ ২ । ২
নন্ : দিত । কণ : ঠের।। হাস্ : স্যের। রোল 8+8 । 8+২

২ ১১ । ১১ ১১ ।। ২ ২ । ২

অম্ : বর । তলে : দিল ।। উল্ : লাস্ । দোল। ৪+৪ । ৪+২

—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

গ. মিশ্রবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্ব (৪+৪। ৪+২)

১১ ১১ । ১১ ১১ । ১১ ২ । ১১

সাধু : মহা। রেগে : বলে। যৌব : নের। পাতে

১১ ১১। ১১ ১১ ।। ১১ ১১। ১১

এত : পুণ্য। কেন : লেখ।। দেব : পূজা। খাতে।

১১ ১১ । ১১ ১১ ১১ ১১ । ১১

চিত্র : গুপ্ত। হেসে : বলে, বড় : শক্ত। বুঝা

১১ ১১ । ১১ ১১ ১১ ১১ । ১১

যারে : বলে। ভালো : বাসা, তারে : বলে। পূজা।

—চৈতালি, পুণ্যের হিসাব

এই চতুর্মাত্রক পর্বই বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ বাহন।

পঞ্চমাত্রক পর্ব

দলবৃত্ত রীতিতে পঞ্চমাত্রক পর্বের প্রয়োগ নেই। অধুনাপূর্ব কালের মিশ্র কলাবৃত্ত রচনায় পঞ্চমাত্রক পর্ব প্রয়োগের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও পাওয়া যায়। পঞ্চমাত্রক পর্ব রবীন্দ্রনাথের হাতে মিশ্র কলাবৃত্ত রীতি থেকে রূপান্তরিত হয়েছে অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে। শুধু রূপান্তরিত নয়, পঞ্চমাত্রক পর্ব তার হাতেই অসামান্য শক্তি ও সৌন্দর্যলাভ করেছে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকেও বোঝা যাবে।

১. কলাবৃত্ত রীতিতে পঞ্চমাত্রক পর্ব

১১১ ১১ । ১২১ ১ ।। ১১ ১ ২ । ২ ১ ১

ভরিয়া উঠে। নিখিল ভব।। রতি-বিলাপ'।-সঙ্গীতে,

১ ২ ২ । ১ ১১ ১ ১ ।। ১১১

সকল দিক কঁদিয়া উঠে। আপনি।

১ ২ ১ ১ । ১ ২ ১ ১ ১ ১১ ২ । ২ ১ ১

ফাগুন মাসে। নিমেষ-মাঝে না জানি কার। ইঙ্গিতে

১১১ ১১। ১১১ ১১। ১১১

শিহরি উঠি। মূরছি পড়ে। অবনী।

১ ১ ১ ২ । ১ ১ ১ ১১ ।। ১ ২ ১১ । ২১১

আজিকে তাই। বুঝিতে নারি কিসের বাজে। যন্ত্রণা

১ ২১১ । ২ ১ ১১ । ১১১
হৃদয়বীণা। -যন্ত্রে মহা পুলকে,
১১১ ১১। ১১১ ১১ ১ ২ ১ ১ ২১১
তরুণী বসি। ভাবিয়া মরে।। কী দেয় তারে। মন্ত্রণা
১১ ১ ১১ । ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
মিলিয়া সবে। দ্যুলোকে আর। ভূলোকে।

—কল্পনা, মদনভস্মের পর

২১ ২। ২১ ১১ ১১১ ১১:১১
ক্ষুদ্রতার। মন্দিরেতে বসায়ে আপ:নারে
১ ২ ১১ । ১ ২ ১ ১ ২১ ১১। ১১
আপন পায়ে। না দিই যেন অর্ঘ্য ভারে। ভারে।

—মানসী, দেশের উন্নতি

রাজার পদ। চর্ম আব:রণে।। ৫+৫+২।
ঢাকিল বুড়ো। হাসিয়া পদো:পান্তে। ৫+৫+৩।
মন্ত্রী কহে,। আমারো ছিল। মনে, ৫+৫+২।
কেমনে বেটা। পেরেছে সেটা। জানতে। ৫+৫+৩।

২. মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে পঞ্চমাত্রক পর্ব (পাঁচ মাত্রার পর্ব)

১ ১ ১ ১ ১ । ১১ ১১১
আমি হে সতী। নব যুবতী, ৫+৫।
১ ২ ১ ১। ১১১ ১১
আয়ান পতি। দুর্জন অতি। ৫+৫।
১১ ১ ১ ১ । ১১ ১ ১ ১
'পাপ আয়ানে'। শুনিলে প্রাণে।... ৫+৫।
১ ২ ১১ । ১১ ১ ১১
বংশীর ধ্বনি। যেন হে ফণী, ৫+৫।
১১ ১১১ । ১ ২ ১১
'আমি রমণী'। প্রমাদ গণি। ৫+৫।

—কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা

ষণ্মাত্রক পর্ব

দলবৃত্ত রীতিতে ছয় মাত্রার পর্ব রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর 'আলেখ্য' কাব্যের (১৯০৭) কয়েকটি রচনায় তার এই প্রচেষ্টার নিদর্শন আছে। তাতেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিন রীতিতেই ছয় মাত্রার পর্ব মূলত একটি উপযতির দ্বারা দুটি ত্রিমাত্রক উপপর্বে বিভাজ্য। কিন্তু ষণ্মাত্রক পর্বের মৌলিক উপযতিটি প্রায়শই লুপ্ত হয়। ফলে ওই ছয় মাত্রা একটি উপযতির দ্বারা দুটি ত্রিমাত্রক উপপর্বে বিভক্ত না হয়ে দুটি উপযতির দ্বারা তিনটি দ্বিমাত্রক উপপর্বে বিভক্ত হয়।

১। দলবৃত্ত রীতিতে যণ্মমাত্রক পর্ব (৬+৬। ৬+৩)

১ ১ ১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১১ ১১। ১১১

দেশের জন্য ভাবা, । মায়ের জন্য কাঁদা, ।। ভায়ের জন্য দেওয়া। একালে
'এই' বঙ্গদেশে। আজো যে সম্ভব তা', ।। হে মহাত্মা, তুমি। শেখালে।...
ওরে মূর্খ, জানিস্। মা মা বলে শখের ।। অশ্রু ফেলা বেশি। শক্ত নয়,
যে-জন চেঁচায় বেশি। 'দীনবন্ধু' বলে ।। সে-জন সত্যই। বেশি। ভক্ত নয়।
যে-জন কার্য করে। নিস্তব্দে নিভৃতে' ।। 'নির্জনে জননীর'। জন্য, সে-ই
যোগ্য সুসন্তান, সেই। মায়ের প্রিয় পুত্র, ।। সেই সে জগন্মান্য,। ধন্য সেই।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, ভক্ত (১৫শ চিত্র)

দলবৃত্ত রীতিতে এ-রকম ছয় মাত্রার পর্ব খুবই দুর্লভ।

২। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে যন্মাত্রক পর্ব (৬+৬। ৬+২)

১১ ১১১১ । ১ ২ ১ ২ ।। ১১১১ ২। ২

উঠ, বঙ্গকবি,। মায়ের ভাষায়।। মুমূর্ষুরে দাও। প্রাণ,
জগতের লোক। সুধার আশায়।। সে ভাষা করিবে। পান।....
বিশ্বের মাঝারে। ঠাই নাই বলে। কাঁদিতেছে বঙ্গ।-ভূমি,
গান গেয়ে কবি। জগতের তলে।। স্থান কিনে দাও। তুমি।

—কড়ি ও কোমল, আহ্বান গীত

এখানেও ত্রিমাত্রক ও দ্বিমাত্রক উপপর্বের যথেচ্ছ সমাবেশ লক্ষণীয়। যন্মাত্রক পর্বের এই মিশ্রবৃত্ত রূপ আজকাল আর চলে না। মিশ্রবৃত্তে যন্মাত্রক পর্বের আর একটি উদাহরণ দিই।

চিরসুখী জন । ভ্রমে কি কখন ।। ৬+৬।
  ব্যথিত বেদন । বুঝিতে পারে? ৬+৫ ।
কি যাতনা বিষে। বুঝিবে সে কিসে ৬+৬।
  কভু আশীবিষে দংশে নি যারে। ৬+৫

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সদ্ভাবশতক

৩। কলাবৃত্ত রীতিতে ষন্মাত্রক পর্ব (ছ'মাত্রার পর্ব)

১ ২ ১ ২।১ ২ ১ ১ ১ ।। ১১ ১ ১১ ১।১১
হাজার হাজার। বছর কেটেছে, । কেহ তো কহে নি। কথা, ৬+৬ । ৬+২
১ ২ ১১ ১। ১১১ ২ ১ ।। ১ ১১ ১ ১১।১১
ভ্রমর ফিরেছে। মাধবী-কুঞ্জে, ।। তরুরে ঘিরেছে। লতা।... ৬+৬। ৬+২
১১১ ১ ২ । ২ ১ ১১১।। ১১১ ১২। ১১
শুনিয়া তপন। অস্তে নামিল,।। শরমে গগন। ভরি, ৬+৬। ৬+২
১১১ ২১ । ১১১ ১১১ ।। ১২ ১ ২। ১১
শুনিয়া চন্দ্র। থমকি রহিল,।। বনের আড়াল। ধরি। ৬+৬ । ৬+২

— কল্পনা, প্রকাশ

১ ১১১ ২ । ২ ১১ ২ । ১১ ২ ১১ । ১১
এ জগতে হায়,। সেই বেশি চায় । আছে যার ভুরি। ভুরি, ৬+৬ । ৬+২
১ ২ ২১। ১১ ১ ২১ ।। ১ ১ ২ ২। ১১
রাজার হস্ত। করে সমস্ত কাঙালের ধন। চুরি। ৬+৬ । ৬+২

৪. সপ্তমাত্রক পর্ব (সাত মাত্রার পর্ব)

তিন রীতিতেই সাত মাত্রার পর্ব দুই উপযুতির দ্বারা তিন-দুই-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে বিভক্ত হয়।

১. দলবৃত্ত রীতিতে—

১১ ১ ১ ১ ১১ । ১১১ ১১ ১১
মরি কার পরশমণি। গগনে ফলায় সোনা; ৭+৭
১১১ ১১ ১১ । ১১১ ১১১১
হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি। অজানার আনাগোনায়।.... ৭+৭
১১ ১ ১১১১ । ১১১ ১১ ১১
অলকার রত্নাগারে। ঢুকেছি হঠাৎ যেন, ৭+৭
১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১১ ১১ ১১
ডুবে যাই চমৎকারে। সায়রে শিশির হেন। ৭+৭

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, সাঁঝাই

২. কলাবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্ব।

২ ১ ১ ১ ২। ১ ২ ১১ ১১ ।। ১ ২ ১১১১। ১১
মন্ত্রে সে যে পূত। রাখীর রাঙা সুতো, বাঁধন দিয়েছিনু। হাতে, ৭+৭। ৭+২

২ ১ ১১ ১১।১১
আজ কি আছে সেটি। সাথে?.... ৭+২
২ ১ ১১১১ । ১ ২ ১১ ১১
পথ যে কতখানি। কিছুই নাহি জানি,।। ৭+৭
১ ২ ১১ ২। ১১ ২১১ ২। ১১
মাঠের গেছে কোন্। শেষে চৈত্র-ফসলের। দেশে। ৭+৭+২

—উৎসর্গ-৪২, মন্ত্রে সে যে পূত,

সাত মাত্রার কলাবৃত্ত পর্ব প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্য রচনাকালে।

৩। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্ব (৭+৭। ৭+২)

১১১ ১১২।১ ২ ১১ ২ ।। ১ ২ ১ ১ ১১।১১
আনন্দে ত্রিনয়ন। সহিত দেবগণ। পুজেন নানা আয়ো-জনে।
১১১ ১১ ২। ১১১ ১১ ২ ১ ২ ১১ ১১। ১১
সুধন্য চৈত্র মাস। অষ্টমী সুপ্রকাশ।। বিশদ পক্ষ শুভ। ক্ষণে।।...
১ ২ ১১ ২। ১১১ ১১ ২ ।। ১১ ১ ১১১১। ১১
দেউল-বেদীপর। প্রতিমা মনোহর।। তাহাতে অধিষ্ঠিত। মাতা।
১১১ ১১ ২। ১ ২ ১১ ২ ১১ ১ ১১১ ১ ১১
সর্বতোভদ্র নাম। মণ্ডল চিত্র-নাম।। লিখিলা আপনি বি ; ধাতা।।

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, শিবের অন্নদা-পূজা

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে শেষ লঘুযতি লুপ্ত হয়েছে।

১.৩.৪ যতি, ছেদ

গদ্য বা পদ্য আমাদের মুখে অ-বিরাম গতিতে উচ্চারিত হয় না। অর্থবোধ সুপরিস্ফুট করার কারণে বা সুপরিমিত গতির কারণে বিরাম প্রয়োজন হয় পড়ে। এই বিরাম বা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে থামাটাই কারোর কাছে ছেদ, কারোর কাছে যতি। পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে নিয়মিত থামা—এর নাম যতি। গদ্য-পদ্যভেদে যতিনামেরও প্রভেদ ঘটে। গদ্যের যতিচিহ্নগুলির নাম কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি। গদ্যের যতি হয় প্রধানত ভাবগত এবং কিছুটা উচ্চারণসৌকর্যজাত। আর, গদ্যের যতিচিহ্ন স্থাপনের নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম নেই। অন্যদিকে, পদ্যরচনার মূল উদ্দেশ্য ধ্বনির শ্রুতিমাধুর্য এবং গতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। অমূল্যধন এই বিরামকে বলেছেন ছেদ। তিনি ২-রকম যতির কথা বলেছেন—কম থামার নাম অর্ধযতি, পুরো থামার নাম পূর্ণযতি। অর্ধযতির চিহ্ন (।), পূর্ণযতির চিহ্ন (।।)।

প্রবোধচন্দ্র শুনিয়েছেন ৫-রকম যতির নাম অণুযতি, উপযতি, লঘূযতি, অর্ধযতি, পূর্ণযতি। এই পাঁচ

প্রকার যতি দ্বারা বিভক্ত পদ্যাংশের পাঁচ প্রকার নাম—দল বা কলা, উপপর্ব, পর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি। এ কারণে তিনি এই পাঁচ প্রকার যতিকে দলযতি, উপপর্বযতি, পর্বতি, পদতি, পঙ্‌ক্তিযতি নামে অভিহিত করেছেন। একটু তলিয়ে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, যে-কোনো বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দও আমাদের মুখে স্বভাবতঃই টুকরো-টুকরো হয়ে উচ্চারিত হয়। কোনো-কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় এক টুকরো রূপেই যেমন না, কি, সে, মাস, দিন, ফুল। আবার কোনো কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় দুই বা ততোধিক টুকরো হয়ে। যেমন—নদী, সুতি, আকাশ, কবিতা, বসন্ত ইত্যাদি। আমাদের মুখে এ-রকম প্রত্যেকটি টুকরো বা খণ্ডের পরেই একটু বিরতি ঘটে, বাক্যগত এ-রকম ধ্বনিখণ্ডের পরবর্তী ক্ষণিক বিরতিকে ছন্দ-পরিভাষায় বলি অণুযতি। আর এ-রকম ধ্বনিখণ্ডকে বলি দল (Syllable)।

যতিগুলিকে চিহ্ন দিয়ে চিনে নেওয়া যাক। দলযতি বা অণুযতির চিহ্ন দেওয়া হয় না। তবে বুঝে নেওয়ার সুবিধার জন্য একবিন্দু দিয়ে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ।। ১১ ১ ১ ১ ১। ১ ১

চন্. দ্র য.খন্ । অস্.তে না.মি.ল । ত.খ.নো র.য়ে.ছে। রা.তি I ৬।৬। ৬২ I

২১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১

পূর্.ব দি.কের্। অ.লস্ ন.য়.নে ।। মে.লি.ছে রক্.ত । ভা.তি I ৬৬। ৬।২ I

এটি কলাবৃত্ত ছন্দোরীতির উদাহরণ।

বিভিন্ন যতিচিহ্ন

উপযতি বা উপপর্বযতির চিহ্ন ':'। যদিও ছন্দোলিপি করার সময় এই চিহ্ন দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। লঘুযতি বা পর্বযতির চিহ্ন '।', অর্ধযতি বা পদযতির চিহ্ন '।', পূর্ণযতি বা পঙ্‌ক্তিযতির চিহ্ন I'। উপরের উদাহরণে বাকি তিন রকম চিহ্ন পাওয়া যাবে। উপরের উদাহরণটি কলাবৃত্ত ছন্দের। এ বিষয়ে আমরা বিশদ পরে আসছি।

বাংলা ছন্দে বিভিন্ন যতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম

অণুযতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম	—	**দল / কলা**
উপযতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম	—	**উপপর্ব**
লঘুযতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম	—	**পর্ব**
অর্ধযতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম	—	**পর্ব**
পূর্ণযতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম	—	**পঙ্‌ক্তি**

বাংলা ছন্দে বিভিন্ন অংশ সংযুক্তি ও গঠন

দল + দল = উপপর্ব
উপপর্ব + উপপর্ব = পর্ব
পর্ব + পর্ব = পদ
পদ + পদ = পঙ্‌ক্তি
পঙ্‌ক্তি + পঙ্‌ক্তি = স্তবক

পদ ও পঙ্‌ক্তির অবস্থান

কুমোর পাড়ার। গোরুর গাড়ি,   ৪+৪ (দুটি পর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
বোঝাই-করা। কলসি, হাঁড়ি। I   ৪+৪ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্‌ক্তি)
গাড়ি চালায়। বংশীবদন,   ৪+৪ (দুটি পর্ব মিলিয়ে একটি পদ)।
সঙ্গে যে যায়। ভাগ্নে মদন। I   ৪+৪ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্‌ক্তি)।
—সহজ পাঠ (২য়), হাট।

দূর হতে যারে। পেয়েছি পাশে   ৫+৫ (দুটি পর্ব মিলিয়ে একটি পদ)।
কাছের চেয়ে সে। কাছেতে আসে। I ৫+৫ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্‌ক্তি)
—লেখন, ‘দূর হতে যারে’

উতল সাগরের। অধীর ক্রন্দন   ৭+৭ (দুটি পর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
নীরব আকাশের। মাগিছে চুম্বন। I   ৭+৭ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্‌ক্তি)
—লেখন, উতল সাগরের

নগরীরে। অন্ন বিলা। -বার   ৪+৪+২ (দুটি পূর্ণপর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
আমি আজি। লইলাম। ভার...I   ৪+৪+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্‌ক্তি)
কহিল সে। নমি সবা। কাছে,   ৪+৪+২ (দুটি পূর্ণপর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
শুধু এই। ভিক্ষাপাত্র। আছে।...I   ৪+৪+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্‌ক্তি)।
—কথা, নগরলক্ষ্মী

সবচেয়ে ছোট পঙ্‌ক্তিতে থাকে দুই উপপর্ব গড়া এক পর্ব। দুই উপপর্বের মধ্যে থাকে উপযতি, আর এই পর্বের পরে লঘুযতির স্থানে থাকে পূর্ণযতি। এ-রকম এক পর্বের পঙ্‌ক্তিতে অর্ধযতি তো থাকেই না, লঘুযতিও থাকে না। দৃষ্টান্ত—

বায়ু : বয়	সরস : দল
বন : ময়।	পনস : ফল।
বাঁশ : গাছ।	শমন : ঘরে
করে : নাচ।	গমন : করে।
—সহজ পাঠ (১),	মদনমোহন, শিশুশিক্ষা (১ম)

১.৩.৫ পর্ব, অতিপর্ব

প্রবোধচন্দ্র বলেছেন ‘লঘুযতির দ্বারা খণ্ডিত পদ-বিভাগের পারিভাষিক নাম ‘পর্ব’। দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতিতে পর্ববিভাগ বোঝা যায়। কিন্তু মিশ্রবৃত্ত রীতিতে লঘুযতি বা পর্ববিভাগ অনেক সময় স্পষ্ট থাকে না। এতে অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ দিই—

১. মুদিত আলোর। কমল-কলিকা। -টিরে ৬+৬+২
(দুটি পর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
রেখেছে সন্ধ্যা। আঁধার-পর্ণ। -পুটে। I ৬+৬+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্‌ক্তি)।
উতরিবে যবে। নব প্রভাতের। তীরে ৬+৬+২
(দুটি পর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
তরুণ কমল। আপনি উঠিবে। ফুটে। I ৬+৬+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্‌ক্তি)।

এটি কলাবৃত্ত রীতির উদাহরণ। দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি।

২. এ দুর্ভাগ্য। দেশ হতে ।। হে মঙ্গল।-ময়, ৪+৪। ৪+২
(দুটি পদ, একটি পঙ্‌ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)
দূর করে। দাও তুমি সর্বতুচ্ছ। ভয়। I ৪+৪। ৪+২
(দুটি পদ, একটি পঙ্‌ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)
মস্তক তু : -লিতে দাও ।। অনন্ত আ :-কাশে। ৪+৪। ৪+২
(দুটি পদ, একটি পঙ্‌ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)
উদার আ :-লোক মাঝে উন্মুক্ত বা :-তাসে। I
৪+৪। ৪+২
(দুটি পদ, একটি পঙ্‌ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)

এটি মিশ্রবৃত্ত রীতির উদাহরণ। দ্বিপদী চারটি পয়ার পঙ্‌ক্তি।

‘পর্ব’ শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ। একই মাপের পর্ব পরপর ঘুরে ঘুরে এলে তার নাম ‘পূর্ণপর্ব’। কবিতার ছত্রের শুরুতে, কখনো কখনো মাঝখানে ছোটো মাপের এমন পর্ব মাঝে মাঝে কবিরা ব্যবহার করেন, যা ছন্দের হিসেবের বাইরে। এ রকম অতিরিক্ত পর্বের নাম ‘অতিপর্ব’। প্রবোধচন্দ্র এর সংজ্ঞা হিসেবে বলেছেন ‘কোনো ছন্দপঙ্‌ক্তির পূর্বে স্থাপিত প্রস্বরহীন অথচ অর্থবহ দ্বিমাত্রক শব্দ’। অতিপর্ব বাক্যের অর্থবোধের সহায়ক। অথচ এদের আদিতে কোনো প্রস্বর থাকে না। প্রস্বর থাকে মূল ছন্দপঙ্‌ক্তির আদিতে। যেমন—

আমি হব না ভাই নববঙ্গে নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননি-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে

আমি কোনো জন্মে পারি হতে ব্রজের গোপবালক,

তবে চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।

—ক্ষণিকা, জন্মান্তর

দলবৃত্ত রীতিতে রচিত এই কবিতায় 'আমি', 'যদি', 'কোথাও', 'তবে' শব্দগুলি অর্থবহ দ্বিমাত্রক। এগুলি 'অতিপর্ব।

১.৩.৬ উপপর্ব

উপযতি দ্বারা বিভক্ত অংশের নাম উপপর্ব। অমূল্যধনের 'পর্বাঙ্গ' আর প্রবোধচন্দ্রের 'উপপর্ব' পর্বেরই এক-একটি বিভাগ। কিন্তু, পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সবসময় হুবহু এক নয়। এর কারণ, অমূল্যধনের 'পর্ব' আর প্রবোধচন্দ্রের 'পর্ব' সবসময় মাপে এক হয় না। অমূল্যধনের মতে পর্বে মাঝখানে যতি নেই, (:) চিহ্নটিও যতিচিহ্ন নয়। প্রবোধচন্দ্রের মতে যতি অবশ্যই আছে, যতিই পর্বকে উপপর্বে ভাগ করে এবং সে-যতির নাম উপযতি। উদাহরণ দিই—

নমো : নমো : নম। সুন : দরী : মম জননী : বঙ্গ।-ভূমি।   ৬+৬। ৬+২ I

গঙ : গার : তীর। স্নিগ্ধ : সমীর জীবন : জুড়ালে : তুমি।   ৬+৬। ৬+২ I

: দ্বিবিন্দু চিহ্নিত উপপর্ব। কলাবৃত্তের উদাহরণ। যন্মাত্রক দ্বিপর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি।

১টি পর্বকে ২টি-৩টি ভাগে উচ্চারণ করে এক-একটি ভাগকে প্রবোধচন্দ্র বলেন 'উপপর্ব'।

১.৩.৭ পদ

প্রবোধচন্দ্র বলেছেন অর্ধযতির দ্বারা খণ্ডিত পঙ্‌ক্তিবিভাগের পারিভাষিক নাম 'পদ'। পদবদ্ধ রচনার নামই পদ্য। পদের বিভাগ — একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী। পর্বের উপাদান মাত্রা (দলমাত্রা বা কলামাত্রা) আর মাত্রাসংখ্যার দ্বারা নিরূপিত হয় পর্বের রূপ, অর্থাৎ পদের আয়তনগত আকৃতি।

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত, এই তিন রীতিতেই পদ গঠিত হয় সাধারণতঃ দুই ও তিন পর্ব নিয়ে। পদের শেষ পর্ব অনেক সময় অপূর্ণ থাকে। এই অপূর্ণতার দ্বারাও পদের তথা পঙ্‌ক্তির রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

একপদী পঙ্‌ক্তি

যে ছন্দপঙ্‌ক্তি কোনো অর্ধযতির দ্বারা বিভক্ত নয়, তাকে বলা হয় একপদী। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার একপদী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত শ্রেণীবদ্ধ রূপে সাজিয়ে দেওয়া গেল।

এক। চতুর্মাত্রক পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তি

১। দলবৃত্ত একপদী—এক পর্বের পদ

গগন-তলে	দুধের চাছি।
আগুন জ্বলে।.....	শুষছে মাছি।...
ময়রা মুদি	কুকুর গুলো
চক্ষু মুদি	শুকছে ধুলো,
পাটায় বসে	ধুকছে কেহ
ঢুলছে ক'সে	ক্লান্ত দেহ।

—সত্যেন্দ্রনাথ, কুহু ও কেকা, পালকীর গান

২। দলবৃত্ত একপদী দুই পর্বের পদ, অপূর্ণ।

১ ১ ১ ১ । ১ ১ ৪+২
চাদটি ব'সে। হাসে।
১ ১ ১ ১ । ১ ১ ৪+২
শান্ত নীলা। কাশে।
১ ১ ২—। ২ ১ ১ ৪+৪
ডাকে মা—। 'চাদ, আ'রে,
২-১১।১ ১ ৪+২
চি-ক দিয়ে। যা রে।।
১ ১ ১ ১। ১ ১ ৪+২
একবার তাকায়। সাধে,
১ ১ ১ ১।১১ ৪+২
আকাশের ঐ। চাঁদে,
১ ১ ১ ১ ১ ১ ৮+২
আবার তাকায়। সুখে।
১ ১ ১ ১ ১ ১. ৪+২
কোলের চাঁদের। মুখে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য

এই উদাহরণে 'মা', 'চাঁদ', 'চিক' শব্দ তিনটি উচ্চারণে দীর্ঘ হওয়ায় দু'মাত্রা করে পেয়েছে।

৩। দলবৃত্ত একপদী—দুই পর্বের পদ, পূর্ণ।

মেঘ মুলুকে। ঝাপসা রাতে
রামধনুকের। আবছায়াতে,

তাল-বেতালে। খেয়াল সুরে
তান ধরেছি। কণ্ঠ পুরে।

—সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল

৪। কলাবৃত্ত একপদী—এক পর্বের পদ

যত কয়।	কোথা রাখি।
তত নয়।	তোতাপাখি।।
শিখি নাই	খৈ চাই
লিখি তাই।	দৈ চাই।

—মদনমোহন, শিশুশিক্ষা (প্রথম ভাগ)

আলো হয়	দীঘি-জল
গেল ভয়।	ঝলমল।
চারি দিক	ঝাউ-ডাল
ঝিকিমিক।	দেয় তাল।

—রবীন্দ্রনাথ, সহজ পাঠ (প্রথম ভাগ)

৫। কলাবৃত্ত একপদী—তিন পর্বের পদ, পূর্ণ।

খ্যাতি আছে। সুন্দরী। বলে তার,
এটি ঘটে। নুন দিতে। ঝোলে তার;
চিনি কম। পড়ে বটে। পায়সে
স্বামী তবু। চোখ বুজে। খায় সে,..

—খাপছাড়া

এবার আমরা তিন রীতিতে দ্বিপদী ছন্দের উদাহরণ দেখে নেব।

১। দলবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী ৪+৪। ৪+৪ মাত্রা

তোমার মাপে। হয়নি সবাই ।। তুমিও হওনি। সবার মাপে,
তুমি মরো। কারও ঠেলায়,। কেউ বা মরে। তোমার চাপে।

উদাহরণটিতে 'তুমিও' শব্দের -মিও সঙ্কুচিত হয়ে একমাত্রা পেয়েছে।

২। কলাবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী ৪+৪। ৪+৪ মাত্রা

চম্পক। তরু মোরে প্রিয়সখা। জানে সে-,
গন্ধের। ইঙ্গিতে কাছে তাই। টানে যে-।

উদাহরণটিতে 'সে' এবং 'যে' শব্দদুটি প্রসারিত হয়ে দুইমাত্রা পেয়েছে।

৩। মিশ্রবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী ৪+৪। ৪+৪ মাত্রা

এখন বিশ্বের তুমি, ।। গুন্‌গুন্ । মধুকর
চারি দিকে। তুলিয়াছে।। বিস্ময়-ব্যা:কুল স্বর।

উদাহরণটিতে 'বিশ্বের' এবং ব্যাকুল' শব্দদুটিতে পর্বযতি অনাঘাতি।

এবার পয়ারের দ্বিপদীর উদাহরণ রইল।

১। দলবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার) — ৪+৪। ৪+২ মাত্রা

ক. আজ বিকালে কোকিল ডাকে। শুনে মনে লাগে।
বাংলাদেশে ছিলাম যেন। তিন শো বছর আগে।
—খেয়া, কোকিল

খ. সেই আমাদের দেশের পদ্ম। তেমনি মধুর হেসে,
ফুটেছে ভাই অন্য নামে। অন্য নামে। অন্য সুদূর দেশে।
— স্ফুলিঙ্গ-২৪৫, ‘সেই আমাদের’

২। কলাবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার)-৪ + ৪। ৪ + ২ মাত্রা

ক. পূর্ণিমা রাত্রের। জ্যোৎস্না-ধারায় সান্ধ্য বসুন্ধরা। তন্দ্রা হারায়।
—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

খ. সংসারে জ্বেলে গেলে। যে নব আলোক,
জয় হোক, জয় হোক। তারি জয় হোক।
বন্দীরে দিয়ে গেছ। মুক্তির সুধা,
সত্যের বরমালে। সাজালে বসুধা।।
—গীতিবিতান, পূজা, ‘মরণ-সাগর-পারে’

৩। মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার)-৪ + ৪। ৪ + ২ মাত্রা

ক. জন্মেছি যে মর্তকোলে। ঘৃণা করি তারে
ছুটির না স্বর্গ আর। মুক্তি খুঁজিবারে।
—সোনার তরী, আত্মসমর্পণ

খ. সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে। মেঘে মায়া ঢালে,
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া। সোনার খেয়ালে।
—স্ফুলিঙ্গ-২৪৩, ‘সুন্দরের’

এই দৃষ্টান্তগুলিতে পর্ববিভাগ উহ্য রাখা হয়েছে। তাই একদণ্ডচিহ্ন (।) দিয়েই পদবিভাগ দেখানো হল।

ত্রিবিধ দৃষ্টান্তেরই পঙ্‌ক্তিগুলি একটি অর্ধযতির দুই ভাগে (মানে দুই পদে) বিভক্ত। অতএব এগুলি দ্বিপদী। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উদ্ধৃত ত্রিবিধ দৃষ্টান্তেরই প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে চোদ্দ মাত্রা, আর ওই চোদ্দমাত্রা আট ও ছয় মাত্রার দুই পদে বিভক্ত।

ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি

যে ছন্দপঙ্‌ক্তি দুই অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে (অর্থাৎ তিন পদে) বিভক্ত, তাকে বলা হয় ত্রিপদী। ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির। তিন পদ সাধারণত সমায়তন হয় না।

এক। চতুর্মাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি

১. দলবৃত্ত ত্রিপদী-৪ + ৪। ৪ + ৪। ৪ + ২ মাত্রা

কে গো চিরজন্ম ভরে
নিয়েছে মোর হৃদয় হরে,
উঠছে মনে জেগে।
নিত্যকালের চেনাশোনা
করছে আজি আনাগোনা
নবীন-ঘন মেঘে।

—উৎসর্গ-৩৫, 'দেখো চেয়ে গিরির শিরে'

২। কলাবৃত্ত ত্রিপদী-৪ + ৪। ৪ + ৪। ৪ + ২ মাত্রা

অঘ্রান হল সারা,
স্বচ্ছ নদীর ধারা
বহি চলে কলসংগীতে।
কম্পিত ডালে ডালে
মর্মর তালে তালে
শিরীষের পাতা ঝরে শীতে।

—চিত্রবিচিত্র, শীত

৩। মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী-৪ + ৪। ৪ + ২ মাত্রা

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা,
সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা।
দিনের কল্লোল 'পর
টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।

—কল্পনা, অশেষ

তিন দৃষ্টান্তেই পঙ্‌ক্তিগুলি দুটি অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে বা পদে বিভক্ত। দলবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত পঙ্‌ক্তির তিন পদে আছে যথাক্রমে আট-আট-ছয় মাত্রা।

দুই। পঞ্চমাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি

১। কলাবৃত্ত ত্রিপদী—১০+১০+৭ পদমাত্রা

ক. কোথায় কবে। আছিলে জাগি, ।। ৫+৫।
বিরহ তব। কাহার লাগি, ।। ৫+৫।

কোন্ সে তব। প্রিয়া। I ৫+২ I

—বীথিকা, পাঠিকা

খ. রোদের বেলা। ছায়ার বেলা ।। ৫+৫।

করেছি সুখ। দুখের খেলা, ।। ৫+৫।

সে খেলাঘর। মিলাবে মায়া। সম। I ৫+৫+২ I

—বীথিকা, প্রণতি

তিন। যত্রক পর্বের কলাবৃত্ত ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি

ক. ওগো কোথা মোর। আশার অতীত, ।। ৬+৬। (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ১২)

ওগো কোথা তুমি। পরশ চকিত, ৬+৬। (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ১২)

কোথা গো স্বপন।-বিহারী। I ৬+৩ I (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ৯)

খ. চক্ষে তোমার। কিছু বা করুণা। ভাসে, ৬+৬+২। (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ১৪)

ওষ্ঠে তোমার। কিছু কৌতুক। হাসে, ।। ৬+৬+২। (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ১৪)।

মৌনে তোমার। কিছু লাগে মৃদু। সুর। I ৬+৬+২। (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ১৪)

যে ছন্দ-পঙ্‌ক্তি তিন অর্ধযতির দ্বারা চার ভাগে বিভক্ত, তাকে বলে চৌপদী। চৌপদীর শেষ পদ সাধারণত অপূর্ণ থাকে। অনেক সময় চৌপদীর প্রথম তিন পদে মিল রাখা হয়।

এক। চতুর্মাত্রক পর্বে চৌপদী পঙ্‌ক্তি

১। দলবৃত্ত চৌপদী—৮+৮+৮+৬ পদমাত্রা

দুয়ার জুড়ে। কাঙাল-বেশে।। (পর্বমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৮)

ছায়ার মতো। চরণ-দেশে।। (পবলমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৮)

কঠিন তব। নূপুর ঘেঁষে।। (পর্বমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৮)

আর বসে না। রইব। I (পর্বমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৬)

—ক্ষণিকা, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

এর প্রথম পঙ্‌ক্তি চৌপদী। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী।

২। কলাবৃত্ত চৌপদী—৮ + ৮ + ৮ + ৫ ও ৭ পদমাত্রা

ক. পথপাশে মল্লিকা। দাঁড়াল আসি, ৮+৫ (দুটি পদ)

বাতাসে সুগন্ধের। বাজাল বাঁশি। I ৮+৫ (দুটি পদ)

ধরার স্বয়ম্বরে। ৭

উদার আড়ম্বরে। ৭

আসে বর অম্বরে। ৮

ছড়ায়ে হাসি। I ৫

—মহুয়া, বরযাত্রা

খ. চিরযুবা শূর-বীর। বিজয়ীর কুঞ্জে
আমাদের মঞ্জীর। সদালসে গুঞ্জে।
ভাবে যারা তন্ময়
জানে না মরণভয়,
তার লাগি আনি হয়
রণধূম-পুঞ্জে।
ফুটে উঠি হাসি-সম। খড়্গের ঝলকে,
মোরা করি মনোরম। মৃত্যুরে পলকে।
উৎসবে দীপাবলী
সনে মোরা নিবি জ্বলি,
সুরাসম উচ্ছলি'
চঞ্চল পুলকে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, তুলির লিখন, বিদ্যুৎপর্ণা

দুই দৃষ্টান্তেই প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী। তৃতীয় পঙ্‌ক্তি চৌপদী। পার্থক্য শুধু শেষ অপূর্ণ পদের মাত্রাসংখ্যায়।

দুই। পঞ্চমাত্রক পর্বের চৌপদী পঙ্‌ক্তি

ক. কলাবৃত্ত চৌপদী

জগৎ পারা। বারের তীরে।	৫+৫ (১০ পদমাত্রা)
ছেলেরা করে। খেলা। I	৫+২ I (৭ পদমাত্রা)
অন্তহীন। গগনতল	৫+৫। (১০ পদমাত্রা)
মাথার 'পরে। অচঞ্চল,	৫+৫।(১০ পদমাত্রা)
ফেনিল ওই। সুনীল জল	৫+৫।(১০ পদমাত্রা)
নাচিছে সারা। বেলা। I	৫+২ I (৭ পদমাত্রা)
উঠিছে তটে। কী কোলাহল	৫+৫। (১০ পদমাত্রা)
ছেলেরা করে। খেলা। I	৫+২ I (৭ পদমাত্রা)

—শিশু, জগৎপারাবারের

কলাবৃত্তের এই চৌপদীর প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি চৌপদী।

তিন। যন্মাত্রক পর্বের চৌপদী পঙ্‌ক্তি

ক. কলাবৃত্ত চৌপদী

ঊষার দুয়ারে। হানি আঘাত।	৬+৫। (১১ পদমাত্রা)

আমরা আনিব। রাঙা প্রভাত,	৬+৫। (১১ পদমাত্রা)
আমরা টুটাব। তিমির রাত	৬+৫। (১১ পদমাত্রা)
বাধার বিন্ধ্যা। চল। I	৬+২ I (৮ পদমাত্রা)

—নজরুল, সন্ধ্যা

খ. মিশ্রবৃত্ত চৌপদী

বিলম্বে এসেছ। রুদ্ধ এবে দ্বার,	৬+৬। (১২ পদমাত্রা)
জনশূন্য পথ। রাত্রি অন্ধকার,	৬+৬ (১২ পদমাত্রা)
গৃহহারা বায়ু। করি হাহাকার	৬+৬। (১২ পদমাত্রা)
ফিরিয়া মরে। I	৫ I (৫ পদমাত্রা)

—চিত্রা, দুঃসময়

চার। সপ্তমাত্রক পর্বের চৌপদী পঙ্‌ক্তি

ক. দলবৃত্ত চৌপদী

প্রভাতে পথিক ডেকে। যায়,	৭+২।(৯ পদমাত্রা)
অবসর পাইনে আমি। হায়,	৭+২ (৯ পদমাত্রা)
বাহিরের খেলায় ডাকে। যে,	৭+২ (৯ পদমাত্রা)
যাব কী করে। I	৫ I (৫ পদমাত্রা)

চারটি পদ। প্রথম তিন পদে দুটি করে পর্ব। প্রথম পর্বে সাত দলমাত্রা করে আছে। প্রথম তিন পদের 'যায়', 'হায়' রুদ্ধদল দু'মাত্রা গণনা করা হয়েছে এবং 'যে' মুক্তদল দীর্ঘ হয়ে দু'মাত্রা পেয়েছে। শেষ অপূর্ণ পদ পাঁচ মাত্রার।

খ. কলাবৃত্ত চৌপদী

হেরো গো অন্তরে। অরূপ-সুন্দরে,	৭+৭। (১৪ পদমাত্রা)
নিখিল সংসারে। পরম বন্ধুরে,	৭+৭। (১৪ পদমাত্রা)
এস আনন্দিত। মিলন-অঙ্গনে	৭+৭।(১৪ পদমাত্রা)
শোভন-মঙ্গল। সাজে।	৭+২ I (৯ পদমাত্রা)

—গীতবিতান, পূজা

গ. কলাবৃত্ত মহাত্রিপদী

অনুকূল বাবু বলে। ঘাস খাওয়া ধরা চাই	৪+৪। ৪+৪ (১৬ পদমাত্রা)
কিছুদিন জঠরেতে। অভ্যেস করা চাই,	৪+৪। ৪+৪ (১৬ পদমাত্রা)
বৃথাই খরচ ক'রে। চাষ করা শষ্য।	৪+৪। ৪+৪ (১৬ পদমাত্রা)

—খাপছাড়া

এই রকম দীর্ঘ পদকে বলা হয় মহাপদ। এ কারণে ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির নাম মহাত্রিপদী। অপূর্ণ কলাবৃত্ত পদের শেষ মুক্তদল প্রায়ই দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়। এখানেও 'চাই' এবং 'য্য' দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে।

ঘ. কলাবৃত্ত মহাচৌপদী

একই ভাবে মাঝে মাঝে মহাচৌপদী পদও দেখা যায়।

খেঁকশেয়ালের দল। শেয়াল দহর।	৪+৪। ৪+২ (১৪ পদমাত্রা)
হাঁচি শুনে হেসে মরে। অষ্ট প্রহর,	৪+৪। ৪+২ (১৪ পদমাত্রা)
হাতিবাগানের হাতি। ছাড়িয়া শহর	৪+৪। ৪+২ (১৪ পদমাত্রা)
ভাগলপুরের দিকে। ভাগে।	৪+৪। ২ (১০ পদমাত্রা)

—খাপছাড়া

এটি অপূর্ণ মহাচৌপদী। তিনটি পদই অপূর্ণ (৬ মাত্রা করে)।

১.৩.৮ পঙ্‌ক্তি

পুরো থামার যতিকে বলা হয় 'পূর্ণযতি', এক পূর্ণযতি থেকে আর এক পূর্ণযতি পর্যন্ত পুরো ছত্রটির নাম অমূল্যধনের কাছে চরণ, প্রবোধচন্দ্রের কাছে পঙ্‌ক্তি। প্রবোধচন্দ্র সমর্থনযোগ্য যুক্তি দিয়েই দেখিয়েছেন যে, পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকে 'চরণ' বলা যায় না, বলা উচিত 'পঙ্‌ক্তি'। প্রবোধচন্দ্র এই কারণে 'পূর্ণযতি'-কে আরো নির্দিষ্ট করে বললেন 'পঙ্‌ক্তিযতি'। কয়েকটি পদ জুড়ে তৈরি হয় পঙ্‌ক্তি। বলা প্রয়োজন যে, ছন্দের পঙ্‌ক্তি (verse বা metrical line) আর মুদ্রিত বা লিখিত ছত্র (printed বা written line) এক নয়। একই ছন্দপঙ্‌ক্তিকে অভিরুচি বা প্রয়োজনমতো একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা যায় বা লিখতে হয়। এসব ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তিগুলিকে সাধারণত অর্ধযতিতে বিভক্ত করে দুই বা ততোধিক ছত্রে সাজানো হয়। কখনও কখনও লঘুফতি অনুসারেও ছত্রভাগ করা যায়। কিন্তু যথেচ্ছ ভাগ করা কখনও চলে না। ছন্দপঙ্‌ক্তি অর্ধযতি বা লঘুযতি অনুসারে একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা হয়ে আর চিহ্ন দিয়ে যতিবিভাগ দেখাবার প্রয়োজন থাকে না। অর্ধযতি বা লঘুযতি চিহ্ন তখন উহ্য থাকে।

১.৩.৯ স্তবক, শ্লোক

কবিতা যখন পড়ি, তখন আমরা পর পর নির্দিষ্ট মাপের (মাত্রা সংখ্যার) পঙ্‌ক্তিই একের পর এক উচ্চারণ করে যেতে থাকি। একটি কবিতার গোটা শরীরে যতগুলি পঙ্‌ক্তি ছড়ানো আছে, তাদের ছন্দ-স্বভাব একটাই। সে-কারণে, কোনও কবিতার ছন্দ বোঝার জন্য গোটা কবিতাই পড়ে পড়ে দেখার প্রয়োজন নেই, কবিতার একটি অংশ এর জন্য বেছে নিলেই চলে। তবে, অংশটি এমন হওয়া চাই, যাতে থাকে মাপ বা মাত্রা সংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা পরপর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। এই রকম কয়েকটি পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে ছান্দসিকেরা বলেন স্তবক।

সাধারণভাবে 'স্তবকে'র অন্তর্গত চরণের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়—২ থেকে ৮ পর্যন্ত, এমনকি তার চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে, এ-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র একটু ভিন্ন কথা বলতে চান। তার মতে 'স্তবকে'র পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা কমপক্ষে ৫ হওয়া চাই-ই। তার চেয়ে কম হলে তার নাম হবে শ্লোক, 'স্তবক' নয়। ৫ বা তার বেশি সংখ্যার পঙ্‌ক্তির গুচ্ছও তার কাছে বড়ো মাপের শ্লোক-ই, কেবল তার বিকল্প নাম 'স্তবক'। আমরা অবশ্য পঙ্‌ক্তির যে কোনো গুচ্ছকেই বলব 'স্তবক'।

১.৩.১০ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ

রুদ্ধদলের স্বাভাবিক উচ্চারণে দীর্ঘ বা প্রসারিত হলেও আবশ্যকমতো এর সংকোচনে বাধা নেই। কোনো কবিতার উচ্চারণে প্রতিটি রুদ্ধদল পায় ২-মাত্রা, কোনো কবিতায় ১-মাত্রা, আবার কোনো কবিতার একই স্তবকে একটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, আর একটিতে ২-মাত্রা। যেখানে রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, সেখানে তার হ্রস্ব উচ্চারণ, সেখানে তার সংকোচন; যেখানে রুদ্ধদলে ২-মাত্রা, সেখানে তার দীর্ঘ উচ্চারণ, সেখানে তার প্রসারণ। বাংলা কবিতায় রুদ্ধদলের এই সংকোচন-প্রসারণ অত্যন্ত ব্যাপক। উচ্চারণে এই সংকোচনের নাম সংশ্লেষ, আর প্রসারণে নাম বিশ্লেষ। অতএব, এখানে 'সংশ্লেষ' এর অর্থ রুদ্ধদলের হ্রস্ব উচ্চারণে, আর 'বিশ্লেষ'-এর অর্থ রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ।

অমূল্যধনের মতে, পর্বের অন্তর্গত কোনো অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ অন্য অক্ষরের স্বরধ্বনির তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলেই ঐ অক্ষরের ওপর বাড়তি ঝোক পড়ে। এরকম ঝোঁকের নাম তিনি দিলেন শ্বাসাঘাত। অমূল্যধনের বিচারে 'শ্বাসাঘাত' বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকের প্রতি পর্বেই থাকবে, থাকবে প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের ওপর। তবে যে পর্বে হলন্ত অক্ষর নেই, সেখানে তা পড়বে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর। প্রবোধচন্দ্রও দলের উচ্চারণে ঝোঁকের কথা মানেন। তবে তাঁর বিচারে সে-ঝোঁক তীব্র হয়ে পড়ে কেবল পর্বের প্রথম দলে। এই ঝোঁকের নাম প্রস্বর। পর্বের শেষের দিকে দুর্বল ঝোঁকের ঘা থাকলেও তার গুরুত্ব কম।

তাহলে, 'শ্বাসাঘাত' আর 'প্রস্বরে'র মধ্যে মিল শুধু এইটুকু—উচ্চারণের এই দুটি স্বভাবই আসলে কোনো অক্ষর বা দলের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়া। আর, গরমিল এই—'শ্বাসাঘাত' পড়ে বিশেষ এক শ্রেণীর কবিতার স্তবকে, প্রতি পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরে (রুদ্ধদলে), পর্বে হলন্ত অক্ষর না-থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদলে)। কিন্তু, 'প্রস্বর' পড়ে যেকোনো শ্রেণীর কবিতার স্তবকে, প্রতি পর্বের কেবল প্রথম দলে (মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক)।

১.৩.১১ মিল

বাংলা ছন্দের আলোচনায় মিল-এর বিশেষ করে অন্ত্যমিলের গুরুত্ব ছান্দসিকেরা স্বীকার করে থাকেন। মিল হচ্ছে আসলে স্তবকের মাঝখানে একই ধ্বনির ধ্বনিগুচ্ছের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থানে ফিরে ফিরে আসা। একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি দুটি পর্বের শেষে হতে পারে, দুটি পদের শেষে হতে

পারে, দুটি পঙ্‌ক্তি বা চরণের শেষেও হতে পারে। পর্ব-পদ-পঙ্‌ক্তি-চরণ যার শেষেই হোক, মিলটা শেষে থাকে তার চলতি নাম অন্ত্যমিল—পর্বান্ত্য পঙ্‌ক্তি-অন্তক চরণান্ত্য মিল। একই স্তবকের মাঝখানে পৃথক পৃথক পর্ব চরণ পদ বা পঙ্‌ক্তির শেষে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের ফিরে ফিরে আসাকে বলে মিল।

১.৩.১২ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর

পর্বের মাঝখানে কোনো অক্ষরের (দলের) স্বরধ্বনি অন্য অক্ষরের তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলে সেই অক্ষরের ওপর যে বাড়তি ঝোঁক পড়ে, তাকে অমূল্যধন বলেন 'শ্বাসাঘাত। বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকে পর্বের প্রতিটি হল অক্ষরের (রুদ্ধদলের) ওপর, হলন্ত অক্ষর না-থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর 'শ্বাসাঘাত' পড়ে। প্রবোধচন্দ্রের মতে, যে কোনো কবিতার স্তবকে প্রতি পর্বের প্রথম দলের ওপর যে তীব্র ঝোঁক পড়ে, তার নাম 'প্রস্বর'।

১.৪ সারাংশ

বর্ণ, ধ্বনি—আমরা যা উচ্চারণ করি, তার লিখিত চিহ্নের নাম হরফ বা বর্ণ। বর্ণের উচ্চারিত রূপটিই ধ্বনি। ছান্দসিকের ভাষায় বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ। **অক্ষর, দল**— প্রবোধচন্দ্র সিলেবল্-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অক্ষর' কথাটির বদলে 'দল' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে দল হচ্ছে 'বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ড'। যেসব দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর, তার নাম মুক্তদল; আর, যে দলের শেষে রুদ্ধস্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনি তার নাম রুদ্ধদল। **মাত্রা, কলা**—প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন— 'মাত্রা' মানে আদর্শ মান। অর্থাৎ যে স্বল্পায়তন বস্তুর আনুপাতিক সংখ্যা গণনা করে কোনো বৃহত্তর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, তাকে বলা হয় 'মাত্রা'। প্রবোধচন্দ্র 'ছন্দের কারবার ধ্বনিপরিমাণ নিয়ে, কালপরিমাণ নিয়ে নয়।' **যতি, ছেদ**—পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে নিয়মিত থামা—এর নাম যতি। পদ্যরচনার মূল উদ্দেশ্য ধ্বনির শ্রুতিমাধুর্য এবং গতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। প্রবোধচন্দ্র শুনিয়েছেন ৫-রকম যতির নামঅণুতি, উপযতি, লঘুযতি, অর্ধযতি, পূর্ণযতি। তিনি এই পাঁচ প্রকার যতিকে দলযতি, উপপর্বযতি, পর্বযতি, পদযতি, পঙ্‌ক্তিযতি নামে অভিহিত করেছেন। **পর্ব, অতিপর্ব**—প্রবোধচন্দ্র বলেছেন 'লঘুযতির দ্বারা খণ্ডিত পদ-বিভাগের পারিভাষিক নাম 'পর্ব'। 'পর্ব' শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ। **উপপর্ব**—উপযতি দ্বারা বিভক্ত অংশের নাম উপপর্ব। অমূল্যধনের 'পর্বাঙ্গ' আর প্রবোধচন্দ্রের 'উপপর্ব' পর্বেরই এক-একটি বিভাগ। **পদ**—প্রবোধচন্দ্র বলেছেন 'অর্ধযতির দ্বারা খণ্ডিত পঙ্‌ক্তিবিভাগের পারিভাষিক নাম 'পদ'। **পঙ্‌ক্তি**—পুরো থামার যতিকে বলা হয় পূর্ণযতি', এক পূর্ণযতি থেকে আর এক পূর্ণযতি পর্যন্ত পুরো ছত্রটির নাম পঙ্‌ক্তি। **স্তবক, শ্লোক**—কয়েকটি পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে ছান্দসিকেরা বলেন স্তবক। সাধারণভাবে

'স্তবকে'র অন্তর্গত চরণের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়—২ থেকে ৮ পর্যন্ত, এমনকি তার চেয়েও বেশি হতে পারে। **সংশ্লেষ, বিশ্লেষ**—'সংশ্লেষ' এর অর্থ রুদ্ধদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, আর বিশ্লেষ'-এর অর্থ রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ। **শ্বাসাঘাত, প্রস্বর**—অমূল্যধনের মতে, পর্বের অন্তর্গত কোনো অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ অন্য অক্ষরের স্বরধ্বনির তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলেই ঐ অক্ষরের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়ে। এরকম ঝোঁকের নাম তিনি দিলেন শ্বাসাঘাত। প্রবোধচন্দ্রও দলের উচ্চারণে ঝোঁকের কথা মানেন। তবে তাঁর বিচারে সে-ঝোঁক তীব্র হয়ে পড়ে কেবল পর্বের প্রথম দলে। এই ঝোকের নাম প্রস্বর। **মিল**—মিল হচ্ছে আসলে স্তবকের মাঝখানে একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পৃথক পৃথক অবস্থানে ফিরে ফিরে আসা। পর্ব-পদ-পঙ্‌ক্তি-চরণ যার শেষেই হোক, মিলটা শেষে থাকে তার চলতি নাম অন্ত্যমিল—পর্বান্ত্য পঙ্‌ক্তি-অন্তক চরণান্ত্য মিল।

১.৫ অনুশীলনী

১. উদাহরণসহ কাকে বলে, লিখুন —
   দল, মাত্রা, পর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি, স্তবক।

২. 'দল' কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. চতুর্মাত্রক ও পঞ্চমাত্রক পর্বের একটি করে উদাহরণ দিন।
   দ্বিপদী ও ত্রিপদী পদের একটি করে উদাহরণ দিন।

৫. অতিপর্ব কাকে বলে। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৬. পর্ব আর পদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ব্যাখ্যা করুন।

৭. 'চরণ' ও 'পঙ্‌ক্তি' এ দুয়ের সম্পর্কটি বুঝিয়ে বলুন।

৮. শ্বাসাঘাত' ও 'প্রস্বর' পৃথক নামকরণের কারণ কী?

৯. 'মিল' বলতে কাকে বোঝানো হয়? উদাহরণ দিয়ে দেখান।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. নূতন ছন্দ-পরিক্রমা- প্রবোধচন্দ্র সেন।

২. বাংলা ছন্দের মূল সূত্র- অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

৩. আধুনিক বাংলা ছন্দ- নীলরতন সেন।

৪. বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা- নীলরতন সেন।

৫. ছন্দ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একক ৩ : বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

একক গঠন :

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ মূলপাঠ : বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

৩.৩.১ ছন্দের ত্রিরীতির নামান্তর

৩.৩.২ দলবৃত্ত / শ্বাসাঘাতপ্রধান

৩.৩.৩ কলাবৃত্ত / ধ্বনিপ্রধান

৩.৩.৪ মিশ্রবৃত্ত / তানপ্রধান

৩.৪ বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

পূর্বের এককে দেওয়া হয়েছে বাংলা ছন্দের পারিভাষিক পরিচয়। ফলে আপনাদের ছন্দের বারান্দায় চলাচলে আপনারা যে কিছুটা সহজ হয়েছেন, তা অনুমান করা যেতে পারে। এবারে আমরা প্রবেশ করব ছন্দের মূল আলোচ্য বিষয়ে। দেখে নেব ছন্দের রীতি-পদ্ধতির ভাগ এবং সেসব রীতির নামান্তর। উদাহরণসহ রীতিগুলির পরিচয় দেওয়া হবে।

৩.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ছন্দের মূল তিনটি রীতি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। প্রত্যেক অগ্রগণ্য ছান্দসিক বা ভাষাতাত্ত্বিক তিনটি রীতির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। গোল বেধেছে অন্যত্র। এই তিন রীতিকে কী নামে ডাকা হবে, কোন নামে ওই রীতিগুলির প্রতি সুবিচার করা হবে, তা নিয়ে মতান্তর আছে। যাঁরা ছন্দরসিক, তাঁরা যথার্থ নাম নিয়ে চিন্তিত নন। তাঁরা চলনটি চেনেন। সমস্যাটা দাঁড়ায় শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে। এত মতের অরণ্যে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হন।

বাংলা ছন্দ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এছাড়া আছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ

দত্ত ও আরও অনেকে। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং মত অনুসারে তিনটি রীতির নামকরণ করেছিলেন। এরপর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২) অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে ছন্দ চেনার কলাকৌশল, রীতিনীতি এবং পারিভাষিক শব্দসম্ভার হাজির করলেন। বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হল। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে তার সংজ্ঞা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গৃহীত হল। দীর্ঘদিন শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

অন্যদিকে প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দ নিয়ে গভীর অভিনিবেশের পরিচয় ধারাবাহিকভাবে দিয়ে চলছিলেন বহু গ্রন্থে। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তার ছন্দ-সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যা এগারোটি। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ছন্দ সোপান' (১৯৮০) এবং 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা' (১৯৮৬)। শেষের বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়। এই বইটিতে তিনি অমূল্যধনের সংজ্ঞা-বিচার-বিশ্লেষণের ত্রুটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুযায়ী তুলে ধরেন। সবচেয়ে গুরুত্ব পায় নামকরণ প্রসঙ্গটি।

কারণ নামকরণের ওপরেই বাংলা ছন্দরীতির গভীর তাৎপর্যটি লুকিয়ে আছে। প্রথম পর্যায়ে তিনি ত্রিরীতির যে নামকরণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে নিজেই তাকে সংশোধন করেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে ছন্দের পরিভাষা এবং ছন্দের ত্রিরীতির নামকরণ তিনি করেছেন। বাংলা কবিতার তিনটি ছন্দরীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রবোধচন্দ্র সেন-অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পৃথক পৃথক যুক্তি দেখিয়ে তিনটি ছন্দরীতির তিনটি করে নাম সুপারিশ করেছেন। প্রবোধচন্দ্রের কাছে যে রীতি দলবৃত্ত, অমূল্যধনের কাছে তা শ্বাসাঘাতপ্রধান; প্রবোধচন্দ্রের কলাবৃত্ত-ই অমূল্যধনের ধ্বনিপ্রধান; আর, প্রবোধচন্দ্রের মিশ্রবৃত্ত অমূল্যধনের কাছে তানপ্রধান। এঁদের পদ্ধতি পৃথক, সিদ্ধান্ত কখনো কখনো এক। এ কারণে আমরা আমাদের আলোচনায় তাঁর নামকরণকেই প্রাধান্য দেব।

৩.৩ মূলপাঠ : বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

৩.৩.১ বাংলা ছন্দের ত্রিরীতির নামান্তর

দলবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)	কলাবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)	মিশ্রবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)
।	।	।
স্বরবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)	মাত্রাবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)	অক্ষরবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)
।	।	।
শ্বাসাঘাতপ্রধান (অমূল্যধন)	ধ্বনিপ্রধান (অমূল্যধন)	তানপ্রধান (অমূল্যধন)
।	।	।
প্রাকৃত (রবীন্দ্রনাথ)	সাধু (রবীন্দ্রনাথ)	সাধু (রবীন্দ্রনাথ)
।	।	।
মাত্রিক (দ্বিজেন্দ্রলাল)	মিতাক্ষর, নূতন (দ্বিজেন্দ্রলাল)	মিতাক্ষর, পুরাতন (দ্বিজেন্দ্রলাল)
।	।	।

চিত্রা (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)	হৃদ্যা (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)	আদ্যা (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)
।	।	।
স্বরবৃত্ত (সুনীতিকুমার)	মাত্রাবৃত্ত (সুনীতিকুমার)	অক্ষরবৃত্ত (সুনীতিকুমার)
।	।	।
পাদকমাত্রিক (কালিদাস রায়)	স্বরমাত্রিক (কালিদাস রায়)	অক্ষরমাত্রিক (কালিদাস রায়)

৩.৩.২ দলবৃত্ত বা শ্বাসঘাতপ্রধান রীতি

দলবৃত্ত আর শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি একই ছন্দরীতির দুটি নাম। এ-রীতির ছন্দে প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার সে-দল মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক। অর্থাৎ, দলই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম প্রবোধচন্দ্র রাখেন দলবৃত্ত। আবার অমূল্যধন লক্ষ করলেন, এ-রীতিতে প্রতিটি পর্বে অন্তত‌পক্ষে ১টি করে শ্বাসাঘাত পড়ে-ই। অতএব, এর নাম হল শাসাঘাতপ্রধান। এ রীতির প্রতিটি দলের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং ১-মাত্রা, পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অমূল্যধনের বিবেচনায় এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদল) ওপর, হলন্ত অক্ষর না থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর। যেমন,

ঠাকুরদাদার। মতো বনে ।। আছেন ঋষি। মুনি, (৪+৪। ৪+২)
তাঁদের পায়ে। প্রণাম করে ।। গল্প অনেক। শুনি। (৪+৪। ৪+২)

—শিশু, বনবাস।

দলসংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে, প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চারটি করে দল, আর অপূর্ণ পর্বে দুটি করে। একটু মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে, আমাদের উচ্চারণে এই দৃষ্টান্তের রুদ্ধদলগুলি সংকুচিত হয়ে মুক্তদলের সমান হয়ে যায় অর্থাৎ মুক্ত ও রুদ্ধ নির্বিশেষে সব দলই হয় সমান মানের। ফলে এই রীতির ছন্দে মুক্ত ও রুদ্ধ দলের কোনো ভেদ না মেনে সব দলই একমাত্রা বলে গণ্য করা হয়। হিসাব করলে দেখা যাবে, এই দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চারটি করে দল, অপূর্ণ পর্বে দুটি করে। দলসংখ্যার এই সমতার উপরেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত। ফলে এই রীতিতে এক দলই এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। তাই এই রীতিকে বলা যায় দলমাত্রক বা দলবৃত্ত (syllabic) রীতি।

দলবৃত্ত রীতিতে সব রুদ্ধদল আমাদের উচ্চারণে সংকুচিত হয়ে মুক্তদলের সমান হয়। কিন্তু যদি একটি মাত্র রুদ্ধদল পঙ্‌ক্তির অন্তে থাকে, তবে আমাদের উচ্চারণে সেটি প্রলম্বিত হয়ে দুই দলের আসন অধিকার করে। যেমন—

সবই হেথায়। একটা কোথাও ।। করতে হয় রে। শেষ, (৪+৪। ৪+২)
গান থামিলে। তাই তো কানে ।। থাকে গানের। রেশ। (৪+৪। ৪+২)
কাটলে বেলা। সাধের খেলা ।। সমাপ্ত হয়। বলে (৪+৪। ৪+২)
ভাবনাটি তার। মধুর থাকে।। আকুল অশ্রু। জলে। (৪+৪। ৪+২)

—ক্ষণিকা, শেষ।

এই 'শেষ' কবিতাটি আগাগোড়াই ৪। ৪ ।। ৪। ২ দলমাত্রার ছন্দে রচিত। অধিকাংশ স্থলেই পঙ্‌ক্তির শেষ অপূর্ণ পর্বে আছে দুটি মুক্তদল, মাঝে মাঝে একটি রুদ্ধদল। তাতে কানে খটকা লাগে না, ছন্দও কাত হয়ে পড়ে না। এর থেকেই বোঝা যায়, এসব স্থলে একটি রুদ্ধদল দুই মুক্ত দলের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারে। পঙ্‌ক্তির শেষে পূর্ণযতির অবকাশ থাকে বলেই এই সমতারক্ষা সম্ভব হয়। এ-রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন—

হায় রে কবে। কেটে গেছে ।। কালিদাসের। কাল,
পণ্ডিতেরা। বিবাদ করে ।। লয়ে তারিখ। সাল।
আপাতত। এই আনন্দে ।। গর্বে বেড়াই। নেচে,
কালিদাস তো। নামেই আছেন ।। আমি আছি। বেঁচে।

—ক্ষণিকা, সেকাল

কানের বিচারেই বোঝা যায়, 'কাল' ও 'সাল', একটি রুদ্ধদল নিয়ে গড়া এই শব্দ-দুটি আমাদের উচ্চারণে অলক্ষিত ভাবেই দুই দল নিয়ে গড়া 'নেচে' ও 'বেঁচে' শব্দের সমান গুরুত্ব লাভ করে।

৩.৩.৩ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি

যে ছন্দ-রীতি প্রবোধচন্দ্রের কাছে কলাবৃত্ত, তা-ই অমূল্যধনের কাছে ধ্বনিপ্রধান। প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া হিসেব থেকে জেনেছি —১-মাত্রার প্রতিটি দল হ্রস্ব এবং তার ধ্বনি পরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ, তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। এখন যে ছন্দ রীতির আলোচনা করছি, সেখানে প্রতিটি মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা এবং মাত্রাও ১টি; প্রতিটি রুদ্ধদল দীর্ঘ, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা এবং মাত্রা ২টি। অর্থাৎ 'কলা'-ই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম **কলাবৃত্ত।**

প্রবোধচন্দ্র বলেছেন—'কলা' একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিপরিমাণ, অতএব, 'কলাবৃত্ত' রীতিতে প্রতিটি দলের অন্তর্গত ধ্বনিপরিমাণের হিসেব নির্দিষ্ট, দলের মাত্রা-ও নির্দিষ্ট। অমূল্যধনের কথাতেও, এ-রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান। স্পষ্ট উচ্চারণে অক্ষরের অন্তর্গত প্রতিটি ধ্বনির হিসেব এখানে রাখতে হয়। এই কারণে, স্বরান্ত অক্ষর (মুক্তদল) এ-রীতিতে হ্রস্ব হলেও হলন্ত অক্ষর (রুদ্ধদল) দীর্ঘ হতে চায়। অর্থাৎ, স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা আর হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা নির্দিষ্ট। অক্ষরের ধ্বনিপরিমাণ বা ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে মাত্রা নির্দিষ্ট হয় বলেই এ রীতির নাম ধ্বনিপ্রধান। উদাহরণ—

ক-ল্‌লোলে। কোলাহলে। জাগে এ-ক্‌। ধ্বনি,
অ-ন্‌ধে-র্‌। ক-ণ্‌ঠে-র্‌। গা-ন্‌ আগ। -মনী।

—চিত্রবিচিত্র, আগমনী

এই দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে চার দল নেই। কিন্তু আমাদের উচ্চারণে এই দৃষ্টান্তের রুদ্ধদলগুলি প্রসারিত হয়ে মুক্তদলের দ্বিগুণ হয়ে যায়, অর্থাৎ দুটি মুক্তদলের সমান হয়। পূর্বে বলেছি একটি অনায়ত

মুক্তদলের সমপরিমাণ ধ্বনির পারিভাষিক নাম কলা (mora)। প্রতি মুক্তদলে এক কলা এবং রুদ্ধদলে দুই কলা হিসাবে গণনা করলে এই দৃষ্টান্তের প্রতি পর্বে পাওয়া যাবে চার কলা অপূর্ণ পর্বে দুই কলা। কলাসংখ্যার এই সমতার উপরেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত। ফলে এই রীতিতে এক কলাই এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। তাই রীতিকে বলা যায় কলামাত্রক বা কলাবৃত্ত (moric) রীতি। এ রীতির প্রতিটি মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) হ্রস্ব উচ্চারণ ১-মাত্রা, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) দীর্ঘ উচ্চারণ এবং ২-মাত্রা; পূর্ণপর্বে ৪ থেকে ৭ মাত্রা প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে, ৫ থেকে ৮ মাত্রা অমূল্যধনের হিসেবে।

সংস্কৃত কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলাভাষায় লেখা চর্যাপদে আর ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এমন এক ধরনের 'কলাবৃত্ত' ছন্দরীতি প্রয়োগ করা হত, সেখানে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল ২-মাত্রা পায়। হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদলের ১-মাত্রা আর রুদ্ধদলের ২-মাত্রা অবশ্য বহাল থাকে। প্রবোধচন্দ্রের কথায় এ ছন্দরীতির নাম 'প্রাচীন কলাবৃত্ত'। আধুনিক কালের কিছু কিছু কবিতায় এ রীতির প্রয়োগ রয়েছে।

পূর্বে বলা হয়েছে, রুদ্ধদলের সার্বত্রিক সম্প্রসারণ হল কলাবৃত্ত রীতির প্রধান নিয়ম। এই নিয়মটিরও কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় এই রীতির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই। এখানে এ-রকম ব্যতিক্রমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১। জগতে যত। মহৎ আছে
হইব নত। সবার কাছে,
হৃদয় যেন। প্রসাদ যাচে
তাঁদের দ্বারে। দ্বারে।.....
ক্ষুদ্র কাজ। ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে। জাগিয়া রয়,
বৃহৎ বলে। না মনে হয়
'বৃহৎ কল্প'।-নারে।

—মানসী, দেশের উন্নতি

২। রাজার ছেলে। ফিরেছি দেশে। দেশে
'সাত সমুদ্র'। তেরো নদীর। পার।
যেখানে যত। মধুর মুখ। আছে
বাকি তো কিছু। রাখি নি দেখি।-বার।

—সোনার তরী, নিদ্রিতা

৩। ছিলাম যবে। মায়ের কোলে
বাঁশি বাজানো। শিখাবে বলে
চোরাই করে। এনেছ মোরে। তুমি

বিচিত্রা হে। বিচিত্রা,
যেখানে তব। 'রঙের রঙ্গ'-ভূমি।

—পরিশেষ, বিচিত্রা

৪। অনেক কথা। যাও যে বলে। কোনো কথা না। বলি',
তোমার ভাষা। বোঝার আশা। দিয়েছি 'জলাঞ্'।-জলি।

—গীতবিতান (প্রেম), 'অনেক কথা'।

৫। কিনি বিনি কাশী। স্থির হয়ে থাকো,
'খবর্দার কেউ'। নোড়ো চোড়ো নাকো।

—লক্ষ্মীর পরীক্ষা, দ্বিতীয় দৃশ্য, ক্ষীরো-র উক্তি

এই পাঁচ দৃষ্টান্তের পাঁচটি শব্দে (যথাক্রমে কল্পনা, সমুদ্র, রঙ্গভূমি, জলাঞ্জলি ও খবর্দার) একটি করে রুদ্ধদল প্রসারিত হয়ে সংকুচিত রূপে উচ্চারিত হয়।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতিতে মুক্তদল সাধারণত হ্স্ব এবং ১-মাত্রার, এ কথা জানলেন। এরপর এই রীতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তদলের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার হতেও দেখবেন। ২ মাত্রার মুক্তদল আছে ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, 'জনগণমন অধিনায়ক' কবিতায়, এবং আধুনিক কালের দু-চারটি বাংলা কবিতায়। সংস্কৃত কাব্য কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলা কবিতায়, বিশেষ করে চর্যাপদে, এবং ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষব পদাবলিতে এ রীতির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল। এই কারণে প্রবোধচন্দ্র একে বলেন প্রাচীন কলাবৃত্ত। এর চলতি নাম অবশ্য 'প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত' বা 'প্রত্নকলাবৃত্ত'।

৩.৩.৪ মিশ্রবৃত্ত রীতি বা তানপ্রধান

বাংলা ছন্দের আর-একটি রীতিরও দুটি নাম পাশাপাশি চলছে—মিশ্রবৃত্ত আর তানপ্রধান। আমরা জেনেছি—দলবৃত্ত রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, রুদ্ধদলও ১-মাত্রার। কলাবৃত্তে মুক্তদল ১-মাত্রার, কিন্তু রুদ্ধদল ২-মাত্রার। আর, আমাদের আলোচ্য রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রায় নির্দিষ্ট হলেও রুদ্ধদল কিন্তু ১-মাত্রার হতে পারে, আবার ২ মাত্রারও হতে পারে। এটা নির্ভর করে রুদ্ধদলটি শব্দের (Word) অবস্থানের ওপর। এই রীতিতে শব্দের আদি ও মধ্য রুদ্ধদল হবে ১-মাত্রার, অন্ত্য এবং একক রুদ্ধদল ২-মাত্রা হয়। আলোচ্য রীতিতে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ্য করলেন রুদ্ধদলের দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—একটি ১-মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব, আর একটি ২-মাত্রার কলাবৃত্ত স্বভাব। এর অর্থ, এ-রীতি আসলে দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রণেই তৈরি। এই কারণে এ রীতির নাম হল মিশ্রবৃত্ত। এই শ্রেণীর কবিতা পড়তে পড়তে অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে একটা টানা সুর। এই টানা সুর বা সুরের টান বা 'তান'-কেই এ ছন্দরীতির বিশেষ লক্ষণ বলে তাঁর কাছে মনে হল। সেই কারণে এ-রীতিকে তিনি বললেন তানপ্রধান।

অতএব, যে ছন্দরীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, আদি ও মধ্য রুদ্ধদল ১-মাত্রার, অন্ত্য এবং একক রুদ্ধদল ২-মাত্রার, তাকেই বলব মিশ্রবৃত্ত। ওই মিশ্রবৃত্তেরই অন্য নাম তানপ্রধান। রুদ্ধদলের মাত্রার

হিসেব দিয়েই প্রবোধচন্দ্র ছন্দরীতি নির্ধারণ

ভালোমন্দ। দুঃখসু-খ্। অন্ধকা-র। আলো
মনে হ-য়্। স-ব নিয়ে। এ ধরণী। ভালো।

—চৈতালী, ধরাতল

এই দৃষ্টান্তের ছন্দোরীতিও আসলে কলাবৃত্ত রীতিরই রূপান্তর মাত্র। তাতে রুদ্ধদলের অবস্থানভেদে তার উচ্চারণে ও কলাগণনায় কিছু হেরফের ঘটে। এই রীতিতে শব্দের অন্তে অবস্থিত রুদ্ধদল আমাদের উচ্চারণে প্রসারিত হয়ে দুই কলা-পরিমিত হয়। একদল শব্দের রুদ্ধদলও শব্দান্ত্য বলে গণ্য হয়। আর, শব্দের অপ্রান্ত্য রুদ্ধদল সাধারণতঃ সঙ্কুচিত হয়ে এক কলা বলেই গণ্য হয়। এই হিসাবে তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'মন্দ' শব্দের মন্, 'দুঃখ' শব্দে 'দুঃ' এবং 'অন্ধকার' শব্দের অন্, এই তিন দলের প্রত্যেকটি এক কলার সমান এবং সুখ্, কার্, হয়্, এই চার দলের প্রত্যেকটি দুই কলার সমান। আর, মুক্ত দল তো স্বভাবতঃই এককলা-পরিমিত। সুতরাং মুক্তদল ও শব্দের অপ্রান্ত্য রুদ্ধদলে এক কলা আর শব্দান্ত্য রুদ্ধদলে দুই কলা হিসাবে গণনা করলে এই তৃতীয় দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণপর্বে চার কলা এবং অপূর্ণ পর্বে দুই কলা পাওয়া যাবে। তাতেই বোঝা যায়, এই রীতিতেও কলা-কেই ছন্দের মাত্রা বলে গণ্য করা হয়। তার মানে এই রীতিও আসলে কলাবৃত্ত। তবে তাতে রুদ্ধদলের দুই রূপের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। এই বিশিষ্টতার জন্য এই রীতির নাম হয়েছে **মিশ্র-কলাবৃত্ত,** সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত** (composite)।

তিন রীতির ছন্দের উদাহরণ পূর্বের এককে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হয়েছে বলে নতুন করে আর উদাহরণ দেওয়া হল না।

৩.৪ বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ

প্রথমেই বলে রাখি, বৈষ্ণব পদাবলী গেয় কবিতা। গীতিকবিতা হওয়ার কারণে কবিরা প্রতি পর্বে বা পদে মাত্রাসংখ্যায় সমতা রক্ষা করেন। ফলে আমরা দেখি প্রয়োজনমতো স্থানে মুক্তদলের দৈর্ঘ্য ১ মাত্রা থেকে বেড়ে ২ মাত্রা হয়েছে। এই বৃদ্ধি তিন ধারার ছন্দেই হতে পারে। প্রাচীন এ-ধরনের রীতিটি ব্যবহৃত হয় বলে প্রাচীন দলবৃত্ত, প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মিশ্রবৃত্ত নামে একে অভিহিত করা হয়। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

উদাহরণ ১

১১১ ১১১১। ২ ১ ২ ১ ১।
গগনে অবঘন। মে-হ দা-রুন।
১১১ ২ ১১ ১১১১ I
সঘনে দা-মিনী চমকই I = ৭+৭+১১
১১১ ২ ১ ১। ১১১ ১১১১।
কুলিশ পা-তন। শবদ ঝনঝন।
১১১ ১১১১ ১১১১ I
পবন খরতর বলগই = ৭+৭+১১

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত। সপ্তমাত্রিক পদের ত্রিপদী দুটি পঙ্ক্তি। তৃতীয় পদ ১১ মাত্রার।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. চারটি মুক্তদল দীর্ঘ হয়েছে। ২. রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর নেই।

উদাহরণ ২ ২১১ ২১১। ১১১ ১ ২ ২ I

মন্‌দির বা-হির। কঠিন কপা-ট- I = ৮+৮ = ১৬

১১১১ ২১১। ২ ১১ ২ ২ I

চলইতে শঙ্‌কিল। পঙ্‌কিল বা-ট- I = ৮+৮ = ১৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)। মাত্রারীতি ঃ হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা। আদি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত। চতুর্মাত্রিক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। অষ্টমাত্রিক পদ।

উদাহরণ ৩ ১১১ ১১১ ১১ ১১ ২

ঘরের বাহিরে দণ্‌ডে শতবার

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২।

তিলে তিলে আইসে যায়্। I = ৬+৬+৮ = ২০

১১ ১১১১ ১১১ ১১১

মন উচাটন নিশাস সঘন।।

১১ ১ ১ ১ ১ ২

কদম্‌র কাননে চায়্। I = ৬+৬+৮ = ২০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, অন্ত্যরুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত। ষন্মাত্রিক পদের ত্রিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। তৃতীয় পদ ৮ মাত্রার।

উদাহরণ ৪ ২ ১১ ২১ ১:১১১১ ১১১১

কণ্‌টক গা-ড়ি ক:মলসম পদতল

২ ১১ ২ ১১ ২ ২

মঞ্‌জীর চী-রহি ঝাঁ-পি-। I = ৮+৮+১২

২ ১১ ২ ২ ১১ ১১ ২ ১১

গা-গরি বা-রি ঢারি করি পী-ছল

১১১১ ২ ১১ ২ ২

চলতহি অঙ্‌গুলি চা-পি-।। I = ৮+৮+১২

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত। অষ্টমাত্রিক পদের ত্রিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। তৃতীয় পদ ১২ মাত্রার। চতুর্মাত্রিক পর্ব।

উদাহরণ ৫

২ ১ ১১ ১১: ২১ ২ ১১
ঝম্‌পি ঘন। গর:জন্‌তি সন্‌তিতি
১১১ ১১ ১১ ২১১
ভুবন ভরি বরিখন্‌তিয়া। I = ৭+৭+১১
২ ১ ২ ১১ ২ ১ ২ ১১
কান্‌ত পা-হুন কা-ম দা-রুণ
১১১ ১১ ১১ ২ ১১
সঘনে খর শর হতিয়া।। I = ৭+৭+১১

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২ মাত্রা। রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত। সপ্তমাত্রিক পদের ত্রিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। তৃতীয় পদ ১১ মাত্রার।

উদাহরণ ৬

১১ ১১ ১১১১ ১১ ২ I
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। I = ১২
১১১ ১১১ ১১ ১১১ ১১১ ২
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
১১১ ১১১ ২ ১১
আকুল করিল মোর প্রাণ। I = ৮+৮+১০
১ ১১ ১১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ২।
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো—
১১১ ১১১ ১১ ১১
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। I
১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১১১ ১১১ ২
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো—
১১১ ১১১ ২ ১১
কেমনে পাইব সই তারে।। I

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২ মাত্রা। রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত। অষ্টমাত্রিক পদের ত্রিপদী তিনটি পঙ্‌ক্তি, একপদী একটি পঙ্‌ক্তি। প্রথম পঙ্‌ক্তি ১২ মাত্রার। অবশিষ্ট পঙ্‌ক্তিগুলির তৃতীয় পদ ১০ মাত্রার।

উদাহরণ ৭ ১১১ ১ ১ ১ ১১ ১১ ১ ১১১

রূপের পাথারে আঁখি। ডুবি সে রহিল। I = ৮+৬ = ১৪

১১ ১১ ১১ ১১ ১১১১ ১১

যৌবনের বনে মন। হারাইয়া গেল।।I = ৮+৬ = ১৪

১১ ১ ১ ১১ ২ ১১ ১১ ২

ঘরে যাইতে পথ মোর্। হৈল অফুরান্ I = ৮+৬ = ১৪

১১১ ১১১ ১১ ১ ১১ ১১ ১*

অন্তরে বিদরে হিয়া। কি জানি করে প্রাণ্ I

সংকেত-চিহ্ন I অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা। রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত। ১৪ মাত্রার চারটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। সমিল অপ্রবহমান পয়ার।

ব্যতিক্রম ঃ 'প্রাণ' শব্দটি রুদ্ধদল হলেও ১ মাত্রা পেয়েছে।

উদাহরণ ৮ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ২

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে। গুণে মন ভোর্। I = ৮+৬ = ১৪

১১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১১ ২

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে। প্রতি অঙ্গ মোর্।। I = ৮+৬ = ১৪

১১১ ১১১ ১১ ১১ ২ ১১।

হিয়ার পরশ লাগি। হি মোর কান্দে। I = ৮+৬ = ১৪

১১১ ১১১ ১১ ১১ ১১ ১২।

পরান পিরীতি লাগি। থির নাহি বান্ধে।। I = ৮+৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা। রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত। ১৪ মাত্রার চারটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। সমিল অপ্রবহমান পয়ার।

উদাহরণ ৯ ১১ ১১ ২১১ ২ ১ ১২ ১১

একে পদ পঙ্‌কজ। পঙ্‌কে বিভূ-ষিত

২ ১১ ১১ ১১ ২ ১

কণ্টকে জর জর ভে-ল। I = ৮+৮+১০

১১ ১১১১ ১১ ১১ ১১ ২১১

তুয়া দরশন আশে। কছু নাহি জা-নলুঁ

১১১১ ১১ ১১ ২ ১

চিরদুখ অব দূরে গে-ল।। I = ৮+৮+১০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২ মাত্রা। রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ প্রাচীন কলাবৃত্ত। অষ্টমাত্রিক পদের ত্রিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। পঙ্‌ক্তিগুলির তৃতীয় পদ ১০ মাত্রার।

উদাহরণ ১০ ১১১ ১১১ ১ ১১ ১১১

সুখের লাগিয়া। এ ঘর বাঁধিনু

১ ১১ ১১১ ১১।

আনলে পুড়িয়া গেল। I

১১১ ১১১ ১ ২ ১১১

অমিয়া সাগরে সিনান্ করিতে

১১১ ১১১ ১১

সকলি গরল ভেল।। I = ৬+৬+৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২ মাত্রা। রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ মিশ্রবৃত্ত। ষন্মাত্রিক পদের ত্রিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। পঙ্‌ক্তিগুলির তৃতীয় পদ ৮ মাত্রার।

৩.৫ সারাংশ

বাংলা কবিতার তিনটি ছন্দরীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রবোধচন্দ্র সেন-অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পৃথক পৃথক যুক্তি দেখিয়ে তিনটি ছন্দরীতির তিনটি করে নাম সুপারিশ করেছেন। প্রবোধচন্দ্রের কাছে যে রীতি দলবৃত্ত, অমূল্যধনের কাছে তা শ্বাসাঘাতপ্রধান; প্রবোধচন্দ্রের কলাবৃত্ত-ই অমূল্যধনের ধ্বনিপ্রধান; আর, প্রবোধচন্দ্রের মিশ্রবৃত্ত অমূল্যধনের কাছে তানপ্রধান। এঁদের পদ্ধতি পৃথক, সিদ্ধান্ত কখনো কখনো এক।

দলবৃত্ত আর শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি একই ছন্দরীতির দুটি নাম। এ-রীতির ছন্দে প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার সে-দল মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক। অর্থাৎ, দলই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম প্রবোধচন্দ্র রাখেন দলবৃত্ত। আবার অমূল্যধন লক্ষ করলেন, এ-রীতিতে প্রতিটি পর্বে অন্ততপক্ষে ১টি করে শ্বাসাঘাত পড়ে-ই। অতএব, এর নাম হল শ্বাসাঘাতপ্রধান। দলসংখ্যার এই সমতার উপরেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত। ফলে এই রীতিতে এক দলই এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। তাই এই রীতিকে বলা যায় দলমাত্রক বা দলবৃত্ত (syllabic) রীতি।

প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া হিসেব থেকে জেনেছি ১-মাত্রার প্রতিটি দল হ্রস্ব এবং তার ধ্বনি পরিমাণ ১ কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ, তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। যেখানে প্রতিটি মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা এবং মাত্রাও ১টি; প্রতিটি রুদ্ধদল দীর্ঘ, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা এবং মাত্রা ২টি। অর্থাৎ 'কলা'-ই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম কলাবৃত্ত। রুদ্ধদলের

সার্বত্রিক সম্প্রসারণ হল কলাবৃত্ত রীতির প্রধান নিয়ম। কলাবৃত্ত রীতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তদলের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার হতেও দেখা যায়। ২ মাত্রার মুক্তদল আছে ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, 'জনগণমন অধিনায়ক' কবিতায়, এবং আধুনিক কালের দু-চারটি বাংলা কবিতায়। প্রবোধচন্দ্র একে বলেন প্রাচীন কলাবৃত্ত। এর চলতি নাম অবশ্য 'প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত' বা 'প্রত্নকলাবৃত্ত'। বৈষ্ণব পদাবলী গেয় কবিতা। গীতিকবিতা হওয়ার কারণে কবিরা প্রতি পর্বে বা পদে মাত্রাসংখ্যায় সমতা রক্ষা করেন। ফলে আমরা দেখি প্রয়োজনমতো স্থানে মুক্তদলের দৈর্ঘ্য ১ মাত্রা থেকে বেড়ে ২ মাত্রা হয়েছে। এই বৃদ্ধি তিন ধারার ছন্দেই হতে পারে। প্রাচীন এ-ধরনের রীতিটি ব্যবহৃত হয় বলে প্রাচীন দলবৃত্ত, প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মিশ্রবৃত্ত নামে একে অভিহিত করা হয়।

প্রবোধচন্দ্র লক্ষ্য করলেন রুদ্ধদলের দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—একটি ১-মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব, আর একটি ২-মাত্রার কলাবৃত্ত স্বভাব। এর অর্থ, এ-রীতি আসলে দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রণেই তৈরি। এই কারণে এ রীতির নাম হল মিশ্রবৃত্ত। অতএব, যে ছদরীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, আদি ও মধ্য রুদ্ধদল ১-মাত্রার, অন্ত্য এবং একক রুদ্ধদল ২-মাত্রার, তাকেই বলব মিশ্রবৃত্ত। এই রীতিও আসলে কলাবৃত্ত। তবে তাতে রুদ্ধদলের দুই রূপের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। এই বিশিষ্টতার জন্য এই রীতির নাম হয়েছে **মিশ্র-কলাবৃত্ত,** সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত** (composite)।

৩.৬ অনুশীলনী

১. বাংলা ছন্দের কয়টি রীতি? তাদের নামোল্লেখ করে একটি করে উদাহরণ দিন।
২. বাংলা ছন্দের রীতিগুলির নামান্তর লিখুন। একই সঙ্গে নামকরণ-কারীর নামোল্লেখ করুন।
৩. বাংলা ছন্দের রীতিগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
৪. বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী? যে কোনো একটি পদ বিশ্লেষণ করে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।
৫. দলবৃত্ত ছন্দের নামকরণ কে করেছেন? তিনি কী কারণে এই নামকরণ করেছেন?
৬. 'কলাবৃত্ত' শব্দের 'কলা' শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে বলুন।
৭. 'মিশ্রবৃত্ত ছন্দের পূর্বতন নাম কী ছিল? নামকরণ পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. নূতন ছন্দ-পরিক্রমা- প্রবোধচন্দ্র সেন।
২. বাংলা ছন্দের মূল সূত্র- অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।
৩. আধুনিক বাংলা ছন্দ- নীলরতন সেন।
৪. বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা- নীলরতন সেন।
৫. ছন্দ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একক ৪ : বাংলা ছন্দোবন্ধ

একক গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ মূলপাঠ : বাংলা ছন্দোবন্ধ

৪.৩.১ পয়ার ও প্রাথমিক পরিচয়

৪.৩.১.১ আয়তনভেদে পয়ারের দুই রূপ

৪.৩.১.১.১ সাধারণ পয়ার (দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত)

৪.৩.১.১.২ মহাপয়ার (দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত)

৪.৩.১.২ রীতিভেদে পয়ারের তিনরূপ

৪.৩.১.২.১ দলবৃত্ত (সাধারণ পয়ার, মহাপয়ার)

৪.৩.১.২.২ কলাবৃত্ত (সাধারণ পয়ার, মহাপয়ার)

৪.৩.১.২.৩ মিশ্রবৃত্ত (সাধারণ পয়ার, মহাপয়ার)

৪.৩.১.৩ গতিভঙ্গিভেদে পয়ারের তিনরূপ

৪.৩.১.৩.১ অপ্রবহমান

৪.৩.১.৩.২ প্রবহমান (অমিত্রাক্ষর)

৪.৩.১.৩.৩ মুক্তক

৪.৩.২ চতুর্দশপদী

৪.৪ সারাংশ

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

পূর্বের এককে দেওয়া হয়েছে বাংলা ছন্দের রীতি-পদ্ধতির ভাগ এবং সেসব রীতির নামান্তর। এবারে আমরা প্রবেশ করব ছন্দের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে। একে বলে ছন্দোবন্ধ। ছন্দোবন্ধ কাকে বলে, তার পরিচয় বিস্তৃত দেখব এই এককে। শিক্ষার্থী ছন্দের বিস্তৃততর ক্ষেত্রের পরিচয় পাবেন। সরলভাবে এককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ছন্দোবন্ধের নানা শাখা-প্রশাখা।।

৪.২ প্রস্তাবনা

পূর্বের এককে আমরা দেখিয়ে এসেছি তিন রীতির ছন্দের পরিচয়। এবার আমরা দেখে নেব ছন্দোবন্ধের পরিচয়। ছন্দরীতি হল ছন্দের প্রকৃতি, আর ছন্দোবন্ধ' ছন্দের আকৃতি। ছন্দরীতি নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, 'ছন্দোবন্ধ' নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের ওপর। কোন্‌দল কত মাত্রা ধরে উচ্চারণ করব—এর ওপর নির্ভর করে ছন্দরীতি। মাত্রাবিন্যাসের পর যতি কোথায় পড়বে, অর্থাৎ পর্বের মাপ কত মাত্রার হবে, পর্বের পর পর্ব সাজিয়ে কীভাবে পঙ্‌ক্তি তৈরি করব—এর ওপর নির্ভর করে 'ছন্দোবন্ধ'।

৪.৩.১ পয়ার-পরিচয় (আয়তন, রীতি ও গতিভঙ্গিভেদ)

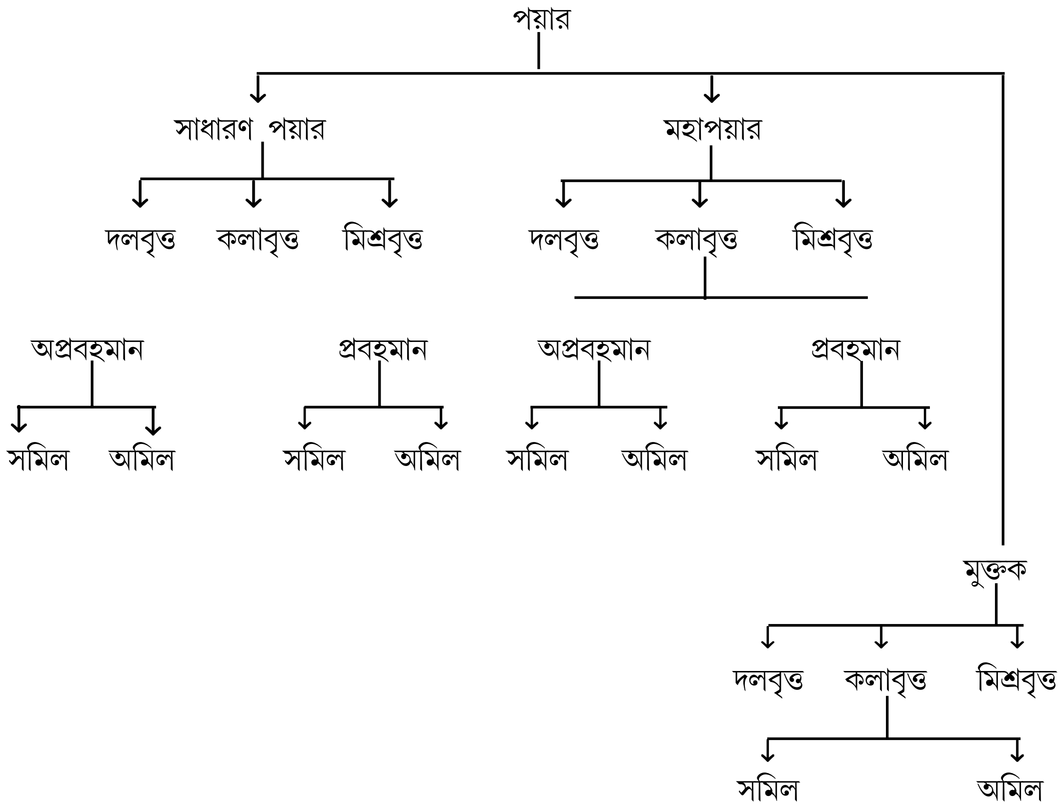

১. আয়তনভেদে পয়ারের দুই রূপ- ক. সাধারণ পয়ার খ. মহাপয়ার।

২. রীতিভেদে পয়ারের তিনরূপ- ক. দলবৃত্ত খ. কলাবৃত্ত গ. মিশ্রবৃত্ত।

৩. গতিভঙ্গিভেদে পয়ারের তিনরূপ — ক. অপ্রবহমান খ. প্রবহমান গ. মুক্ত

৪. তিন রীতির পয়ারেরই তিন রকম গতিভঙ্গি হতে পারে।

৫. তিন রকম গতিভঙ্গিরই সমিল এবং অমিল রূপ লভ্য।

‘পয়ার একটি ছন্দোবন্ধ-র নাম। ৮+৬ মাত্রার পদবিন্যাসে পঙ্‌ক্তি তৈরি হলে তার ছন্দোবন্ধের নাম ‘পয়ার’। ‘পয়ার’ নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন ছন্দোবদ্ধ।

প্রাচীন ছন্দোবন্ধে পয়ারের মূল লক্ষণ—

১ পদের পর্ববিভাগ থাকবে ৪+৪। ৪+২ = ৮+৬ মাত্রা। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৪ মাত্রার সাধারণ পয়ার পঙ্‌ক্তির কোনো নড়চড় হবে না।

২. পয়ারে সমিল এবং অমিল পঙ্‌ক্তি দুই-ই থাকতে পারে।

৩. প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ২টি করে পদ থাকবে।

৪. প্রথম পদ ৮ মাত্রার, দ্বিতীয় পদ ৬-মাত্রার হবে। পদের মাত্রাবিভাজন এর অন্যথা হবে না।

৫. সাধারণ পয়ারে ১৪ মাত্রা এবং মহাপয়ারে ৮+১০ = ১৮ মাত্রা থাকে।

৪.৩.১.১ আয়তনভেদে পয়ারের দুই রূপ

আয়তনের দিক থেকে পয়ারের ২টি রূপ ঃ **সাধারণ পয়ার ও মহাপয়ার**। পয়ারের আয়তন ছিল নির্দিষ্ট- ৮+৬ মাত্রা। প্রথম পর্বের বা (পদের) ৮-মাত্রার ঠিক রেখে দ্বিতীয় পর্বের (বা পদের) দৈর্ঘ্য কোনো কোনো পয়ারে বাড়ানো হল—৬ মাত্রার বদলে ১০-মাত্রা। এর নাম হল বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার। অতএব, ৮+৬ মাত্রার পয়ার যেমনটি ছিল, তেমনই রইল, এর সঙ্গে যুক্ত হল ৮+১০ মাত্রার ‘মহাপয়ার”। পয়ার ও মহাপয়ার — দু’রকম আয়তনেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এর পরেই। পুনরাবৃত্তি করা হল না।

৪.৩.১.২ রীতিভেদে পয়ারের তিনরূপ

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত ছন্দ—রীতির দিক থেকে পয়ারের এই ৩টি রূপ আছে। পয়ার-বন্ধে লেখা পুরোনো সব কবিতারই একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, পয়ার-বন্ধে বাঁধা একটি আধুনিক কবিতার ছন্দরীতি দলবৃত্ত হতে পারে, কলাবৃত্ত হতে পারে, মিশ্রবৃত্তও হতে পারে।

বাংলা ছন্দের তিন রীতি-ভেদে সাধারণ পয়ার ও মহাপয়ার, উভয়েরই তিন রূপ। যথাক্রমে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

৪.৩.১.২.১ দলবৃত্ত পয়ার (৮+৬ মাত্রা)

আজ বিকালে কোকিল ডাকে। শুনে মনে লাগে,
বাংলাদেশে ছিলাম যেন।। তিন শো বছর আগে।

—খেয়া, কোকিল

৪.৩.১.২.২ কলাবৃত্ত পয়ার (৮+৬ মাত্রা)

পূর্ণিমা রাত্রের।। জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা।। তন্দ্রা হারায়।

—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

৪.৩.১.২.৩ মিশ্রবৃত্ত পয়ার (৮+৬ মাত্রা)

জীবন মন্থন-বিষ।। নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল।। করে গেছ দান।

—চৈতালি, কাব্য

তিনটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে মোট চোদ্দ মাত্রা। আট মাত্রার পরে অর্ধযতি, আর বাকি ছয় মাত্রার পরে পূর্ণযতি। অন্য ভাবে বলা যায়, প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি আট ও ছয় মাত্রার দুই পদে বিভক্ত। অতএব তিনটিই পয়ার। কিন্তু শুনতে তিন রকম। ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি তথা শ্রুতরূপ নির্ভর করে তার 'মাত্রাবিন্যাস' প্রণালীর উপরে। মাত্রা—নিরূপণ ও গণনা-প্রণালীর ভিন্নতার জন্যই উদ্ধৃত ত্রিবিধ পয়ার আকৃতিতে এক-রকম হলেও প্রকৃতিতে তিন রকম। তাই শুনতেও তিন রকম।

এবার আমরা দেখে নেব মহাপয়ারের উদাহরণ—

দলবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০)

ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর, ।। এই এসিয়ায় দাঁড়াও সরে এসে,
বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক।। -নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে।
ভাবসাধনার এই ভুবনে ।। এস তোমার নূতন বাণী লয়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ।। ভক্তমালে নূতন মণি হয়ে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অভ্র-আবীর

কলাবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০)

কখনো বা ফাগুনের ।। অস্থির এলোমেলো চাল
জোগাইত নাচনের তাল।—
সমুখে অজানা পথ ।। ইঙ্গিত মেনে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে ।। যাত্রীর পাত্রটি পূরে
সদয় অতীত কিছু ।। সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটিবারে।

—নবজাতক, শেষবেলা

মিশ্রবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০)

সত্য মূল্য না দিয়েই ।। সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় ।। নকল সে শৌখিন সে মজদুরি।

—জন্মদিনে ১০, বিপুলা এ পৃথিবীর

৪.৩.১.৩ গতিভঙ্গিভেদে পয়ারের তিনরূপ

অপ্রবহমান, প্রবহমান ও মুক্তক

শুধু আয়তনভেদে (দৈর্ঘ্যভেদ) ও রীতিভেদে নয়, পয়ারের গতিভঙ্গিভেদের কথাও বলা প্রয়োজন। পুরো পঙ্‌ক্তির গতিভঙ্গিভেদে পয়ার ও মহাপয়ার উভয়েরই তিন রূপ—অপ্রবহমান, প্রবহমান ও মুক্তক। এখানে একে-একে তিন রীতির পয়ার ও মহাপয়ারের এই ত্রিবিধ গতিভঙ্গিভেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

৪.৩.১.৩.১ অপ্রবহমান পয়ার

মিশ্রবৃত্ত পয়ারের অপ্রবহমান রূপ

ছন্দের গতিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ লঘুযতি, অর্ধযতি ও পূর্ণযতির বিন্যাসপ্রণালীর দ্বারা। যে পয়ার পঙ্‌ক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে তাকেই বলা যায় অপ্রবহমান পয়ার। অপ্রবহমান মহাপয়ারেরও এই একমাত্র লক্ষণ। অপ্রবহমান পয়ার ও মহাপয়ার সকলেরই সুপরিচিত। উপরে পয়ার ও মহাপয়ারের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সবই অপ্রবহমান। নূতন দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

অধুনাপূর্ব কালে আট মাত্রার পরে অর্ধযতি রাখাও আবশ্যক বলে গণ্য হত না। অর্থাৎ অর্ধযতি-লোপের নিদর্শনও খুব বিরল ছিল না। ফলে চোদ্দ মাত্রার পয়ার পঙ্‌ক্তি অনেক সময় ছয়-আট, চার-দশ, চার-ছয়-চার, চার-আট-দুই ইত্যাদি মাত্র বিভাগে বিভক্ত হত। এমন কি, সাত-সাত মাত্রার বিভাগও খুব বিরল ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের আমলেও এ-রকম বিভাগ সুপ্রচিলত ছিল। যেমন—

চৌত্রিশ অক্ষরে। বর্ণাইয়া কৈলা স্তব।
অনুকম্পা। স্বপনে হইল। অনুভব।...
সভাসদ্ তোমার। ভারতচন্দ্র রায়,
মহাকবি মহাভক্ত।। আমার কৃপায়।
তুমি তারে। 'রায় গুণাকর'। নাম দিও,
রচিতে আমার গীত।। তাহারে কহিও।

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, গ্রন্থসূচনা

পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি।। চন্দ্রেরে দেখিলে,
কৃষ্ণ চন্দ্রে দেখিতে। পদ্মিনী আঁখি মিলে।...

দুই পক্ষ চন্দ্রের। অসিত সিত হয়,
কৃষ্ণ চন্দ্রে দুই পক্ষ। সদা জ্যোৎস্নাময়।

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণ চন্দ্রের সভাবর্ণন

৪.৩.১.৩.২ প্রবহমান পয়ার

মিশ্রবৃত্ত পয়ার ও মহাপয়ারের প্রবহমান রূপ

যে পয়ার বন্ধের প্রতি পঙ্ক্তির অন্তে পূর্ণযতি রাখা আবশ্যিক নয় তাকেই বলা হয় প্রবহমান পয়ার। অনুরূপ লক্ষণযুক্ত হলে মহাপয়ারও প্রবহমান হয়।

আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ার ও আট-দশ মাত্রাবিভাগের মহাপয়ার, এই দুই ক্ষেত্রেই আট মাত্রার পরে অর্ধযতি ও পঙ্ক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে। আর দুই পঙ্ক্তির শেষে থাকে মিল। এই ধরাবাঁধা নিয়মের দ্বারা ক্ষেত্রবিশেষে কবির স্বাধীনতা যে কিছু-পরিমাণে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। এই দুটি বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যে মধুসূদন সাধারণ পয়ারের অর্ধযতি ও পূর্ণযতি-স্থাপনকে অস্বীকার করে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে পঙ্ক্তির যে-কোনো স্থানে অর্ধযতি ও পূর্ণযতি স্থাপনের স্বাধীনতা অবলম্বন করলেন।

যতি ও মিলের বন্ধনমুক্ত এই নূতন পয়ারই পরিচিত হয়েছে অমিত্রাক্ষর নামে। আধুনিক পরিভাষায় তাকে বলা যায় অমিল প্রবহমান পয়ার। কেননা, অমিত্রাক্ষরতাই, অর্থাৎ মিলহীনতাই এই নূতন পয়ারের আসল লক্ষণ নয়। আসল লক্ষণ তার প্রবহমান গতি। প্রবহমান পয়ার সামিল হতেও বাধা নেই।

প্রবহমান পয়ারকে রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বলা যায় পঙ্ক্তিলঙ্ঘন পয়ার। কেননা পঙ্ক্তিশেষের পূর্ণযতিকে না মেনে চলাই এই নুতন পয়ারবন্ধের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি এই পয়ারের প্রবহমান গতিভঙ্গিকে বলেছেন লাইন-ডিঙোনো চাল বা পঙ্ক্তিলঙ্ঘন।

মধুসূদন-প্রবর্তিত এই মুক্তি ও মুক্তগতি অমিল পয়ার স্বভাবতঃই রচিত হয়েছিল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে। কেননা সেকালে মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দই ছিল সাধু সাহিত্যের একমাত্র বাহন। দলবৃত্ত রীতির ছন্দ ছিল লোকসাহিত্যের বাহন। সাধ সাহিত্যের আসরে তার প্রবেশাধিকার তখনও স্বীকৃত হয়নি। আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নূতন কলাবৃত্ত রীতির আবির্ভাব তখনও অনেক দূরবর্তী।

১। অমিল প্রবহমান পয়ার

সম্মুখ স : মরে পড়ি, বীরচূড়া : মণি I = ৮+৬
বীরবাহু। চলি যবে।। গেলা যম : পুরে I = ৮+৬
অকালে, ক : হ, হে দেবি। অমৃতভা : ষিণি, I = ৮+৬
কোন বীর : বরে বরি।। সেনাপতি :-পদে I = ৮+৬
পাঠাইলা : রণে পুনঃ ।। রক্ষঃ কুল : নিধি I = ৮+৬
রাঘবারি ?...........

—মধুসূদন, মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম সর্গ

লক্ষণীয় এখানে প্রথম বাক্যটি সমাপ্ত হয়েছে ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির প্রথম চার মাত্রার পরে। ওপরের স্তবকটির প্রতিটি ছত্রের মাঝখানে ১টি অর্ধযতি, ছত্রশেষে পূর্ণযতি। যে ৫টি পঙ্‌ক্তি পাওয়া গেল, তার প্রত্যেকটির মাপ ৮+৬ মাত্রা। উদ্ধৃত স্তবকটির ছন্দোবন্ধ নিঃসন্দেহে অমিল প্রবহমান পয়ার। এবারে দেখুন, চরণশেষে মিল নেই কোনো জোড়া-চরণে (মণি-পুরে, ষিণি, পদে, নিধি)। অতএব, স্তবকটি অমিল প্রবহমান পয়ার।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মিলের মাধুর্যটুকু বর্জন না করেও এই মুক্তগতি পয়ারকে এক নূতন রূপ দিলেন। এই নূতন পয়ারকে বলা যায় সমিল প্রবহমান পয়ার। 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' (১৮৯০) ও 'অহল্যার প্রতি' (১৮৯০) এবং 'সোনার তরী' কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' (১৮৯২) এবং 'বসুন্ধরা' (১৮৯৩) কবিতায় এই সমিল মুক্তগতি পয়ার আদর্শ রূপ ধারণ করেছে। এই রচনাগুলি সুপরিচিত।

২। সমিল প্রবহমান পয়ার

কবিবর, কবে কোন বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।

—মেঘদূত

৩। অমিল প্রবহমান মহাপয়ার

ক. গম্ভীর পাতাল। যথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি' রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসজ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে—প্রাণযথা কালের কবল।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বপ্নপ্রয়াণ, পঞ্চম সর্গ (রসাতল, প্রয়াণ)

১১ ২ ১১ ২ । ১১ ১১ ১১১ ১ ২
খ. পুরস্কার প্রত্যাশায়। পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত = ৮+১০
১ ১ ১ ১ ১১১ ১। ১১ ১১ ১১ ১১ ২
যেতে যেতে; জীবনে যা। কিছু তব সত্য ছিল দান = ৮+১০
১১ ১১ ১১ ২। ১১১ ১ ১১ ১ ১১১
মূল্য চেয়ে অপমান। করিও না তারে; এ জনমে = ৮+১০

২ ২ ২ ১১ । ১১১ ১ ১১ ১১ ২
শেষ ত্যাগ হোক তব । ভিক্ষাঝুলি, নব বসন্তের ৮+১০
১ ১১১
আগমনে।.......

—প্রান্তিক

অর্ধযতি ও পূর্ণযতির অবস্থানগত কোনো নির্দিষ্টতা নেই। কবির ভাবপ্রবাহ (এক-একটি বাক্য) বয়ে চলেছে একাধিক পঙ্‌ক্তিতে।

৪। সমিল প্রবহমান মহাপয়ার

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বরে অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

—সোনার তরী, সমুদ্রের প্রতি (১৮৯৩)

যতি বিভাগের কোনো নির্দিষ্টতা নেই। অথচ ছন্দের প্রবহমান গতি সুমসৃণ। রবীন্দ্ররচিত সবরকম প্রবহমান পয়ারেরই এই বিশিষ্টতা।

৫। অমিল প্রবহমান মহাপয়ার

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছি
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর
হতে মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্যমুহূর্তেরে তব

শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।
—প্রান্তিক-১৩, ‘একদা পরমমূল্য’

৪.৩.১.৩.৩ মুক্তক

‘অপ্রবহমান পয়ার’ পয়ারের সব শর্ত মেনে চলে, ‘প্রবহমান পয়ার’ কেবল ২-চরণের সীমানায় ভাবকে ধরে রাখার শাসনটুকু মানে না, আর সব শর্ত মেনে নিতে বাধা নেই। তবে, পয়ারের এই ২টি রূপেই প্রতিটি চরণের মাপ নির্দিষ্ট— ৮+৬ মাত্রা বা ৮+১০ মাত্রা। ক্রমশ পদ্যের স্তবক-রচনায় কবিরা চরণের এই নির্দিষ্ট আয়তন অস্বীকার করতে চাইলেন। ভাবকে ২-চরণের সীমানার বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে আনা ত হল-ই, সেইসঙ্গে চরণের মাপও নানারকম হতে লাগল, কখনো কখনো একটি চরণকে ছোটো-বড়ো নানা ছত্রে সাজিয়ে স্তবক তৈরি করা হল। প্রতি চরণে ২টি পর্ব রাখার শর্তও ভেঙে গেল, ১টি পর্বেই তৈরি হল চরণ। তবে স্তবকটি যে মূলত পয়ারের, এটা বোঝা যাবে সবচেয়ে বড়ো চরণটির মাপ দেখে (৮+৬ বা ৮+১০)। কোনো-না কোনো চরণের এই মাপ থাকবেই। অন্য সব চরণের মাপ এর সমান হতে পারে, এর চেয়ে ছোটোও হতে পারে (৬, ৮ বা ১০-মাত্রা—যা পয়ারের ১টি পর্ব বা পদের মাপ)। এ-ধরনের পয়ারের নাম হল মুক্তক পয়ার।

‘পয়ার’ নামের একটি প্রাচীন ছন্দোবদ্ধ ৮+৬ মাত্রার মাপের ২টি মিত্রাক্ষর (অন্ত্যমিল-থাকা) চরণের শরীর নিয়ে মধ্যযুগের রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ পথ ধরে ক্রমশ পৌঁছল বাংলা কবিতার আধুনিক ঠিকানায়। প্রাচীন চেহারার একটু একটু করে বদল শুরু হল, মধুসূদন-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের মতো কবির হাতে পড়ে নানা রূপের পয়ার তৈরি হতে লাগল। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট মাপের ছোটো পয়ারের পাশাপাশি এল ৮+১০ মাত্রার বড়ো মাপের মহাপয়ার, মিশ্রবৃত্ত রীতির একঘেয়েমি কাটিয়ে গড়ে উঠল দলবৃত্ত আর কলাবৃত্ত রীতির পয়ার, ২-চরণের বাঁধন ছিড়ে ভাব মুক্তি খুঁজে পেল প্রবহমান আর মুক্তক পয়ারে।

আধুনিক পয়ার বৈচিত্র্য পেল আয়তন ছন্দরীতি আর গতিভঙ্গির দিক থেকে। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট আয়তনের পাশে এল ৮+১০ মাত্রার বড়ো ‘পয়ার’ বা ‘মহাপয়ার’। মিশ্রবৃত্তি বা তানপ্রধান ছন্দরীতির পাশাপাশি তৈরি হতে লাগল দলবৃত্ত আর কলাবৃত্ত রীতির পয়ার। যে পয়ারে ভাবের গতি ছিল একটি-দুটি চরণে বদ্ধ—‘অপ্রবহমান’, তা ক্রমশ ‘প্রবহমান’ হল ওই সীমানা পেরিয়ে। চরণে ৮+৬ বা ৮+১০ মাত্রার নির্দিষ্ট ছকও এরপর ভেঙে যেতে লাগল। এমনি করে তৈরি হল **‘মুক্তক’ পয়ার।** ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ এবং ‘মেঘনাদবধকাব্য’-এ মধুসূদন যতি ও মিলের বন্ধন থেকে ছন্দকে মুক্তি দিলেও ১৪ মাত্রার সীমা কিন্তু নির্দিষ্ট ছিল। কালক্রমে সে-সীমাও অন্তর্হিত হল। মুক্তক পয়ারেরও দুই রূপ। সমিল ও অমিল। উদাহরণ দেওয়া যাক।

১. সমিল মুক্তক পয়ার

১.১ গিরিশিরে বরষায়। প্রবলা যেমতি	(৮+৬)
ভীমা স্রোতস্বতী	৬
পথিক দুজনে হেরি। তস্করের দল	(৮+৬)
নাবি নীচে করি কোলা : হল	(৮+২)
উভে আক্রমিল।	৬

— মধুসূদন, নীতিগর্ভ কাব্য

১.২ অজস্র দিনের আলো,	৮
জানি, একদিন	৬
দু'চক্ষুরে দিয়েছিলে। ঋণ।	(৮+২)
ফিরায়ে নেবার দাবি। জানায়েছ আজ	(৮+৬)
তুমি মহারাজ।	৬

—রোগশয্যায়-৪, 'অজস্র দিনের আলো'

২. অমিল মুক্তক পয়ার

২.১ বহু লক্ষ বর্ষ ধরে। জ্বলে তারা,	(৮+৪)
ধাবমান অন্ধকার। কালস্রোতে	(৮+৪)
অগ্নির আবর্ত ঘুরে। ওঠে।	(৮+২)

—পরিশেষ, 'প্রাণ'

৩. সমিল মুক্তক মহাপয়ার

৩.১ এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি।
শুধু উজ্জ্বলিতে; স্বর্গীয়,
সুন্দর।

— দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র

৩.২ তোমার চিকন	৬
চিকুরের ছায়াখানি। বিশ্ব হতে যদি মিলাইত	(৮+১০)
তবে	২
একদিন কবে	৬
চঞ্চল পবনে লীলায়িত	১০

মর্মর-মুখর ছায়া। মাধবী বনের (৮+৬)
হত স্বপনের। ৬

—বলাকা, ছবি

৪. অমিল মুক্তক মহাপয়ার

৪.১ হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণ ডুবিছে অতলে।

—পরিশেষ, জরতী

আয়তনের দিক থেকে ছোটো পয়ার আর বড়ো পয়ার—দু-রকম অমিল প্রবহমান পয়ারই আপনারা দেখলেন। কিন্তু রীতির দিক থেকে প্রতিটি পয়ারই ছিল মিশ্রবৃত্ত। একমাত্র মিশ্রবৃত্ত রীতির হাত ধরেই বাংলা কবিতার অমিল প্রবহমান পয়ার শতায়ু হয়েছে। কলাবৃত্ত অমিল প্রবহমান পয়ার কোনোকালে চালু হয়নি।

মোট কথা। সব রকম পয়ারেরই মূল অবলম্বন দুই মাত্রার অর্ধপর্ব, চার মাত্রার পূর্ণপর্ব, ছয় মাত্রার সার্ধপর্ব এবং আটমাত্রার যুক্তপর্ব। এই চার রকম মাত্রাবিভাগকে নির্দিষ্ট প্রণালীতে উপযতি, লঘুযতি, অর্ধযতি ও পূর্ণযতি দিয়ে চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার সীমার মধ্যে সাজালেই হয় পয়ার বা মহাপয়ার। আর, যতি-স্থাপনের নির্দিষ্ট প্রণালী না মেনে এই মাত্রাবিভাগগুলিকে স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ গদ্যের মতো শুধু ভাবতি অনুসারে চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়ে গেলেই হয় প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ার। সবশেষে, নির্দিষ্ট পঙ্‌ক্তিসীমার বাধাটুকুও সরিয়ে ফেলে কবিভাবনাকে স্বাধীনভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে গেলেই হয় মুক্তক পয়ার। তবু কিন্তু একটা সীমা মেনে চলতে হয়। দেখতে হয় কোনো ভাবতরঙ্গই যেন চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে না যায়।

৪.৩.২ চতুর্দশপদী

আপনারা দেখলেন, 'অমিত্রাক্ষর' পয়ারের একটি বিশেষ রূপ। এবারে দেখবেন, চতুর্দশপদীর জন্মও মূলত পয়ার-বন্ধেরই আর-একটি বিশেষ রকমের প্রয়োগ থেকে। আবার, অমিত্রাক্ষরে'র মতো 'চতুর্দশপদী'ও বাংলা সাহিত্যে এসেছে ইউরোপীয় ছন্দোবন্ধের আদলে। দুটি ছন্দোবন্ধই অনেকটা দেশি টবে ফুটে-ওঠা বিদেশি ফুলের মতো, এদেশে ফুটিয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত। ইতালীয়—ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম সনেট, বাংলায় তারই নাম হল চতুর্দশপদী। তবে, বিকল্প নাম হিসেবে 'সনেট' শব্দটিও বাংলায় চালু।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা সনেটের প্রথম কবি। ষোলো শতকের ফরাসি

কবি ক্লেঁসে মারোর প্রবর্তনায় শুরু হল ফরাসি সনেটের চর্চা। প্রায় একই সময়ে ইংরেজি সনেট-চর্চা শুরু হলেও সতেরো শতকের কবি সেক্সপিয়ারের হাতেই গড়ে উঠল স্বতন্ত্র রীতির সেক্সপীরীয় সনেট। এমনি করে তৈরি হল ইউরোপীয় সনেটের ৩টি আদর্শ—পেত্রার্কীয় ফরাসি আর সেক্সপিরীয়। এই ৩টি আদর্শই মধুসূদনের মাধ্যমে ক্রমশ বাংলা সনেট বা চতুর্দশপদী'র আশ্রয় হয়ে উঠল।

'চতুর্দশপদী' কথাটির সরল অর্থ '১৪টি পদ দিয়ে তৈরি' কবিতা। কিন্তু, বাংলায় যে ধরনের কবিতা 'চতুর্দশপদী' নামে চিহ্নিত, তার শরীর ১৪টি চরণ দিয়ে গড়া, ১৪টি পদ দিয়ে নয়। 'পদ' কথাটির বিশেষ অর্থ এখানে 'চরণ'। এক সময়ে কোনো কোনো ছন্দশাস্ত্রে অবশ্য 'পদ' আর 'চরণ' একই অর্থে প্রয়োগ করা হত। এই ১৪টি চরণের সমষ্টি হওয়া 'চতুর্দশপদী' কবিতার প্রথম শর্ত, তবে একমাত্র নয়। একটি কবিতাকে 'চতুর্দশপদী' হবার জন্য কমপক্ষে আরো ৪টি শর্ত মানতেই হয়।

(১) প্রতিটি চরণ হবে পয়ারের—৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার বা ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ার। বাংলা সনেট বা 'চতুদর্শপদী'র প্রথম কবি মধুসূদনের মোট ১০৮টি কবিতার প্রতিটি চরণ ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ আর মোহিতলাল মজুমদার ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ারও প্রয়োগ করেছিলেন 'চতুর্দশপদী'তে।

(২) গোটা কবিতাই লেখা হবে কেবল মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে।

(৩) স্তবক-বিভাগ হবে নির্দিষ্ট ছকে। সে ছক তৈরি হবে এই ৩টি আদর্শের যেকোনো ১টিতে—পেত্রার্কীয় ফরাসি সেক্সপিরীয়।

পেত্রার্কীয় আদর্শে একটি কবিতায় স্তবক থাকবে ২টি—প্রথমটি ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ৬-চরণের (ষটক)। ফরাসি আদর্শে ৩টি স্তবকের—প্রথম স্তবক ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ২-চরণের (যুগ্নক), তৃতীয়টি ৪-চরণের (চতুষ্ক)। সেক্সপীরীয় আদর্শে স্তবকের সংখ্যা ৪—প্রথম ৩টি ৪-চরণের (চতুষ্ক), শেষেরটি ২-চরণের (যুগ্মক)।

এ সব বিভাগ রূপের দিক থেকেও, ভাবের দিক থেকেও।

(৪) চরণশেষে মিল (অন্ত্যমিল) থাকবে। তবে সে মিল প্রতি ২-চরণের একঘেয়ে অন্ত্যমিল নয়। মিল তৈরি হবে নির্দিষ্ট ছকে, সে ছক উঠে আসবে নীচের ৩টি ইউরোপীয় আদর্শে যেকোনো ১টি থেকে।

পেত্রার্কীয় মিল—কখখখ-কখখক চছজ-চছজ = অষ্টক + ষট্‌ক

ফরাসি মিল—কখখখ-কখখক গগ চছচ্ছ = অষ্টক + যুগ্মক = চতুষ্ক

সেক্সপিরীয় মিল—কখকখ-গঘগঘ পফপফ চচ = চতুষ্ক + চতুষ্ক + চতুষ্ক + যুগ্মক

চরণের শেষ দলের (বা অক্ষরের) উচ্চারণ থেকেই সাধারণ অন্ত্যমিল তৈরি হয়। ক খ গ ঘ চ ছ জ প ফ—এক-একটি বর্ণ 'চতুর্দশপদী' এক-একটি চরণের শেষ দলের উচ্চারণের চিহ্ন। পরের দৃষ্টান্তগুলিতে চরণশেষে এসব চিহ্ন পরপর সাজিয়ে মিলের ছক নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন।

তখন দেখবেন, প্রতিটি ‘চতুর্দশপদী’র মিলের ছক কোনো-না-কোনো আদর্শের আদলে তৈরি। তবে দুটি-একটি এমন দৃষ্টান্তও চোখে পড়বে, যেখানে নির্দিষ্ট আদর্শ পুরোপুরি মানা হয়নি। বাঙালি কবিরা ‘চতুর্দশপদী’ লিখতে গিয়ে একটু স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতাই কেবল ৭টি যুগ্মকের সমষ্টি—অর্থাৎ, ২-চরণের ৭টি অন্ত্যমিল সাজানো এক একটি ‘চতুর্দশপদী’।

অতএব, একটি ১৪-চরণের কবিতা ওপরের ৪টি শর্ত মানলে তবেই হয়ে ওঠে ‘চতুর্দশপদী’। এর অন্তর্গত ভাব প্রবহমান হতে পারে, না-ও হতে পারে। অর্থাৎ, ছেদ-যতির মিলন থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে।

ইতালি-ইংরেজ-ফরাসি সনেটের আদলে তৈরি বাংলা কবিতার ছন্দোবন্ধের নাম **চতুর্দশপদী**।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা, যোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারো, আর সতেরো ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ার—এঁদের হাতে তৈরি হল সনেটের ৩টি আদর্শ। এই ৩টি আদর্শেই লেখা হতে লাগল বাংলা সনেট বা ‘চতুর্দশপদী’, প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত।

‘চতুর্দশপদী’ কবিতাকে ১৪-চরণের কাঠামো নিয়ে আরো ৪টি শর্ত মেনে চলতে হয়—প্রতিটি চরণ পয়ারের, ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান, পেত্রার্কীয় ফরাসি বা সেক্সপিরীয় ছকে স্তবক-বিভাগ, একই ছকে চরণ-শেষের মিল। ছক-তিনটি এইরকম—

ছক	স্তবক-বিভাগ	চরণশেষের মিল
পেত্রার্কীয়	৮-চরণ (অষ্টক) + ৬-চরণ (ষট্‌ক)	কখখক-কখখক চছজ-চছজ
ফরাসি	৮-চরণ (অষ্টক) + ২-চরণ (ষট্‌ক) + ৪-চরণ (চতুষ্ক)	কখখক-কখখক গগ-চছছজ
সেক্সপিরীয় ৪	চরণ (চতুষ্ক) + ৪-চরণ (ষট্‌ক) + ৪-চরণ + ২-চরণ (যুগ্মক)	কখখক-গঘগঘ পপফ-চচ

ক খ গ ঘ প ফ চ ছ জ—এগুলি চরণশেষের মিলের চিহ্ন।

তবে ইউরোপীয় আদর্শের ছক বাঙালি সনেট-কারেরা সবসময় মেনে চলেননি। এমনকী, রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতা কেবল ১৪-চরণের মিশ্রবৃত্ত পয়ার, অথচ ‘চতুর্দশপদী’ নামেই চালু।

৪.৪ সারাংশ

আয়তনভেদে পয়ারের দুই রূপ ক. সাধারণ পয়ার খ. মহাপয়ার। রীতিভেদে পয়ারের তিনরূপ ক. দলবৃত্ত খ. কলাবৃত্ত গ. মিশ্রবৃত্ত। গতিভঙ্গিভেদে পয়ারের তিনরূপ ক. অপ্রবহমান খ. প্রবহমান গ. মুক্তক। তিন রীতির পয়ারেরই তিন রকম গতিভঙ্গি হতে পারে। তিন রকম গতিভঙ্গিরই সমিল এবং অমিল রূপ লভ্য। ‘পয়ার একটি ছন্দোবন্ধ-র নাম। ৮+৬ মাত্রার পদবিন্যাসে পঙ্‌ক্তি তৈরি হলে তার ছন্দোবন্ধের নাম ‘পয়ার’। ‘পয়ার’ নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ। পদের

পর্ববিভাগ থাকবে ৪+৪। ৪+২ = ৮+৬ মাত্রা। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৪ মাত্রার সাধারণ পয়ার পঙ্‌ক্তির কোনো নড়চড় হবে না। পয়ারে সমিল এবং অমিল পঙ্‌ক্তি দুই-ই থাকতে পারে। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ২টি করে পদ থাকবে। প্রথম পদ ৮ মাত্রার, দ্বিতীয় পদ ৬-মাত্রার হবে। পদের মাত্রাবিভাজন এর অন্যথা হবে না। সাধারণ পয়ারে ১৪ মাত্রা এবং মহাপয়ারে ৮+১০ = ১৮ মাত্রা থাকে। দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত ছন্দ-রীতির দিক থেকে পয়ারের এই ৩টি রূপ আছে। পয়ার-বন্ধে লেখা পুরোনো সব কবিতারই একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, পয়ার-বন্ধে বাঁধা একটি আধুনিক কবিতার ছন্দরীতি দলবৃত্ত হতে পারে, কলাবৃত্ত হতে পারে, মিশ্রবৃত্তও হতে পারে।

সব রকম পয়ারেরই মূল অবলম্বন দুই মাত্রার অর্ধপর্ব, চার মাত্রার পূর্ণপর্ব, ছয় মাত্রার সার্ধপর্ব এবং আটমাত্রার যুক্তপর্ব। আর, যতি-স্থাপনের নির্দিষ্ট প্রণালী না মেনে এই মাত্রাবিভাগগুলিকে স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ গদ্যের মতো শুধু ভাবযতি অনুসারে চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়ে গেলেই হয় প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ার। সবশেষে, নির্দিষ্ট পঙ্‌ক্তিসীমার বাধাটুকুও সরিয়ে ফেলে কবিভাবনাকে স্বাধীনভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে গেলেই হয় মুক্তক পয়ার।

চতুর্দশপদীর জন্মও মূলত পয়ার-বন্ধেরই আর-একটি বিশেষ রকমের প্রয়োগ থেকে। ‘চতুর্দশপদী’ও বাংলা সাহিত্যে এসেছে ইউরোপীয় ছন্দোবন্ধের আদলে। দুটি ছন্দোবন্ধই অনেকটা দেশি টবে ফুটে-ওঠা বিদেশি ফুলের মতো, এদেশে ফুটিয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত। ইতালীয়—ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম সনেট, বাংলায় তারই নাম হল চতুর্দশপদী। তবে, বিকল্প নাম হিসেবে ‘সনেট’ শব্দটিও বাংলায় চালু। চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা সনেটের প্রথম কবি। ষোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারোর প্রবর্তনায় শুরু হল ফরাসি সনেটের চর্চা। প্রায় একই সময়ে ইংরেজি সনেট-চর্চা শুরু হলেও সতেরো শতকের কবি সেক্সপিয়ারের হাতেই গড়ে উঠল স্বতন্ত্র রীতির সেক্সপীরীয় সনেট। এমনি করে তৈরি হল ইউরোপীয় সনেটের ৩টি আদর্শ—পেত্রার্কীয় ফরাসি আর সেক্সপিরীয়। এই ৩টি আদর্শই মধুসূদনের মাধ্যমে ক্রমশ বাংলা সনেট বা ‘চতুর্দশপদী’র আশ্রয় হয়ে উঠল। ‘চতুর্দশপদী’ কথাটির সরল অর্থ ‘১৪টি পদ দিয়ে তৈরি’ কবিতা। কিন্তু, বাংলায় যে ধরনের কবিতা ‘চতুর্দশপদী’ নামে চিহ্নিত, তার শরীর ১৪টি চরণ দিয়ে গড়া, ১৪টি পদ দিয়ে নয়। ‘পদ’ কথাটির বিশেষ অর্থ এখানে ‘চরণ’। ‘চতুর্দশপদী’ হবার জন্য প্রতিটি চরণ হবে পয়ারের—৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার বা ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ার। গোটা কবিতাই লেখা হবে কেবল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে। স্তবক-বিভাগ হবে নির্দিষ্ট ছকে। সে ছক তৈরি হবে এই ৩টি আদর্শের যেকোনো ১টিতে—পেত্রার্কীয় ফরাসি সেক্সপিরীয়। চরণশেষে মিল (অন্ত্যমিল) থাকবে। তবে সে মিল তৈরি হবে নির্দিষ্ট ছকে। ইতালি-ইংরেজ-ফরাসি সনেটের আদলে তৈরি বাংলা কবিতার ছন্দোবন্ধের নাম **চতুর্দশপদী**।

৪.৫ অনুশীলনী

১. 'পয়ার' কাকে বলে? তার বিভাজনগুলি উল্লেখ করুন।

২. রীতিভেদে পয়ারের কয়টি রূপ? প্রত্যেক প্রকার পয়ারের একটি করে উদাহরণ দিন।

৩. আয়তনভেদে পয়ারের কয়টি রূপ? একটি করে উদাহরণ দিন।

৪. গতিভঙ্গিভেদে পয়ারের রূপগুলির পরিচয় দিন।

৫. **পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘক** পয়ার নামকরণ কে করেছেন? তার এই নামকরণ করার কারণ কী?

৬. **মুক্তক** ছন্দ কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে তাঁর স্বরূপ বুঝিয়ে দিন।

৭. **চতুর্দশপদী** ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী? বুঝিয়ে বলুন।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. নূতন ছন্দ-পরিক্রমা- প্রবোধচন্দ্র সেন।

২. বাংলা ছন্দের মূল সূত্র- অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

৩. আধুনিক বাংলা ছন্দ- নীলরতন সেন।

৪. বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা- নীলরতন সেন।

৫. ছন্দ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একক ৫-৭ : বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ

একক গঠন :

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ ছন্দলিপি নির্মাণ-পদ্ধতি
৫.৪ মূলপাঠ : বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ
৫.৫ অনুশীলনী
৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককগুলিতে আমরা বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। ছন্দের পাঠ সম্পূর্ণ করতে হলে এবার প্রয়োজন হাতে কলমে মক্‌শো করা। অর্থাৎ বিবিধ প্রকার বাংলা কবিতার ছন্দোলিপি প্রস্তুত করার নিয়ম বা প্রণালী। এই এককের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মনোবল বৃদ্ধি করা, যাতে তার পক্ষে ভবিষ্যতে ছন্দ সম্পর্কে ধোঁয়াশা দূর হয়।

৫.২ প্রস্তাবনা

ছন্দ চিনে হাতে-কলমে দেখাতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছন্দলিপি নির্মাণ। ছন্দলিপি প্রস্তুত করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে আরোহণ পদ্ধতিতে ছকটি নির্মিত হয়। তবে একথাও বলে রাখা ভালো, সব কবিতায় যে একই রকম ছক ব্যবহৃত হবে, এমন কোনো কথা নেই। আবার নির্দিষ্ট ছকের পরিবর্তে টানা লেখায়ও ছন্দোবিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

৫.৩ ছন্দলিপি-নির্মাণের পদ্ধতি

ছন্দলিপির ছক : **উদ্ধৃত উদাহরণে**

১. প্রতি চরণে পর্বসংখ্যা—
২. পূর্ণপর্ব—, অপূর্ণপর্ব—
৩. পূর্ণপর্বে মাত্রাসংখ্যা—
৪. অপূর্ণপর্বে মাত্রাসংখ্যা—
৫. প্রতি চরণে পদসংখ্যা—
৬. পঙ্‌ক্তিসংখ্যা—

৭. স্তবকসংখ্যা—

৮. মাত্রাগণনারীতি—

৯. লয়—

১০. ব্যতিক্রম—

১১. ছন্দোরীতি—

অথবা

চতুর্মাত্রিক/পঞ্চমাত্রিক/ষন্মাত্রিক/সপ্তমাত্রিক পর্বের একপদী/দ্বিপদী/ত্রিপদী/চৌপদী একটি/দুটি/তিনটি পঙ্ক্তি। স্তবকসংখ্যা—। মাত্রাগণনা পদ্ধতি—। ছন্দোরীতি—।

৫.৪ মূলপাঠ : বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ

উপরের ১১-দফা কাজ অথবা টানা লেখাটি অনুসরণ করে গেলেই তৈরি হবে একটি স্তবকের ছন্দ-লিপি। ছন্দ-বিশ্লেষণ করার সময় প্রথমে উদাহরণের অংশটুকু দল অনুসারে বিশ্লেষণ করে লিখতে হবে। পর পর উদাহরণ দিই—

১. মুদিত আলোর্। কমল-কলিকা। -টিরে ৬+৬+২ (দুটি পর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)

রেখেছে সন্ধ্যা। আঁধার্-পর্ণ।-পুটে। I ৬+৬+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)

উতরিবে যবে। নব প্রভাতের্। তীরে ৬+৬+২ (দুটি পর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)

তরুণ্ কমল্। আপনি উঠিবে। ফুটে।I ৬+৬+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)

ষণ্মাত্রিক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্ক্তি। স্তবকসংখ্যা ১টি। প্রতি মুক্তদল ১ মাত্রা ও রুদ্ধদল ২ মাত্রা পেয়েছে। এটি কলাবৃত্ত রীতির উদাহরণ।

২. এ দুর্ভাগ্য। দেশ হতে। হে মঙ্গল।-ময়, I ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)

দূর করে। দাও তুমি ।। সরবতুচ্ছ। ভয়। I ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)

মস্তক্তু : -লিতে দাও ।। অনন্ত আ :-কাশে I ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)

উদার আ :-লোক্ মাঝে।। উন্মুক্ত বা :-তাসে। I ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)

চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী চারটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। স্তবক ১টি। প্রতি মুক্তদল একমাত্রা এবং অন্ত্যরুদ্ধদল ও একক রুদ্ধদল ২ মাত্রা করে পেয়েছে। এটি মিশ্রবৃত্ত রীতির উদাহরণ।

পরের উদাহরণগুলিতে রুদ্ধ-মুক্ত পৃথক করে দেখানো হল না।

৩. ১১ ১ ১ । ১ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১ ১। ২

সবই হেথায় । একটা কোথাও ।। করতে হয় রে। শেষ, I (৪+৪। ৪+২)

১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১১ ১ ১ । ১ ১। ২

গান থামিলে। তাই তো কানে ।। থাকে গানের। রেশ। I (৪+৪। ৪+২)

১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১১ ।। ১ ১১ ১। ১১

কাটলে বেলা। সাধের খেলা ।। সমাপ্ত হয়। বলে I (৪+৪। ৪+২)

১ ১ ১ ২ । ১ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১১। ১১

ভাবনাটি তার। মধুর থাকে ।। আকুল অশ্রু। জলে। I (৪+৪। ৪+২)

চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী চারটি পঙ্‌ক্তি। স্তবক ১টি। মুক্তদল এবং রুদ্ধদল নির্বিশেষে ১ মাত্রা করে পেয়েছে। এটি দলবৃত্ত রীতির উদাহরণ। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির অন্তে ‘শেষ’ এবং ‘রেশ’ ২ মাত্রা করে পেয়েছে।

৪. ২ ১১। ২ ১১। ১১।

কাত হয়ে। কান ধরে। দাঁড়া, ।। (৪+৪+২)

২ ১ ১। ২ ১ ১। ১১

জিভখানা। উলটিয়ে। দেখা। I (৪+৪+২)

১১ ১১। ১১ ১১। ১১

ভাল করে। বুঝে শুনে। দেখি।। (৪+৪+২)

২১১ । ১ ১ ২। ১ ১

বিজ্ঞানে। যে-রকম। লেখা। I (৪+৪+২)

চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। চারটি পদেই দুটি পূর্ণপর্ব একটি অপূর্ণপর্ব। স্তবক ১টি। মুক্তদল ১ মাত্রা এবং রুদ্ধদল ২ মাত্রা করে পেয়েছে। আদি রুদ্ধদল ২ মাত্রা। এটি কলাবৃত্ত রীতির উদাহরণ। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির অন্তে ‘শেষ’ এবং ‘রেশ’ ২ মাত্রা করে পেয়েছে।

৫. ১ ১ ১ ১। ১ ১১ ১। ১১

কেশে আমার। পাক ধরেছে। বটে, (৪+৪+২)

১ ১ ১১। ১ ১ ১১। ১১

তাহার পরে। নজর এত। কেন ? I (৪+৪+২)

১ ১ ১১। ১১ ১১। ১ ১

পাড়ার যত। ছেলে এবং। বুড়ো, (৪+৪+২)

১ ১ ১ ১ । ১ ১১১। ১ ১

সবার আমি। একবয়সী। জেনো। I (৪+৪+২)

চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। স্তবক ১টি। মুক্তদল এবং রুদ্ধদল নির্বিশেষে ১ মাত্রা করে পেয়েছে। এটি দলবৃত্ত রীতির উদাহরণ।

৬. ২ ১ ১ ১ ১ । ১১১১ ১১। ২১

ধূপ আপনারে। মিলাইতে চাহে। গন্ধে।। (৬+৬+৩)।

২১ ১ ১১। ১ ১ ১ ১১ ১। ১১

গন্ধ সে চাহে। ধূপেরে রহিতে। জুড়ে। I (৬+৬+২) I

২ ১ ১ ১ ১। ১১ ১ ১ ১ ১। ২১।

সুর আপনারে। ধরা দিতে চাহে। ছন্দে।। (৬+৬+৩)।

২১ ১১১। ১ ১ ১ ১ ২। ১১

ছন্দ ফিরিয়া। ছুটে যেতে চায়। সুরে। I (৬+৬+২) I

ষণ্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। পদের অন্তিম পর্বটি অপূর্ণ। পূর্ণপর্ব ৬ মাত্রার। অন্ত্যমিল আছে ১ম-৩য়, ২য়-৪র্থ পদে। স্তবক ১টি। রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২ মাত্রা করে পেয়েছে। এটি কলাবৃত্ত রীতির উদাহরণ।

৭. চিরদিন টানবে পিছে,। চিরদিন রাখবে নীচে, ।। (৭+৭)।

এত বল নাইরে তোমার,। রবে না সেই টান। I (৭+৫) I

শাসনে যতই ঘের,। আছে বল দুর্বলেরও,।। (৭+৭)।

হও না যতই বড়,। আছেন ভগবান্। I (৭+৫) I

সপ্তমাত্রক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। প্রতি পঙ্‌ক্তির অন্তিম পর্বটি অপূর্ণ। পূর্ণপর্ব ৭ মাত্রার। অন্ত্যমিল আছে। টান-ভগবান শব্দে। স্তবক ১টি। মুক্ত ও রুদ্ধদল নির্বিশেষে ১ মাত্রা করে পেয়েছে। এটি দলবৃত্ত রীতির উদাহরণ।

৮. কমল-পরিমল। লয়ে শীতল জল।। (৭+৭)।

পবনে ঢলঢল। উছল কূলে। I (৭+৫) I

বসন্ত রাজা আনি। ছয় রাগিণী রানী (৭+৭)।

করিলা রাজধানী। অশোকমূলে। I (৭+৫) I

সপ্তমাত্রক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। প্রতি পঙ্‌ক্তির অন্তিম পর্বটি অপূর্ণ। পূর্ণপর্ব ৭ মাত্রার। অন্ত্যমিল আছে প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দে। স্তবক ১টি। মুক্তদল ১ মাত্রা ও অন্ত্যরদ্ধদল এবং একক রুদ্ধদল ২ মাত্রা করে পেয়েছে। এটি মিশ্রবৃত্ত রীতির উদাহরণ।

৯. ফুলের মালা। দীপের আলো। ধূপের ধোঁয়ার।। (৪+৪+৪)।।

পিছন হতে। পাই নে সুযোগ। চরণ ছোঁয়ার,।। (৪+৪+৪)।।

স্তবের বাণীর। আড়াল টানি। তোমায় ঢাকি।I (৪+৪+৪)I

চতুর্মাত্রক পর্বের ত্রিপদী একটি পঙ্ক্তি। পূর্ণপর্ব ৪ মাত্রার। ১২ মাত্রার পদ। অন্ত্যমিল আছে প্রথম দুই পদে। মুক্তদল ও রুদ্ধদল নির্বিশেষে ১ মাত্রা করে পেয়েছে। এটি দলবৃত্ত রীতির উদাহরণ।

১০. জীবন আ:ছিল লঘু ।। প্রথম ব:য়সে।। (৪+৪। ৪+২)
চলেছিনু। আপনার। বলে, I (৪+৪+২) I
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা ঃ নবীন প্রভাতে।। (৪+৪। ৪+২)
আরম্ভিনু। খেলিবার। ছলে। I (৪+৪+২) I

চতুর্মাত্রিক পর্বের ত্রিপদী দুটি পঙ্ক্তি। পূর্ণপর্ব ৪ মাত্রার। ৮, ৬, ১০ মাত্রার পদ। অন্ত্যমিল আছে দুই পঙ্ক্তিতে। মুক্তদল ১ মাত্রা ও অন্ত্যরুদ্ধদল ২ মাত্রা করে পেয়েছে। এটি মিশ্রবৃত্ত রীতির উদাহরণ।

১১. ১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১ ১ ১।১১
বাহুর দম্ভ। রাহুর মতো।। একটু সময়। পেলে I ৪+৪। ৪+২
১ ১ ১ ১ । ১১১ ১ ।। ১ ১ ১ ১ । ১ ১
নিত্য কালের। সূর্যকে সে।। এক গরাসে। গেলে। I ৪+৪। ৪+২
১ ১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১ ১ । ১
নিমেষ পরেই। উগরে দিয়ে। মিলায় ছায়ার। মতো I ৪+৪। ৪+২
১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১ ১ । ১
সূর্যদেবের। গায়ে কোথাও ।। রয় না কোনো। ক্ষত। I ৪+৪। ৪+২

দলবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্বের চারটি ১৪ মাত্রার পয়ার পঙ্ক্তি (৮+৬)। পূর্ণপর্ব ৪ মাত্রার। দ্বিপর্বিক পদ। প্রতি পঙ্ক্তির দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে অন্ত্যমিল। রুদ্ধ মুক্ত নির্বিশেষে সকল দলেই ১ মাত্রা।

১২. ২ ১১। ১১ ১ ১ ।। ২ ২।১ ১
দুন্দুভি। বেজে ওঠে।। ডিম্‌ডিম্‌। রবে, I ৪+৪। ৪+২
২ ২। ২ ১ ১ । ২ ২।১১
সাঁওতাল। পল্লীতে।। উৎসব। হবে।...I ৪+৪। ৪+২
২ ১১। ১ ১ ১ ১ ।। ২ ২। ২।
ওই শুনি। পথে পথে।। হৈ হৈ। ডাক, I ৪+৪। ৪+২
২ ২। ১ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ২। ২
বংশীর। সুরে তালে।। বাজে ঢোল। ঢাক। I ৪+৪। ৪+২
২ ১ ১। ২ ২ ২ ২। ২।
নন্দিত। কণ্ঠের।। হাস্যের। রোল I ৪+৪। ৪+২
২১ ১। ১১ ১ ১ ।। ২ ২। ২।
অম্বর। তলে দিল।। উল্লাস্‌। দোল। I ৪+৪। ৪+২

কলাবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী ছয়টি ১৪ মাত্রার পয়ার পঙ্‌ক্তি (৮+৬)। প্রতি পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে অন্ত্যমিল। প্রতি মুক্তদল ১ মাত্রা ও রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২ মাত্রা করে পেয়েছে।

১৩. ১১ ১১। ১ ১ ১ ১ ।। ১১ ২। ১১

সাধু মহা। রেগে বলে।। যৌবনের। পাতে I ৪+৪। ৪+২

১১ ১১। ১১ ১ ১ ।। ১১ ১১। ১ ১

এত পুণ্য। কেন লেখ।। দেব পূজা। খাতে। I ৪+৪। ৪+২

১১১১। ১১ ১ ১ ।। ১১ ১১। ১১

চিত্রগুপ্ত। হেসে বলে, বড় শক্ত। বুঝাI ৪+৪। ৪+২

১ ১ ১১। ১১ ১ ১ ১১ ১ ১। ১১।

যারে বলে। ভালো বাসা, । তারে বলে। পূজা। I ৪+৪। ৪+২

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী চারটি ১৪ মাত্রার পয়ার পঙ্‌ক্তি (৮+৬)। প্রতি পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে অন্ত্যমিল। প্রতি মুক্তদল ১ মাত্রা ও অন্ত্যরুদ্ধদল ২ মাত্রা পেয়েছে।

১৪. ১১১ ১১। ১ ২ ১১ ।। ১১ ১ ২। ২ ১ ১

ভরিয়া উঠে। নিখিল ভব।। 'রতি-বিলাপ'।-সঙ্গীতে, ৫+৫। ৫+৪

১ ২ ২। ১ ১১ ১ ১ । ১১১

সকল দিক্। কঁদিয়া উঠে। আপনি। I ৫+৫। ৩

১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ২ । ২ ১ ১

ফাগুন মাসে। নিমেষ-মাঝে ।। না জানি কার। ইঙ্গিতে ৫+৫। ৫+৪

১১১ ১১ । ১১১ ১১ । ১১১

শিহরি উঠি। মূরছি পড়ে । অবনী। I ৫+৫। ৩

কলাবৃত্ত রীতিতে পঞ্চমাত্রক পর্বের চৌপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। চতুর্থ পদ অপূর্ণ। দুটি পঙ্‌ক্তিতে মাত্রাসজ্জা (১০+৯), (১০+৩)। রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২ মাত্রা এবং মুক্তদল ১ মাত্রা করে গণনা করা হয়েছে।

১৫. ১১ ১১১১। ১ ২ ১ ২ ১১১১ ২। ২।

উঠ, বঙ্গকবি,। মায়ের ভাষায়।। মুমূর্ষুরে দাও। প্রাণ, I ৬+৬ । ৬+২

১১ ২ ২। ১ ২ ১ ২ ।। ১ ১১ ১১১। ২।

জগতের লোক। সুধার আশায়। সে ভাষা করিবে। পান।....I ৬+৬। ৬+২

১ ২ ১ ১ ১। ২ ২ ১১ । ১ ১১ ১ ১ ১। ১১

বিশ্বের মাঝারে। ঠাঁই নাই বলে। কঁদিতেছে বঙ্গ-ভূমি, I ৬+৬। ৬+২

২ ১ ১ ১ ১। ১১ ২ ১ ১ ।। ২ ১১ ২। ১১

গান গেয়ে কবি। জগতের তলে ।। স্থান কিনে দাও। তুমি I ৬+৬ । ৬+২

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ষণ্মাত্রক পর্ব (৬+৬। ৬+২) দ্বিপদী চারটি পঙ্‌ক্তি। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দ্বিতীয় পদ অপূর্ণ। পঙ্‌ক্তিগুলিতে মাত্রাসজ্জা (১২+৮)। অন্ত্য এবং একক রুদ্ধদল ২ মাত্রা এবং মুক্তদল ১ মাত্রা করে গণনা করা হয়েছে। অন্ত্যমিল আছে ১ম-২য়, ৩য়-৪র্থ- পঙ্‌ক্তিতে।

১৬. ১১১১ ২। ১১ ১ ১ ২

চিরসুখী জন। ভ্রমে কি কখন।। ৬+৬।

১১১ ১ ২। ১১১ ১ ১

ব্যথিত বেদন। বুঝিতে পারে? I ৬+৫I

১ ১১১ ১১। ১১১ ১ ১ ১

কি যাতনা বিষে। বুঝিবে সে কিসে । ৬+৬।

১১ ১ ১ ১ ১। ২ ১ ১ ১১

কভু আশীবিষে। দংশে নি যারে। I ৬+৫I

কলাবৃত্ত রীতিতে ষন্মাত্রক পর্বের (৬+৬। ৬+৫) দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দ্বিতীয় পদ অপূর্ণ। রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২ মাত্রা এবং মুক্তদল ১ মাত্রা করে গণনা করা হয়েছে। দুটি পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যমিল আছে।

১৭. কলাবৃত্ত রীতিতে ষণ্মাত্রক পর্ব (ছ'মাত্রার পর্ব)

১ ২ ১ ২ । ১ ২ ১ ১ ১।। ১১ ১ ১১ ১। ১১

হাজার হাজার। বছর কেটেছে,।। কেহ তো কহে নি। কথা, ৬+৬। ৬+২

১ ২ ১১ ১। ১১১ ২ ১।। ১ ১১ ১ ১১। ১ ১

ভ্রমর ফিরেছে। মাধবী-কুঞ্জে,।। তরুরে ঘিরেছে। লতা।....I ৬+৬। ৬+২।

১১১ ১ ২। ২ ১ ১১১।। ১১১ ১২। ১১

শুনিয়া তপন। অস্তে নামিল,।। শরমে গগন। ভরি, ৬+৬ । ৬+২

১১১ ২১। ১১১ ১১১ ।। ১২ ১ ২। ১১

শুনিয়া চন্দ্র। থমকি রহিল,।। বনের আড়াল। ধরি। I ৬+৬ । ৬+২

১৮. দলবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্ব (সাত মাত্রার পর্ব)—

১১ ১ ১ ১ ১১। ১১১ ১ ১ ১ ১

মরি কার পরশমণি। গগনে ফলায় সোনা; ৭+৭

১১১ ১ ১ ১১। ১১ ১ ১১ ১ ১

হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি। অজানার আনাগোনায়।... I ৭+৭

১১ ১ ১১১১। ১১১ ১ ১ ১১

অলকার রত্নাগারে। ঢুকেছি হঠাৎ যেন, ৭+৭

১১ ১ ১ ১ ১ ১ । ১১১ ১১ ১১
ডুবে যাই চমৎকারে। সায়রে শিশির হেন। I ৭+৭

১৯. মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্ব (৭+৭। ৭+২)।
১ ১ ১ ১১২। ১ ২ ১১ ২ ।। ১ ২ ১ ১ ১১। ১ ১
আনন্দে ত্রিনয়ন। সহিত দেবগণ।। পূজেন নানা আয়ো।-জনে। I
১১১ ১ ১ ২। ১ ১১ ১১ ২ ।। ১ ২ ১১ ১১। ১১
সুধন্য চৈত্র মাস। অষ্টমী সুপ্রকাশ।। বিশদ পক্ষ শুভ। ক্ষণে।...I
১ ২ ১১ ২। ১১১ ১ ১ ২ ।। ১১ ১ ১১১১। ১১
দেউল-বেদীপর। প্রতিমা মনোহর।। তাহাতে অধিষ্ঠিত। মাতা। I
১১১ ১১ ২। ১ ২ ১১ ২ ।। ১১ ১ ১১১ ১ ১১
সর্বতোভদ্র নাম। মণ্ডল চিত্র-নাম।। লিখিলা আপনি বি : ধাতা।। I

২০. কুমোর পাড়ার। গোরুর গাড়ি, ৪+৪ (দুটি পর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
বোঝাই-করা। কলসি, হাঁড়ি। I ৪+৪ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)
গাড়ি চালায়। বংশীবদন, ৪+৪ (দুটি পর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
সঙ্গে যে যায়। ভাগ্নে মদন। I ৪+৪ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)

দলবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্ক্তি (৮+৮)। প্রতি পদে অন্ত্যমিল।

২১. উতল সাগরের। অধীর ক্রন্দন ৭+৭ (দুটি পর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
নীরব আকাশের। মাগিছে চুম্বন। I ৭+৭ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)

কলাবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্ক্তি (১৪+১৪)। প্রতি পদে অন্ত্যমিল।

২২. নগরীরে। অন্ন বিলা। -বার ৪+৪+২ (দুটি পূর্ণপর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)।
আমি আজি। লইলাম। ভার...I ৪+৪+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)।
কহিল সে। নমি সবা। কাছে, ৪+৪+২ (দুটি পূর্ণপর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)।
শুধু এই। ভিক্ষাপাত্র। আছে।....I ৪+৪+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্ক্তি (১০+১০)। প্রতি পদে অন্ত্যমিল।

২৩. মুদিত আলোর। কমল-কলিকা। -টিরে ৬+৬+২ (দুটি পর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)

রেখেছে সন্ধ্যা। আঁধার-পর্ণ। -পুটে।I — ৬+৬+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)
উতরিবে যবে। নব প্রভাতের। তীরে — ৬+৬+২ (দুটি পর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)।
তরুণ কমল। আপনি উঠিবে। ফুটে। I — ৬+৬+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)

এটি কলাবৃত্ত রীতির উদাহরণ। ষন্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্ক্তি। প্রতি পদের অন্তিম পর্ব অপ্দর্ণ। ১ম-৩য়, ২য়-৪র্থ পদে অন্ত্যমিল।

২৪. এ দুর্ভাগ্য। দেশ হতে ।। হে মঙ্গল।-ময়,I — ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)
দূর করে। দাও তুমি।। সর্বতুচ্ছ। ভয়। I — ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)
মস্তক তু : -লিতে দাও।। অনন্ত আ :-কাশেI ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)
উদার আ :-লোক মাঝে ।। উন্মুক্ত বা :-তাসে। I ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)

এটি মিশ্রবৃত্ত রীতির উদাহরণ। দ্বিপদী চারটি পয়ার পঙ্ক্তি।।

২৫. **আমি** হব না ভাই। নববঙ্গে ।। নবযুগের। চালক, I — ৪+৪। ৪+২ (দ্বিপদী পঙ্ক্তি)
আমি জ্বালাব না। আঁধার দেশে ।। সুসভ্যতার। আলোক। I — ৪+৪। ৪+২ (দ্বিপদী পঙ্ক্তি)
যদি ননি-ছানার। গাঁয়ে — ৪+২
কোথাও অশোক-নীপের। ছায়ে।। — ৪+২
আমি কোনো জন্মে। পারি হতে ।। ব্রজের গোপ। বালক, I — ৪+৪। ৪+২ (ত্রিপদী পঙ্ক্তি)
তবে চাই না হতে। নববঙ্গে। নবযুগের। চালক। I — ৪+৪। ৪+২ (দ্বিপদী পঙ্ক্তি)

দলবৃত্ত রীতিতে রচিত এই কবিতায় 'আমি', 'যদি', 'কোথাও', 'তবে' শব্দগুলি অর্থবহ দ্বিমাত্রক। এগুলি 'অতিপর্ব। চতুর্মাত্রক পর্বের তিনটি দ্বিপদী ও একটি ত্রিপদী পঙ্ক্তি। প্রত্যেক পঙ্ক্তিতে অন্ত্যমিল।

২৬. ১ ১ ১ ১ । ১ ১ — ৪+২
চাঁদটি ব'সে। হাসে
১ ১ ১ ১ । ১ ১ — ৪+২
শান্ত নীলা। কাশে।
১ ১ ২ । ২ ১ ১ — ৪+৪
ডাকে মা-১ 'চাঁদ, আ'রে,
২— ১ ১ । ১ ১ — ৪+২
চি-ক দিয়ে। যা রে।

১ ১ ১ ১। ১ ১ ৪+২

একবার তাকায়। সাধে,

১ ১ ১ ১ । ১ ১ ৪+২

আকাশের ঐ। চাঁদে,

১ ১ ১ ১।১১ ৪+২

আবার তাকায়। সুখে

১ ১ ১ ১ ১ ১ ৪+২

কোলের চাঁদের। মুখে।

দলবৃত্ত চতুর্মাত্রক পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তি। দুই পর্বের পদ, অপূর্ণ। এই উদাহরণে 'মা', 'চাঁদ', 'চিক' শব্দ তিনটি উচ্চারণে দীর্ঘ হওয়ায় দু'মাত্রা করে পেয়েছে।

২৭. ১ ১ ১ ১। ২১১।১১ ২ ৪+৪+৪

খ্যাতি আছে। সুন্দরী। বলে তার,I

১১ ১১। ২ ১১। ১ ১ ২ ৪+৪+৪

ত্রুটি ঘটে। নুন দিতে। ঝোলে তার;I

১ ১ ২। ১ ১ ১১। ১১১ ৪+৪+৩

চিনি কম। পড়ে বটে। পায়সেI

১ ১ ১১। ২ ১১। ২ ১ ৪+৪+৩

স্বামী তবু। চোখ বুজে। খায় সে,.I

কলাবৃত্ত একপদী চারটি পঙ্‌ক্তি।তিন পর্বের পদ, পূর্ণ।

২৮. তোমার মাপে। হয়নি সবাই।। তুমিও হওনি। সবার মাপে,I

তুমি মরো। কারও ঠেলায়,। কেউ বা মরে। তোমার চাপে। I

দলবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী—৪+৪। ৪+৪ মাত্রা। 'তুমিও' শব্দের -মিও সঙ্কুচিত হয়ে একমাত্রা পেয়েছে।

২৯. চম্পক। তরু মোরে ।। প্রিয়সখা। জানে সে,

গন্ধের। ইঙ্গিতে।। কাছে তাই। টানে যে-।

কলাবৃত্ত চতুর্মাত্রক পর্বের পূর্ণ দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। ৪+৪। ৪+৪ মাত্রা।'সে' এবং 'যে' শব্দদুটি প্রসারিত হয়ে দুইমাত্রা। পেয়েছে।

৩০. এখন বিঃশ্বের তুমি,। গুন্‌গুন্ মধুকর।

চারি দিকে। তুলিয়াছে বিস্ময়-ব্যা:কুল স্বর।

মিশ্রবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী—৪+৪। ৪+৪ মাত্রা। 'বিশ্বের' এবং 'ব্যাকুল' শব্দদুটিতে পর্বযতি অনাঘাতি।

৩১. ২ ১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১ ।। ১১ ১১। ১১
আজ বিকালে। কোকিল ডাকে।। শুনে মনে। লাগে I ৪+৪। ৪+২ (১৪ মাত্রার পয়ার।)
১ ১ ১ ১ ১ । ১ ১১ ১ ১ ১১ । ১ ১
বাংলাদেশে। ছিলাম যেন।। তিন শো বছর। আগে। I ৪+৪। ৪+২ (১৪ মাত্রার পয়ার।)
দলবৃত্ত দ্বিপদী পয়ার দুটি পঙ্‌ক্তি। সমিল অপ্রবহমান পয়ার।

৩২. সেই আমাদের। দেশের পদ্ম।। তেমনি মধুর। হেসে, ৪+৪। ৪+২
ফুটেছে ভাই। অন্য নামে।। অন্য সুদূর। দেশে। ৪+৪। ৪+২

দলবৃত্ত দ্বিপদী দুটি পয়ার পঙ্‌ক্তি।

৩৩. পূর্ণিমা রাত্রের। জ্যোৎস্না-ধারায় ৪+৪। ৪+২
সান্ধ্য বসুন্ধরা। তন্দ্রা হারায়। ৪+৪। ৪+২
কলাবৃত্ত দ্বিপদী পয়ার পঙ্‌ক্তি। ৪+৪। ৪+২ মাত্রা
৩৪. ২ ১ ১ । ১ ১ ১ ১ ।। ১ ১১ ১: ২
সংসারে। জ্বেলে গেলে।। যে নব আ:লোক, ৪+৪। ৪+২ (৮+৬)
২ ২ । ২ ২ ।। ১১ ২ । ২
জয় হোক,। জয় হোক।। তারি জয়। হোক। ৪+৪। ৪+২ (৮+৬)

২ ১১। ১১ ১১ ।। ২১১। ১১
বন্দীরে। দিয়ে গেছ।। মুক্তির। সুধা, ৪+৪। ৪+২ (৮+৬)
২ ১১। ১১ ১১ ১১ ১ ১:১১
সত্যের। বরমালে। সাজালে ব:সুধা। ৪+৪। ৪+২ (৮+৬)
কলাবৃত্ত চতুর্মাত্রিক পর্বের দ্বিপদী চারটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২ মাত্রা। অন্ত্যমিল ১ম-২য়, ৩য়-৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে।
৩৫. জন্মেছি যে। মর্ত্যকোলে ।। ঘৃণা করি। তারে ৪+৪। ৪+২ মাত্রা (৮+৬ পদমাত্রা)
ছুটিব না। স্বর্গ আর।। মুক্তি খুঁজি:বারে। ৪+৪। ৪+২ মাত্রা (৮+৬ পদমাত্রা)
মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী দুটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। অন্ত্য ও একক রুদ্ধদল ২ মাত্রা।
৩৬. সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে। মেঘে মায়া ঢালে, (৮+৬ পদমাত্রা)
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া। সোনার খেয়ালে। (৮+৬ পদমাত্রা)
মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী দুটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। অন্ত্য ও একক রুদ্ধদল ২ মাত্রা।

৩৭. কো গো চির:জন্ম ভরে 8+8।
নিয়েছে মোর। হৃদয় হরে, 8+8।
উঠছে মনে। জেগে। I 8+২ I
নিত্যকালের। চেনাশোনা। 8+8।
করছে আজি। আনাগোনা 8+8।
নবীন-ঘন। মেঘে। I 8+২ I

দলবৃত্ত চতুর্মাত্রক পর্বের ত্রিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি।

৩৮. অঘ্রান। হল সারা, 8+8 ।
স্বচ্ছ নঃদীর ধারা 8+8।
বহি চলে। কলসংগীতে। I 8+8+২I
কম্পিত। ডালে ডালে 8+8।
মর্মর। তালে তালে 8+8।
শিরীষের। পাতা ঝরে। শীতে। I 8+8+২I

কলাবৃত্ত ত্রিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২ মাত্রা। অন্ত্যমিল ১ম-২য় পঙ্‌ক্তিতে।

৩৯. নামে সন্ধ্যা। তন্দ্রালসা, 8+8।
সোনার অঁঃচল-খসা, 8+8।
হাতে দীপ:শিখা। 8+২I
দিনের কঃল্লোল 'পর 8+8।
টানি দিল। ঝিল্লিস্বর 8+8।
ঘন যবঃনিকা II 8+২I

মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। পঙ্‌ক্তিগুলি দুটি অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে বা পদে বিভক্ত।

৪০. কোথায় কবে। আছিলে জাগি, ।। ৫+৫।
বিরহ তব। কাহার লাগি, ।। ৫+৫।
কোন্ সে তব। প্রিয়া। I ৫+২ I

কলাবৃত্ত পঞ্চমাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি।

৪১. রোদের বেলা। ছায়ার বেলা ।। ৫+৫।
করেছি সুখ। দুখের খেলা, ।। ৫+৫।
সে খেলাঘর। মিলাবে মায়া। সম। I ৫+৫+২ I

কলাবৃত্ত পঞ্চমাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি।

৪২. ওগো কোথা মোর। আশার অতীত,।। ৬+৬। (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ১২)
ওগো কোথা তুমি। পরশ চকিত, ৬+৬। (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ১২)
কোথা গো স্বপন।-বিহারী। I ৬+৩I (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ৯)
মিশ্রবৃত্ত ষন্মাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি।

৪৩. চক্ষে তোমার। কিছু বা করুণা। ভাসে, ।। ৬+৬+২। (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ১৪)
ওষ্ঠে তোমার। কিছু কৌতুক। হাসে, ৬+৬+২। (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ১৪)
মৌনে তোমার। কিছু লাগে মৃদু। সুর। I ৬+৬+২। (পর্বমাত্রা ৬, পদমাত্রা ১৪)
যন্মাত্রক পর্বের কলাবৃত্ত ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি

৪৪. দুয়ার জুড়ে। কাঙাল-বেশে।। (পর্বমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৮)
ছায়ার মতো। চরণ-দেশে।। (পর্বমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৮)
কঠিন তব। নূপুর ঘেঁষে ।। (পমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৮)
আর বসে না। রইব। I (পর্বমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৬)
ষণ্মাত্রক পর্বের দলবৃত্ত চৌপদী পঙ্‌ক্তি।
৪৫. পথপাশে মল্লিকা। দাঁড়াল আসি, ৮+৫ (দুটি পদ)
বাতাসে সুগন্ধের। বাজাল বাঁশি। I ৮+৫ (দুটি পদ)
ধরার স্বয়ম্বরে। ৭
উদার আড়ম্বরে। ৭
আসে বর অম্বরে। ৮
ছড়ায়ে হাসি। I ৫
কলাবৃত্ত রীতি। প্রথম পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি চৌপদী। রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২ মাত্রা।

৪৬. চিরযুবা। শূর-বীর।। বিজয়ীর। কুঞ্জে I ৪+৪। ৪+৪I
আমাদের। মঞ্জীর।। সদালসে। গুঞ্জে। I ৪+৪। ৪+৪I
ভাবে যারা। তন্ময় ৪+৪।
জানে না ম:রণভয়, ৪+৪।
তার লাগি। আনি হয় ৪+৪I
রণধূম-। পুঞ্জে। I ৪+৪।
কলাবৃত্ত চৌপদী। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী। তৃতীয় পঙ্‌ক্তি চৌপদী। রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২ মাত্রা।

৪৭. জগৎ পারা। বারের তীরে ৫+৫। (১০ পদমাত্রা)
ছেলেরা করে। খেলা। I ৫+২ I (৭ পদমাত্রা)
অন্তহীন। গগনতল ৫+৫। (১০ পদমাত্রা)
মাথার 'পরে। অচঞ্চল, ৫+৫। (১০ পদমাত্রা)
ফেনিল ওই। সুনীল জল ৫+৫। (১০ পদমাত্রা)
নাচিছে সারা। বেলা। I ৫+২ I (৭ পদমাত্রা)
উঠিছে তটে। কী কোলাহল ৫+৫। (১০ পদমাত্রা)
ছেলেরা করে। খেলা। I ৫+২ I (৭ পদমাত্রা)

কলাবৃত্তের পঞ্চমাত্রক পর্বের এই উদাহরণের প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি চৌপদী।

৪৮. ঊষার দুয়ারে। হানি আঘাত ৬+৫। (১১ পদমাত্রা)
আমরা আনিব। রাঙা প্রভাত, ৬+৫।(১১ পদমাত্রা)
আমরা টুটাব। তিমির রাত ৬+৫। (১১ পদমাত্রা)
বাধার বিন্ধ্যা। চল। I ৬+২ I (৮ পদমাত্রা)

ষণ্মাত্রক পর্বের কলাবৃত্ত চৌপদী পঙ্‌ক্তি।

৪৯. বিলম্বে এসেছ। রুদ্ধ এবে দ্বার, ৬+৬ (১২ পদমাত্রা)
জনশূন্য পথ। রাত্রি অন্ধকার, ৬+৬। (১২ পদমাত্রা)
গৃহহারা বায়ু। করি হাহাকার। ৬+৬। (১২ পদমাত্রা)
ফিরিয়া মরে। I ৫ I (৫ পদমাত্রা)

মিশ্রবৃত্ত চৌপদী পঙ্‌ক্তি।

৫০. প্রভাতে পথিক ডেকে। যায়, ৭+২। (৯ পদমাত্রা)
অবসর পাইনে আমি। হায়, ৭+২। (৯ পদমাত্রা)
বাহিরের খেলায় ডাকে। যে, ৭+২। (৯ পদমাত্রা)
যাব কী করে। I ৫ I (৫ পদমাত্রা)

সপ্তমাত্রক পর্বের দলবৃত্ত চৌপদী পঙ্‌ক্তি। চারটি পদ। প্রথম তিন পদে দুটি করে পর্ব। প্রথম পর্বে সাত দলমাত্রা করে আছে। প্রথম তিন পদের 'যায়', 'হায়' রুদ্ধদল দু'মাত্রা গণনা করা হয়েছে এবং 'যে' মুক্তদল দীর্ঘ হয়ে দুমাত্রা পেয়েছে। শেষ অপূর্ণ পদ পাঁচ মাত্রার।

৫১. হেরো গো অন্তরে। অরূপ-সুন্দরে, ৭+৭। (১৪ পদমাত্রা)
নিখিল সংসারে। পরম বন্ধুরে, ৭+৭। (১৪ পদমাত্রা)

এস আনন্দিত। মিলন-অঙ্গনে ৭+৭। (১৪ পদমাত্রা)
শোভন-মঙ্গল। সাজে।I ৭+২ I (৯ পদমাত্রা)

সপ্তমাত্রক পর্বের কলাবৃত্ত চৌপদী পঙ্‌ক্তি। চারটি পদ। প্রথম তিন পদে দুটি করে পর্ব। প্রথম পর্বে সাত দলমাত্রা করে আছে।

৫২. অনুকূল বাবু বলে। ঘাস খাওয়া ধরা চাই ৪+৪। ৪+৪ (১৬ পদমাত্রা)
কিছুদিন জঠরেতে। অভ্যেস করা চাই, ৪+৪। ৪+৪ (১৬ পদমাত্রা)
বৃথাই খরচ করে। চাষ করা শষ্য।I ৪+৪। ৪+৪ (১৬ পদমাত্রা)

কলাবৃত্ত মহাত্রিপদী। এখানে 'চাই' এবং 'ষ্য' দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে।

৫৩. খেঁকশেয়ালের দল। শেয়াল দহর ৪+৪। ৪+২ (১৪ পদমাত্রা)
হাঁচি শুনে হেসে মরে। অষ্ট প্রহর, ৪+৪। ৪+২ (১৪ পদমাত্রা)
হাতিবাগানের হাতি। ছাড়িয়া শহর ৪+৪। ৪+২ (১৪ পদমাত্রা)
ভাগলপুরের দিকে। ভাগে। ৪+৪। ২ (১০ পদমাত্রা)

কলাবৃত্ত মহাচৌপদী। এটি অপূর্ণ মহাচৌপদী। তিনটি পদই অপূর্ণ (৬ মাত্রা করে)।

৫৪. সম্মুখ স : মরে পড়ি, বীরচুড়া : মণি I = ৮+৬
বীরবাহু। চলি যবে। গেলা যম : পুরে I = ৮+৬
অকালে, ক : হ, হে দেবি।। অমৃতভা : ষিণি, I = ৮+৬
কোন্ বীর : বরে বরি।। সেনাপতি :-পদে I = ৮+৬
পাঠাইলা : রণে পুনঃ। রক্ষঃ কুল : নিধি I = ৮+৬
রাঘবারি?....

অমিল প্রবহমান পয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।।

৫৫. কবিবর, কবে কোন বিস্মৃত বরষে I = ৮+৬
কোনপুণ্য আষাঢ়ের। প্রথম দিবসে I = ৮+৬
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক I = ৮+৬
বিশ্বের বিরহী যত। সকলের শোক I = ৮+৬
রাখিয়াছে আপঙ্ আঁ:ধার স্তরে স্তরে I = ৮+৬
সঘন সঙ্গীত মাঝে। পুঞ্জীভূত করে। I = ৮+৬

সমিল প্রবহমান পয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।

১১ ২ ১১ ২। ১১ ১১ ১১১ ১ ২।

৫৬. পুরস্কার প্রত্যাশায়। পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত I = ৮+১০
১ ১ ১ ১ ১১১ ১। ১১ ১১ ১১ ১১ ২
যেতে যেতে; জীবনে যা। কিছু তব সত্য ছিল দান I = ৮+১০
১১ ১১ ১১ ২। ১১১ ১ ১১ ১ ১১১
মূল্য চেয়ে অপমান। করিও না তারে; এ জনমে I = ৮+১০
২ ২ ২ ১১। ১১১ ১ ১১ ১১ ২
শেষ ত্যাগ হোক তব। ভিক্ষাঝুলি, নব বসন্তের I = ৮+১০
১ ১১১
আগমনে। ....
অমিল প্রবহমান মহাপয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।।

৫৭. হে আদিজননী সিন্ধু,। বসুন্ধরা সন্তান তোমার, = ৮+১০
একমাত্র কন্যা তব। কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর = ৮+১০
চক্ষে তব, তাই বক্ষ। জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা, = ৮+১০
সদা আন্দোলন; তাই। উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা = ৮+১০
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে = ৮+১০
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে = ৮+১০
ধ্বনিত করিয়া দিশি। দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে = ৮+১০
অসংখ্য চুম্বন কর। আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে = ৮+১০
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি,। নীলাম্বরে অঞ্চলে তোমার = ৮+১০
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি। সন্তর্পণে দেহখানি তার = ৮+১০
সুকোমল সুকৌশলে। = ৮
সমিল প্রবহমান মহাপয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।

৫৮. একদা পরমমূল্য। জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়।
আগন্তুক। রূপের দু:র্লভ সত্তা লভিয়া বসেছি
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি। ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি। তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের। সাথে; দূর যুগান্তর
হতে মহাকালযাত্রী। মহাবাণী পুণ্যমুহূর্তেরে তব

শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ। গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী। অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

অমিল প্রবহমান মহাপয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।

৫৯. গিরিশিরে বরষায়। প্রবলা যেমতি	(৮+৬)
ভীমা স্রোতস্বতী	৬
পথিক দুজনে হেরি। তস্করের দল	(৮+৬)
নাবি নীচে করি কোলা : হল	(৮+২)
উভে আক্রমিল।	৬

সমিল মুক্তক পয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।

৬০. অজস্র দিনের আলো,	৮
জানি, একদিন	৬
দু'চক্ষুরে দিয়েছিলে। ঋণ।	(৮+২)
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ	(৮+৬)
তুমি মহারাজ।	৬

সমিল মুক্তক পয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।

৬১. বহু লক্ষ বর্ষ ধরে। জ্বলে তারা,	(৮+৪)
ধাবমান অন্ধকার। কালস্রোতে	(৮+৪)
অগ্নির আবর্ত ঘুরে। ওঠে।	(৮+২)

অমিল মুক্তক পয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।

৬২. এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজ্জ্বলিতে; স্বর্গীয়,
সুন্দর

সমিল মুক্তক মহাপয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।

৬৩. তোমার চিকন ৬
চিকুরের ছায়াখানি। বিশ্ব হতে যদি মিলাইত (৮+১০)
তবে ২
একদিন কবে ৬
চঞ্চল পবনে লীলায়িত ১০
মর্মর-মুখর ছায়া। মাধবী বনের (৮+৬)
হত স্বপনের। ৬

সমিল মুক্তক মহাপয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।

৬৪. হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণ ডুবিছে অতলে।

অমিল মুক্তক মহাপয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।

৬৫. ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১ ১ ১
নানা ছাপের্। জম্‌ল শিশি নানা মাপের। কৌটো হল। জড়ো I ৮+১০
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১ ১ ১
বছর্ দেড়েক্। চিকিৎসাতে। কর্‌লে যখন্ অস্‌থি জ্বর। জ্বর I ৮+১০

সংকেত-চিহ্ন ও অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১, ২)। দলবৃত্ত। চতুর্মাত্রিক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি।

৬৬. ১১১১ ২ ১ ১। ২ ১১ ১১ = ৮+৬
বনপথে প্রান্তরে। লুণ্ঠিত করি I
২ ২ ১ ১ ২। ১ ১ ২ ১১ = ৮+৬
গৈরি গোধূলির। স্লান উৎতরী I

সংকেত-চিহ্ন ও অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১, ২)। কলাবৃত্ত। ১৪ মাত্রার দ্বিপদী দুটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। সমিল প্রবহমান পয়ার।

৬৭. ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১ ১। ১ ১
আমি যদি। জন্ম নিতে কালিদাসের। কালে I = ৪ + ৪। ৪ + ২ = ১৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১১
দইবে হতেম্। দশম রতন্ নবরত্‌নের্৭ মালে I = ৪+৪। ৪+২ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ও অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১)। মাত্রারীতি ও প্রতি দলে ১-মাত্রা। ছন্দরীতি ও দলবৃত্ত (৮+৬) ১৪ মাত্রার দুটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। বৈশিষ্ট্য ও মুক্তদল ও রুদ্ধদল নির্বিশেষে ১ মাত্রা।

৬৮. ১ ১ ১ ১। ১ ১ ১১।

মেঘ মুলুকে। ঝাপ্‌সা রাতে ।। = ৪+৪ = ৮

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

রাম ধনুকের্। আবছায়াতে ।। = ৪+৪ = ৮

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১

তাল বেতালে। খেয়াল সুরে, = ৪+৪ = ৮

১ ১১ ১। ১১ ১১।

তান ধরেছি। কণ্ঠ পুরে। I = ৪+৪ = ৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি () পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ মুক্ত রুদ্ধদল নির্বিশেষে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ চতুর্মাত্রক পর্বের দলবৃত্ত চৌপদী।

৬৯. ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১। ২

আতা গাছে। তোতা পাখি ডালিম গাছে। মউ I = ৪+৪। ৪+২ = ৮+৬

১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১। ২।

এত ডাকি। তবু কথা কওনা কেন। বউ I = ৪+৪। ৪+২ = ৮+৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ ১৪ মাত্রার দলবৃত্ত দ্বিপদী পয়ারের দুটি পঙ্‌ক্তি। সমিল অপ্রবহমান পয়ার।

ব্যতিক্রম ও 'মউ' এবং 'বউ' পদান্তের দুটি মুক্তদল স্বরদৈর্ঘ্যের কারণে ২ মাত্রা পেয়েছে।

৭০. ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১। ২

বিষ্‌টি পড়ে। টাপুর টুপুর । নদেয় এল। বান্ I = ৪+৪+৪+২ = ১৪ = ৮+৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ২ ১ ১। ২

শিব্ ঠাকুরের্। বিয়ে হল তিন্ কনে। দান্ I = ৪+৪+৪+২ = ১৪ = ৮+৬

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (I) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি মুক্ত-রুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ ১৪ মাত্রার দলবৃত্ত পয়ারের দুটি পঙ্‌ক্তি। সমিল অপ্রবহমান পয়ার।

বৈশিষ্ট্য ঃ রুদ্ধদল 'বান', 'তিন', 'দান'-এর দীর্ঘ উচ্চারণ বলে ২-মাত্রা।

৭১. ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

যাবই আমি। যাবই ওগো ।। বাণিজ্‌জেতে। যাবই I = ৪+৪+৪+২ = ৮+৬

১ ১ ১ ১ ১১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

লখীরে হা:রাবই যদি ।। অলক্‌খীরে। পাবই I = ৪+৪+৪+২ = ৮+৬

সংকেত-চিহ্ন : অর্ধযতি (।।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ও প্রতি দলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ও ১৪ মাত্রার দলবৃত্ত দ্বিপদী দুটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। সমিল অপ্রবহমান পয়ার।

দ্রষ্টব্য : ‘হারাবই’ শব্দে ‘হা’ অনাঘাতি, পর্বচিহ্ন লুপ্ত।

৭২. ১১ ১১ ১ ১ ১১

এক্‌লা হয়ে। দাঁড়িয়ে আছি = ৪+৪।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

তোমার জন্ম। গলির্‌ কোণে I = ৪+৪ I

১ ১ ১ ১ ১ ১১১

ভাবি আমার। মুখ্‌ দেখাব = ৪+৪।

১ ১১ ১ ১ ১১১।

মুখ ঢেকে যায়্‌। বিগ্‌গাপনে। I = ৪+৪ I

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি () পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি মুক্ত-রুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ চতুর্মাত্রক পর্বের দলবৃত্ত দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি।

ব্যতিক্রম ঃ ‘দাঁড়িয়ে’ শব্দটি দ্রুত উচ্চারণে দ্বিমাত্রিক।

৭৩. ১ ১ ১ ১:১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১। ১ ১।

ঘরেতে দু:রনত ছেলে করে দাপা। দাপি। I = ৪+৪+৪+২ = ৮+৬ = ১৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১।

বাইরেতে মেম ডেকে ওঠে সৃষটি ওঠে। কপি। I = ৪+৪+৪+২ = ৮+৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি মুক্ত-রুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ ১৪ মাত্রার দলবৃত্ত দুটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। সমিল অপ্রবহমান পয়ার।

ছন্দোবদ্ধ ঃ ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার।।

৭৪. ১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

চারদিকে নীল সাগর ডাকে। অন্ধকারে। শুনি। I = ৪+৪+৪+২ = ১৪

১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ । ২

ওইখানেতে। আলোক্স্ভ। দাঁড়িয়ে আছে। ঢে্। I = ৪+৪+৪+২ = ১৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

এক্টি দুটি। তারার সাথে। তারপরেতে। অন্কেগুলো। তারা। I = ৪+৪+৪+৪+২ = ১৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)।

মাত্রারীতি ঃ প্রতি মুক্ত-রুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ দলবৃত্ত দ্বিপদী।

পর্ব ঃ প্রতি পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ তিনটি পঙ্‌ক্তি। ৪টি করে পর্ব, তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে ৫টি পর্ব। চরণান্তে মিল নেই।

ছন্দোবন্ধ ঃ প্রথম-দ্বিতীয় চরণে ৮ + ৬ মাত্রার অমিল ছোটো পয়ারের, তৃতীয় চরণ ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের।

বৈশিষ্ট্য ঃ ‘ঢের’ রুদ্ধদল দীর্ঘ উচ্চারণে ২-মাত্রার এবং ‘দাঁড়িয়ে’ শব্দটি উচ্চারণে সঙ্কুচিত হয়ে ২ মাত্রার।

৭৫. ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

আমার্ চিত্ত । আকাশ জুড়ে = ৪+৪ = ৮

১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১ ১

বলাকাদ্। যাছে উড়ে।। = ৪+৪ = ৮

১ ১ ১ ১। ১ ১ ১১। ১১

জানি নে কোন দূর্ সমুদ্দ্র। পারে I = ৪+৪+২ = ১০

১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ সজল্ বায়ু। উদাস ছুটে = ৪+৪ = ৮

কোথায় গিয়ে। কেঁদে উঠে ।। = ৪+৪ = ৮

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১: ১১।

পথবিহীন। গহন্ অন্ধ : কারে। I = ৪+৪+২ = ১০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি মুক্ত-রুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ চতুর্মাত্রক পর্বের দলবৃত্ত ত্রিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি।

পর্ব : অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ দুটি পঙ্‌ক্তিরই প্রথম দুই পদে অন্ত্যমিল এবং দুটি পঙ্‌ক্তির শেষেও মিল রয়েছে।

৭৬. ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১

নূতন্ জাগা। কুন্‌জবনে
১১১ ১ ১। ২
কুহরি উঠে। পিক্ I = ৫+৫+৫+২ = ১৭
১ ২ ২। ২ ১ ১ ১
বসন্‌তের। চুম্‌বনেতে
১ ২ ২। ২
বিবশ্ দশ্। দিক্। I = ৫+৫+৫+২ = ১৭

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি : মুক্তদলে বা অক্ষরে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে বা হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ কলাবৃত্ত দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি।

পর্ব : প্রতি পূর্ণপর্বে ৫-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

৭৭. ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১১ ২ ১ : ২ = ৬+৬। ৬+২ = ২০
আমি বিধির্ বিধান্। ভাঙিয়াছি আমি এমনি শক্‌তি:মান্ I
১১ ১১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২ ।। ১১ ১১ ১১। ২
মম চরণের তলে। মরণের মার্ ।। খেয়ে মরে ভগ:বান্ I = ৬+৬। ৬+২ = ২০

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ যণ্মাত্রক পর্বের কলাবৃত্ত দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি।

পর্ব ঃ অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ ঃ প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৬+৬+৬+২), চরণশেষে মিল (মান্-বান্)।

স্তবক ঃ ৪-পর্বের ২০-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১. প্রতি পঙ্‌ক্তির শুরুতে ১টি করে অতিপর্ব রয়েছে (আমি, মম)।
২. লঘুতির আঘাতে ‘শক্‌তিমান’ আর ‘ভগবান’ শব্দদুটি ভেঙেছে।

৭৮. ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১। ২ ১ ২
বেলা যে পড়ে এল। জল্‌কে চল I = ৭+৫ I
১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
পুরানো সেই সুরে। কে যেন ডাকে দূরে, = ৭+৭।
১ ১ ১ ১ ১ ১১। ১ ১ ১ ২
কোথা সে ছায়া সখী। কোথা সে জল I = ৭+৫ I

১ ১ ১ ১ ১ ১১। ১১১ ২

কোথা সে বাঁধা ঘাট। অশথত্‌ল! I = ৭+৫ I

সংকেত-চিহ্ন : লঘুফতি (১) অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি : প্রতি মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি : সপ্তমাত্রক পর্বের কলাবৃত্ত রীতির তিনটি পঙ্‌ক্তি। প্রথম পঙ্‌ক্তি একপদী ১২ মাত্রার। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী যথাক্রমে ১২ ও ১৪ মাত্রার। তৃতীয় পঙ্‌ক্তি একপদী ১২ মাত্রার।

পর্ব : অপূর্ণপর্বে ৫-মাত্রা।

৭৯. ২ ১ ১১১ ১ ১ । ২ ১ ১ ২

নিম্‌নে যমুনা বহে। স্বচ্ছ্‌ শীত I = ৮+৬ = ১৪

২ ১ ১ ২ ২। ২ ১ ১ ২

উর্‌ধে পাষাণতট্‌। শ্যাম্‌ শিলাতল্‌ I = ৮+৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ লঘুযতি () অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি ঃ প্রতি মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ ১৪ মাত্রার (৮+৬) কলাবৃত্ত দ্বিপদী দুটি পয়ার পঙ্‌ক্তি।

সমিল অপ্রবহমান পয়ার।

৮০. ১১ ১ ১ ১১ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১।

সমুখে অজানা পথ্‌ ইঙ্‌গিত্‌ মেলে দেয় দূরে I = ৮+১০ = ১৮

১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১

সেথা যাত্‌রার্‌ কালে যাত্রীর পাত্রটি পুরে I = ৮+১০ = ১৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ লঘুমতি (।) অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি : প্রতি মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি : ১৮ মাত্রার (৮+১০) দুটি কলাবৃত্ত মহাপয়ার পঙ্‌ক্তি। সমিল অপ্রবহমান কলাবৃত্ত মহাপয়ার।

পর্ব : পূর্ণপর্বে ৮-মাত্রা, অপূর্ণপর্বে ১০-মাত্রা।

৮১. ১১ ১১ ২ ১ ১

আমি পরী। অপ্‌সরী = ৪+৪

২ ২ ২ ১

বিদ্‌দ্যুৎ-:পর্‌ণা I = ৪+৩

২ ২ ১ ১ ১ ১

মন্‌দার। কেশে পরি। = ৪+৪

১ ১ ২ ২ ১
পারিজাত্-করুণা I = ৪+৩
১ ১ ১১ ১১১১
নেমে এনু । ধরণীতে = ৪+৪
১ ১ ২ ১১১১
ধূলিময় । সরণীতে = ৪+৪
১ ২ ২ ২ ১ ১
ক্ষণিকের্ । ফুল্ নিতে = ৪+৪
২ ১ ১ ২ ১
কান্চন্ । বর্ণা I = ৪+৩

সংকেত-চিহ্ন : লঘুযতি (।) অর্ধযতি (।।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি : প্রতি মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি : চতুর্মাত্রক পর্বের দুটি দ্বিপদী এবং একটি চৌপদী কলাবৃত্ত পঙ্ক্তি।

পর্ব : অপূর্ণপর্বে ৩ মাত্রা

মিল : ক-গ, খ-ঘ-জ। ঙ-চ-ছ।

৮২. ২ ১ ২ ১ । ২ ১ ১ ১ ।। ২ ১ ১ ১১ ২ ১
দে-শ দে-শ । নন্দিত করি ।। মন্দ্রিত তব । ভে-রী I = ৬+৬ । ৬+৩ = ২১
২ ১ ১ ১ ১ । ২ ১ ২ ১ ।। ২ ১ ১ ১১ । ২ ১
আ-সিল যত । বী-রবৃন্দ ।। আ-সন তব । ঘে-রি I = ৬+৬ । ৬+৩ = ২১

সংকেত-চিহ্ন : লঘুযতি (।) অর্ধযতি (।।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি : প্রতি মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি : প্রাচীন কৃলাবৃত্ত। ষণ্মাত্রিক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্ক্তি।

পর্ব : অপূর্ণপর্বে ৩-মাত্রা।

মিল : পঙ্ক্তি শেষে মিল (ভেরী-ঘেরি)।

বৈশিষ্ট্য : ১. আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দরীতির প্রয়োগ ঘটেছে।

৮৩. ২ ২ ২ ২ ।। ২ ১ ১ ২ ২
ঝর্ণা- । ঝর্ণা- ।। সুন্দরী । ঝর্ণা- I = ৪+৪ । ৪+৪ = ১৬
১১১১ ২১১ ।। ২১১ ২২
তরলিত । চন্দ্রিকা ।। চন্দন। বর্ণা- I = ৪+৪ । ৪+৪ = ১৬

সংকেত-চিহ্ন : লঘুযতি (।) অর্ধযতি (।।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি : প্রতি মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি : চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী দুটি সমিল প্রাচীন কলাবৃত্ত পঙ্‌ক্তি।

বৈশিষ্ট্য : ১. আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন কলাবৃত্তের প্রয়োগ

২. 'ঝর্ণা' এবং 'বর্ণা' শব্দদুটির '-ণা' ধবনিটির দীর্ঘ উচ্চারণ বলে দু'মাত্রা।

৮৪. ২ ১ ২ ১১১। ২১ ১১১১১

নী-ল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল I = ৮ । ৮ = ১৬

১ ১ ১ ১ ২ ১১ ২ ১১ ২ ১১

অনিল বিকমপিত শ্যামল অচল I = ৮। ৮ = ১৬

২ ১১ ২ ১১ ২ ১ ১ ২ ১১

অমর চুমবিত ভাল হিমা-চল I = ৮ । ৮ = ১৬

২ ১ ১ ২ ১ ১ :১১ ১

শুভ্র তুষা-র কিরীটিনী I = ৮। ৩ = ১১

সংকেত-চিহ্ন : লঘুমতি (।।) অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)।

মাত্রারীতি : প্রতি মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী চারটি সমিল প্রাচীন কলাবৃত্ত পঙ্‌ক্তি। শেষ পঙ্‌ক্তিটি ১১ মাত্রার এবং অমিল।

পর্ব : অপূর্ণপর্বে ৩-মাত্রা।

বৈশিষ্ট্য ঃ ২. চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে 'কিরীটিনী' শব্দটি অর্ধযতির আঘাতে ভেঙেছে।

৩. আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচীন কলাবৃত্ত ছন্দরীতির প্রয়োগ ঘটেছে।

৮৫. ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ । ১১১ ১ ১ ১

পুণ্যে পাপে দুখে সুখে পতনে উত্থানে I = ৮+৬ = ১৪

১১২ ১ ১ ২ ।। ১ ২ ১ ১ ১

মানুষ হইতে দাও ।। তোমার সন্তানে I = ৮+৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (।।) পূর্ণীতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি : মুক্তদলে ১-মাত্রা, অন্ত্য রুদ্ধদল এবং একক রুদ্ধদলে ২ মাত্রা।

ছন্দরীতি : ১৪ মাত্রার (৮+৬) মিশ্রবৃত্ত দুটি দ্বিপদী পয়ার পঙ্‌ক্তি। সমিল অপ্রবহমান পয়ার।

৮৬. ১ ১১ ১১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১

যে নদী হারায়ে যায় ।। অন্ধকারে রাতে নিরুদদেশে I = ৮+১০ = ১৮

১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২

তাহার চন্‌চল্ জল ।। স্তব্ধ হয়ে কাঁপায় হৃদয় I = ৮+১০ = ১৮

১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২

যে মুখ্ মিলায়ে যায় আবার ফিরিতে তারে হয় I = ৮+১০ = ১৮

১ ১ ১ ১ ২ ১১ ১১ ২ ১ ২ ১ ২

গোপনে চোখের পরে ।। ব্যথিতের স্বপনের মত I = ৮+১০ = ১৮

সংকেত-চিহ্ন ঃ অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, অন্ত্য রুদ্ধদল ও একক রুদ্ধদলে ২ মাত্রা।

ছন্দরীতি : ১৮ মাত্রার (৮+১০) মিশ্রবৃত্ত মহাপয়ার। দ্বিপদী চারটি পঙ্‌ক্তি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যমিল।

ছন্দোবদ্ধ ঃ ৮+১০ মাত্রার বড় পয়ার বা মহাপয়ার।

৮৭. ১১১ ১১১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১

স্বপনে ভ্রমিনু আমি ।। গহন্ কাননে I = ৮+৬ = ১৪

১১১ ১১১ ১১ ১১ ২ ২

একাকী দেখিনু দূরে ।। যুব এক্‌জন্ I = ৮+৬ = ১৪

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ২

দাঁড়ায়ে তাহার্ কাছে ।। প্রাচীন্ ব্রাম্‌জন I = ৮+৬ = ১৪

১ ১ ১১ ২ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

দ্রোণ যেন ভয় শূন্‌ন কুরুক্‌ক্ষেত্‌র রণে। I= ৮+৬ = ১৪

সংকেত-চিহ্ন ঃ অধতি (।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১, ২)।

মাত্রারীতি ঃ মুক্তদলে ১-মাত্রা, অন্ত্য রুদ্ধদল ও একক রুদ্ধদলে ২ মাত্রা।

ছন্দরীতি ঃ ১৪ মাত্রার (৮+৬) দ্বিপদী চারটি মিশ্রবৃত্ত পয়ার পঙ্‌ক্তি। অমিল অপ্রবহমান মিশ্রবৃত্ত পয়ার।

৫.৫ অনুশীলনী

১. বাহুর দম্ভ রাহুর মতো একটু সময় পেলে
নিত্য কালের সূর্যকে সে এক গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মিলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।

২. দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিমডিম রবে,
সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে।...
ওই শুনি পথে পথে হৈ হৈ ডাক,
বংশীর সুরে তালে বাজে ঢোল ঢাক।
নন্দিত কণ্ঠের হাস্যের রোল
অম্বর তলে দিল উল্লাস দোল।

৩. সাধু মহা রেগে বলে যৌবনের পাতে
এত পুণ্য কেন লেখ দেবপূজা খাতে।
চিত্রগুপ্ত হেসে বলে, বড় শক্ত বুঝা
যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।

৪. ভরিয়া উঠে নিখিল ভব 'রতি-বিলাপ'-সঙ্গীতে,
সকল দিক্ কাঁদিয়া উঠে আপনি
ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মূরছি পড়ে অবনী।
আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।

৫. ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন অর্ঘ্য ভারে ভারে।

৬. রাজার পদ চর্ম আবরণে
ঢাকিল বুড়ো হাসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে, আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।

৭. আমি হে সতী নব যুবতী,
আয়ান পতি দুর্জন অতি।...
'পাপ আয়ানে' শুনিলে প্রাণে..
বংশীর ধ্বনি যেন হে ফণী,
'আমি রমণী' প্রমাদ গণি।

৮. দেশের জন্য ভাবা, মায়ের জন্য কাঁদা, ভায়ের জন্য দেওয়া একালে
'এই' বঙ্গদেশে 'আজো যে সম্ভব তা', হে মহাত্মা, তুমি শেখালে।...
ওরে মূর্খ, জানিস্ মা মা বলে শখের অশ্রু ফেলা বেশি শক্ত নয়,
যে-জন চেঁচায় বেশি 'দীনবন্ধু' বলে সে-জন সত্যই বেশি ভক্ত নয়।

৯. উঠ, বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ,
জগতের লোক সুধার আশায় সে ভাষা করিবে পান।....
বিশ্বের মাঝারে ঠাই নাই বলে কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।

১০. চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন।
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশে নি যারে।

১১. হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহে নি কথা,
ভ্রমর ফিরেছে মাধবী-কুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা।....
শুনিয়া তপন অস্তে নামিল, শরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল, বনের আড়াল ধরি।

১২. এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

১৩. মরি কার পরশমণি গগনে ফলায় সোনা;
হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি অজানার আনাগোনায়।....
অলকার রত্নাগারে ঢুকেছি হঠাৎ যেন,
ডুবে যাই চমৎকারে সায়রে শিশির হেন।

১৪. মন্ত্রে সে যে পূত রাখীর রাঙা সুতো, বাঁধন দিয়েছিনু হাতে,
আজ কি আছে সেটি সাথে?...

১৫. পথ যে কতখানি কিছুই নাহি জানি,

মাঠের গেছে কোন্ শেষে চৈত্র-ফসলের দেশে।

১৬. আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ পূজেন নানা আয়োজনে।
সুধন্য চৈত্র মাস অষ্টমী সুপ্রকাশ বিশদ পক্ষ শুভক্ষণে ।।....
দেউল-বেদীপর প্রতিমা মনোহর তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা।
সর্বতোভদ্র নাম মণ্ডল চিত্র-নাম লিখিলা আপনি বিধাতা।।

১৭. কুমার পাড়ার গোরুর গাড়ি,
বোঝাই-করা কলসি, হাঁড়ি
গাড়ি চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন।

১৮. দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে
কাছের চেয়ে সে কাছেতে আসে।

১৯. উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন।

২০. নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার...
কহিল সে নমি সবা কাছে,
শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।....

২১. মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

২২. এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্বতুচ্ছ ভয়।।
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

২৩. আমি হব না ভাই নববঙ্গে নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননি-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে ব্রজের গোপবালক,

তবে চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।

২৪. নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।

২৫. চাঁদটি ব'সে হাসে
শান্ত নীলাকাশে।
ডাকে মা—চাঁদ, আরে,
চি-ক দিয়ে যা রে।
একবার তাকায় সাধে,
আকাশের ঐ চাঁদে,
আবার তাকায় সুখে
কোলের চাঁদের মুখে।

২৬. মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল-বেতালে খেয়াল সুরে
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।

২৭. খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার,
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার;
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে
স্বামী তবু চোখ বুজে খায় সে,...

২৮. তোমার মাপে হয়নি সবাই তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মরো কারও ঠেলায়, কেউ বা মরে তোমার চাপে।

২৯. চম্পক তরু মোরে প্রিয়সখা জানে সে,
গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে।

৩০. এখন বিশ্বের তুমি, গুন্‌গুন্‌ মধুকর।
চারি দিকে তুলিয়াছে বিস্ময়-ব্যাকুল স্বর।

৩১. আজ বিকালে কোকিল ডাকে শুনে মনে লাগে
বাংলাদেশে ছিলাম যেন তিন শো বছর আগে।

৩২. সেই আমাদের দেশের পদ্ম তেমনি মধুর হেসে,
ফুটেছে ভাই অন্য নামে অন্য নামে অন্য সুদূর দেশে।

৩৩. পূর্ণিমা রাত্রের জ্যোৎস্না-ধারায়

সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়।

৩৪. সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক,
জয় হোক, জয় হোক তারি জয় হোক।
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা,
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা।

৩৫. জন্মেছি যে মর্তকোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

৩৬. সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে মেঘে মায়া ঢালে,
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া সোনার খেয়ালে।

৩৭. কে গো চিরজন্ম ভরে
নিয়েছে মোর হৃদয় হরে,
উঠছে মনে জেগে।
নিত্যকালের চেনাশোনা
করছে আজি আনাগোনা
নবীন-ঘন মেঘে।

৩৮. অঘ্রান হল সারা,
স্বচ্ছ নদীর ধারা
বহি চলে কলসংগীতে।
কম্পিত ডালে ডালে
মর্মর তালে তালে
শিরীষের পাতা ঝরে শীতে।

৩৯. নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা,
সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা।
দিনের কল্লোল ’পর
টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।

৪০. কোথায় কবে আছিলে জাগি,
বিরহ তব কাহার লাগি,
কোন্ সে তব প্রিয়া।

৪১. রোদের বেলা ছায়ার বেলা
করেছি সুখ দুখের খেলা,
সে খেলাঘর মিলাবে মায়াসম।

৪২. ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ চকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী।

৪৩. চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে,
ওষ্ঠে তোমার কিছু কৌতুক হাসে,
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর।

৪৪. দুয়ার জুড়ে কাঙাল-বেশে
ছায়ার মতো চরণ-দেশে কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব।

৪৫. পথপাশে মল্লিকা দাঁড়াল আসি,
বাতাসে সুগন্ধের বাজাল বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে
ছড়ায়ে হাসি।

৪৬. চিরযুবা শূর-বীর বিজয়ীর কুঞ্জে
আমাদের মঞ্জীর সদালসে গুঞ্জে।
ভাবে যারা তন্ময়
জানে না মরণভয়,
তার লাগি আনি হয়।
রণধূম-পুঞ্জে।

৪৭. জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার ’পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।

৪৮. ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

৪৯. বিলম্বে এসেছ রুদ্ধ এবে দ্বার,
জনশূন্য পথ রাত্রি অন্ধকার,
গৃহহারা বায়ু করি হাহাকার
ফিরিয়া মরে।

৫০. প্রভাতে পথিক ডেকে যায়,
অবসর পাইনে আমি হায়,
বাহিরের খেলায় ডাকে যে,
যাব কী করে।

৫১. হেরো গো অন্তরে অরূপ-সুন্দরে,
নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে,
এস আনন্দিত মিলন-অঙ্গনে
শোভন-মঙ্গল সাজে।

৫২. অনুকূল বাবু বলে ঘাস খাওয়া ধরা চাই
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই,
বৃথাই খরচ ক'রে চাষ করা শষ্য।

৫৩. সবই হেথায় একটা কোথাও করতে হয় রে শেষ,
গান থামিলে তাই তো কানে থাকে গানের রেশ।
কাটলে বেলা সাধের খেলা সমাপ্ত হয় বলে
ভাবনাটি তার মধুর থাকে আকুল অশ্রু জলে।

৫৪. হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল,
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।
আপাতত এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে।

৫৫. জগতে যত মহৎ আছে
হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে

তাঁদের দ্বারে দ্বারে।...
ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ বলে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।

৫৬. রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত মধুর মুখ আছে।
বাকি তো কিছু রাখি নি দেখিবার।

৫৭. ছিলাম যবে মায়ের কোলে
বাঁশি বাজানো শিখাবে বলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি
বিচিত্রা হে বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।

৫৮. অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি,
তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।

৫৯. কিনি বিনি কাশী স্থির হয়ে থাকো,
'খবর্দার কেউ' নোড়ো চোড়ো নাকো।

৬০. ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার আলো
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

৬১. আজ বিকালে কোকিল ডাকে শুনে মনে লাগে,
বাংলাদেশে ছিলাম যেন তিন শো বছর আগে।

৬২. পূর্ণিমা রাত্রের জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়।

৬৩. জীবন মন্থন-বিষ নিজে করি পান।
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

৬৪. ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর, এই এসিয়ায় দাঁড়াও সরে এসে,
বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে।
ভাবসাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী লয়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ভক্তমালে নূতন মণি হয়ে।।

৬৫. কখনো বা ফাগুনের অস্থির এলোমেলো চাল
জোগাইত নাচনের তাল।—
সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেনে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে যাত্রীর পাত্রটি পূরে
সদয় অতীত কিছু সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটিবারে।

৬৬. সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন সে মজদুরি।

৬৭. চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈলা স্তব।
অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব।...
সভাসদ্ তোমার ভারতচন্দ্র রায়,
মহাকবি মহাভক্ত আমার কৃপায়।
তুমি তারে 'রায় গুণাকর' নাম দিও,
রচিতে আমার গীত তাহারে কহিও।

৬৮. সম্মুখ সমরে পড়ি, বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি
রাঘবারি?...

৬৯. কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র
শ্লোক বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।

৭০. গম্ভীর পাতাল যথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি' রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়

তমোহস্ত এড়াইতে—প্রাণযথা কালের কবল।

৭১. পুরস্কার প্রত্যাশায় পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত
যেতে যেতে; জীবনে যা কিছু তব সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিও না তারে; এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নব বসন্তের আগমনে। ....

৭২. একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছি
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর
হতে মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্যমুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

৭৩. গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা স্রোতস্বতী
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলা হল
উভে আক্রমিল।

৭৪. অজস্র দিনের আলো,
জানি, একদিন দু'চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।

৭৫. বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।

৭৬. এসেছিলে তুমি।
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি

শুধু উজ্জ্বলিতে; স্বর্গীয়,
সুন্দর।

৭৭. তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্ম্মর-মুখর ছায়া মাধবী বনের
হত স্বপনের।

৭৮. হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে, যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণ ডুবিছে অতলে।

৭৯. "এ গোঁফ যদি আমার বলিস—করবো তোদের জবাই"—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।"

৮০. আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে।

৮১. কণ্টক গাড়িকমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।

৮২. সকলের ছোটো বন চলে যায় ছোটো ছোটো হাতে
কমলালেবুর গুচ্ছ নিয়ে। আমি আধখানা বই
কোলের উপর রেখে ঈক্ষণ করেছি জানালাতে।
এখন আমার জ্বর কমে গিয়ে সাতানব্বই।

৮৩. নীরবে দেখাও আঙ্গুলি তুমি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি

দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে,
কী আছে হোথায় চলেছি কিসের অন্বেষণে।

৮৪. তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি,
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।
দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তোমার তৃষাকাতর আপন আঁখি।

৮৫. মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁয় অরুণিমা সান্যালের মুখ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক।
কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

৮৬. ঠাকুরমার দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে।
ভাবখানা মনে আছে—বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে
আমকাঠালের ছায়ে;
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণ-চক্র পায়ে।

৮৭. ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।।

৮৮. পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

৮৯. আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

৯০. তাই আজ শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এক ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্যভারে
শুষ্ক পত্র লয়ে। বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশত্থের তলে।

৯১. ছিচ্‌কাঁদুনে মিচকে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে,
ঘ্যাঁঙায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানঘ্যানে আর প্যানপ্যানে—
কুঁকিয়ে কাঁদে ক্ষিদের সময়, ফুঁপিয়ে কাঁদে ধম্‌কালে,
কিম্বা হঠাৎ লাগলে ব্যথা, কিম্বা ভয়ে চম্‌কালে;

৯২. ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সম সুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে ভবি ভুলিবার নয়,
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু ওঠে দুঃখেরি জয়।

৯৩. দিনান্তের চিতাবহ্নি নিবিল আকাশপটে; উন্মুক্ত চিকুরে।
মুছিয়াছে সন্ধ্যাসতী ধীরে ধীরে শব্দহীন ওষ্ঠ দুটি স্ফুরে।

৯৪. অসহ আলো আজ ঘৃণায় দগ্ধ,
দূষিত দিনে আর নেইকো রুচি।
অন্ধকারই একমাত্র শুচি,
প্রেমের নহবত ঘৃণায় স্তব্ধ।

৯৫. 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

৯৬. কিংশুক কুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিনী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সঙ্গীতে
নৃত্যের ভঙ্গিতে,
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

৯৭. শ্যামসুকপাখি সুন্দর নিরখি।
(রাই) ধরিল নয়নফাঁদে।
হৃদয়পঞ্জরে রাখিল তাহারে
মনহি শিকলে বেঁধে।।

৯৮. তাই তো বলি, এত যে গীত বাঁধলেন,
আপনাদেরই গোপনে সে গান।

আমরা দেখুন বেঁচে থেকেই সুখে আছি;
আমাদের আর কেন শোনান!

৯৯. কুল মরিয়াদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঙে পঙ্‌রলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা।

১০০. ওই সিন্ধুর টিপ সিংহলদ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ!
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ!
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়মমন্মর নিঃশ্বাস!
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস!

১০১. বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. নূতন ছন্দ-পরিক্রমা- প্রবোধচন্দ্র সেন।
২. বাংলা ছন্দের মূল সূত্র- অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।
৩. আধুনিক বাংলা ছন্দ- নীলরতন সেন।
৪. বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা- নীলরতন সেন।
৫. ছন্দ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মডিউল - ২

বাংলা অলঙ্কার

একক ৮ : অলঙ্কার কী ও তার প্রকারভেদ

একক গঠন :

৮.১ উদ্দেশ্য
৮.২ ভূমিকা
৮.৩ মূলপাঠ
৮.৪ সারাংশ
৮.৫ অনুশীলনী

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল বাংলা কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, তার সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা।

দ্বিতীয়ত, কাব্যের অলংকার সম্বন্ধে ভারতীয় আলংকারিকদের চিন্তাভাবনার বিষয়ে আরও বিশদ জানার আগ্রহ তৈরি করা।

তৃতীয়ত, কবিতায় অলংকারের মূল বিভাগ ও তাদের পার্থক্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা।

৮.২ ভূমিকা

কাব্যরচনা নিছকই শব্দসজ্জা নয়। সংস্কৃত 'অল'-এর একটি অর্থ 'ভূষণ' বা সাজসজ্জা। অলংকার' তাহলে সাজসজ্জার কাজ। শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য শরীরকে সাজানো হয় গয়না দিয়ে, তাই গয়না শরীরের অলংকার। রচনাকে সুন্দর করার জন্য যে আয়োজন, তাও অলংকার। সেই অলংকারে সাজানো হলে তবেই কোনো রচনা হবে কাব্য। আজ আমাদের আলোচনা সেই সজ্জাকে নিয়েই। প্রথমে আমরা জেনে নিই অলংকার বলতে আমরা কী বুঝি।

৮.৩ মূল পাঠ

অলঙ্কার কী ও তার প্রকারভেদ

ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' অলংকারের উল্লেখ হয়েছিল দু-হাজার একশ বছর আগে—উপমা, দীপক, রূপক, যমক এই চারটি অলংকার। ভারতবর্ষে অলংকার-চর্চার এই হল সূচনা। দেড় হাজার বছর আগে থেকে শুরু হয়েছিল অলংকার নিয়ে নানা বিতর্ক। ছ-শতকের আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শে' ভরতমুনির চারটি অলংকার বেড়ে হল ছত্রিশটি। তাঁর মতে, যেসব ধর্ম কাব্যে শোভা এনে দেয় তার নাম অলংকার। ('কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে')। সাত-শতকের আচার্য ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের

বক্রোক্তি-তত্ত্ব পেরিয়ে যখন আট শতকে পৌঁছই, তখন দেখি, বামনাচার্য অলংকার সম্পর্কে একটি মূল্যবান সূত্র নির্দেশ করছেন তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে—কোনো রচনা মানুষের কাছে উপাদেয় এবং কাব্য বলে গ্রাহ্য হয় অলংকারের জন্যই, আর সৌন্দর্যই হচ্ছে সেই অলংকার (কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্করাৎ। সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ)।

বামনাচার্যের এই সূত্রটি আজকের বাংলা কবিতার অলংকার বুঝতেও অত্যন্ত জরুরি। সংস্কৃত কাব্যের অলংকার নিয়ে আলোচনা পালটা আলোচনা চলেছে সতেরো-শতক পর্যন্ত। বামনাচার্যের সূত্রটি ক্রমশ দুটি মাত্রা পেল—এক, অলংকার কাব্যের সাধারণ (আত্মভূত) সৌন্দর্য; দুই অলংকার কাব্যের বিশেষ (অঙ্গভূত) সৌন্দর্য। চৌদ্দ-শতকের বিশ্বনাথ কবিরাজ অলংকারের এই দ্বিতীয় মাত্রাটি ধরে ছিয়াত্তরটি অলংকারের আলোচনা করলেন তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে।

কাব্যের রস-লোকে পৌঁছবার একটি বিশিষ্ট পথ হল অলংকরণ। অলংকার কাব্যকে চারুত্ব দান করে এবং এই অলংকার বুঝে কাব্যকে আস্বাদ করলে তা রমণীয় ঠেকে। নারীদেহের শ্রী বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন নানা ধরণের অলংকার, তেমনি কাব্যদেহকে রসমণ্ডিত করে তুলতে প্রয়োজন শব্দ ও অর্থের অঙ্গাঙ্গীযোগ, যা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে এক অতীতলোকে পাঠককে পৌঁছে দেয়। তবে নারীদেহের অলংকার যেমন তার শরীরের বাহ্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কাব্যের অলংকার তা নয়। সেটি কাব্যদেহের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত, দেহেরই উপাদান বিশেষ। এটি কবির সযত্নপ্রচেষ্টার ফল নয়, এর জন্য কোনো অতিরিক্ত প্রচেষ্টারও প্রয়োজন হয় না। এটি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ম্ভু। কাব্যশরীর হল শব্দ বা পদবিন্যাস। কাব্যের অলংকার ওই পদবিন্যাসের মধ্যেই একীভূত। এ হল শব্দের অন্তরের জিনিস। কাব্যে অলংকারের উপস্থিতি স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। স্বাভাবিকভাবে ভাষায় অলংকার আরোপ করা হলেও অলংকারকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন চর্চা বা অনুশীলন।

কবিতার মতো অলংকারের আয়তনও অনির্দিষ্ট। ভাষায় অলংকার শব্দকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে। একটি অলংকার একটিমাত্র শব্দকে আশ্রয় করতে পারে, একটি-দুটি চরণ বা বাক্য জুড়ে থাকতে পারে, কবিতার একটি স্তবক বা ছোটোমাপের একটি কবিতার শরীরেও ছড়াতে পারে। কবিতা বা তার অন্তর্গত স্তবক-চরণ বাক্যে শব্দের দুটি রূপ—একটি ধ্বনিরূপ, আর একটি অর্থকূপ। শব্দের দুটি অংশ। বাইরের উচ্চারণে সে ধ্বনি, ভিতরে সে অর্থময়। যা শুতিযোগ্য, ইংরেজিতে তাকে সাউন্ড বলে। ভিতরের অর্থকে বলে সেন্স। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, তার আবেদন শুতির কাছে; অর্থকূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে, তার আবেদন বোধের কাছে। কবিতা স্তবক-চরণ বাক্য বা শব্দ উচ্চারিত হলে উচ্চারণজনিত ধ্বনির মাধুর্য সরাসরি শ্রোতার কানকে তৃপ্ত করতে পারে, অথবা অর্থের সৌন্দর্য শ্রোতার বোধকে উদ্দীপিত করতে পারে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম, শব্দালংকার আর অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।।

আবার অলংকার শব্দের একটি ব্যাপক অর্থ আছে। অলংকারের দ্বারা রস, রীতি, ধ্বনি, গুণ, ক্রিয়া, অনুপ্রাস, উপমা, বক্রোক্তি প্রভৃতিকে বোঝায়। কারণ কাব্যসৌন্দর্য বলতে এই বৈশিষ্ট্যগুলিই গণনীয়। কিন্তু বিশিষ্ট অর্থে অলংকার বলতে শুধুই শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারকেই বোঝায়।

৮.৪ সারাংশ

শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য গয়না দিয়ে শরীরকে সাজানো হয়। তাই, গয়না শরীরের অলংকার। তেমনি, কথাকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য যে আয়োজন, তা কথার অলংকার। আর, এই অলংকার দিয়ে সাজানো কথাই কাব্য বা কবিতা।

ভারতবর্ষে অলংকারের ইতিহাস ২১০০ বছরের। প্রথমে ভরতমুনি জানালেন ৪টি অলংকারের কথা, তারপর আচার্য দণ্ডী ৩৬টি এবং ভামহ বামনাচার্যের যুগ পেরিয়ে সবশেষে বিশ্বনাথ কবিরাজ ৭৬টি অলংকারের আলোচনা করলেন। বামনাচার্যের একটি মত, অলংকার হচ্ছে কবিতার শরীরের সৌন্দর্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ এই অর্থ ধরেই অলংকার ব্যাখ্যা করলেন, আমরাও এই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সন্ধান করব।

একটিমাত্র শব্দ অথবা একটি-দুটি চরণ বা একটি স্তবক, এমনকী একটি গোটা কবিতা জুড়েও থাকতে পারে অলংকার। কবিতা বা স্তবক-চরণ শব্দের দুটি রূপ—ধ্বনিরূপ আর অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, অর্থরূপ ধরা পড়ে

মনে-মস্তিষ্কে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম শব্দালংকার, অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালঙ্কার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

৮.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভরতমুনির গ্রন্থের নাম কী ?

২. ‘কাব্যালঙ্কার’ কার গ্রন্থের নাম?

৩. ‘কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্করাৎ’ কথাটির প্রবক্তা কে?

৪. বিশ্বনাথ কবিরাজ কোন শতাব্দীর মানুষ?

৫. ‘সাহিত্যদর্পণ’ গ্রন্থের রচয়িতার নাম লিখুন।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. কীভাবে অলংকার কাব্যকে চারুত্ব দান করে, বুঝিয়ে দিন।

২. কী কারণে অলংকারকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ব্যাখ্যা করুন।

৩. শরীরের অলংকার আর কাব্যদেহের অলংকারের মূল পার্থক্য কোথায়?

একক ৯, ১০ শব্দালংকার

একক গঠন :

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ ভূমিকা

৯.৩ মূলপাঠ : শব্দালংকার

৯.৩.১ অনুপ্রাস

৯.৩.১.১. সরল অনুপ্রাস

৯.৩.১.২. বৃত্ত্যনুপ্রাস

৯.৩.১.৩. ছেকানুপ্রাস

৯.৩.১.৪. শ্রুত্যনুপ্রাস

৯.৩.১.৫. আদ্যানুপ্রাস

৯.৩.১.৬. অন্ত্যানুপ্রাস

৯.৩.১.৭. সর্বানুপ্রাস

৯.৩.১.৮. মালানুপ্রাস

৯.৩.১.৯. গুচ্ছানুপ্রাস

৯.৩.২ যমক

৯.৩.২.১ আদ্যযমক

৯.৩.২.২ মধ্যযমক

৯.৩.২.৩ অন্ত্যযমক

৯.৩.২.৪ সর্বযমক

৯.৩.৩ শ্লেষ

৯.৩.৩.১ অভঙ্গ শ্লেষ

৯.৩.৩.২ সভঙ্গ শ্লেষ

৯.৩.৪ বক্রোক্তি

৯.৩.৪.১. কাকু-বক্রোক্তি

৯.৩.৪.২. শ্লেষ-বক্রোক্তি

৯.৪ সারাংশ

৯.৫ অনুশীলনী

৯.১ উদ্দেশ্য

মূল একক দুটির উদ্দেশ্য হল বাংলা কবিতার উচ্চারণে কবিরা ধ্বনিপ্রয়োগে বৈচিত্র্য আনয়ন করে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, তার পরিচয় নেওয়া।

দ্বিতীয়ত, কতভাবে এই ধ্বনিপ্রয়োগ-বৈচিত্র্য সৃজন করা হয়, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

তৃতীয়ত, ধীরে ধীরে কবিকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার রূপ নির্ণয়ে সক্ষমতা অর্জন করা।

৯.২ ভূমিকা

শব্দ হল মূর্ত ধ্বনি বা ধ্বনি-সংকেত। শব্দের বহিরঙ্গের যে ধ্বনি তার ওপরেই শব্দালংকারের ভিত্তি। শব্দের ধ্বনিকে কেন্দ্র করে যে অলংকার গড়ে ওঠে তাকে বলে শব্দালংকার। শব্দালংকারের সব কাজই ধ্বনিকেন্দ্রিক। এই শ্রেণীর অলংকারে শব্দকে বদল করা যায় না। কারণ, শব্দ পরিবর্তিত হলে তার ধ্বনিও পরিবর্তিত হবে এবং অলংকারও তার গতিপথ হারাবে।

বাংলায় 'শব্দ' কথাটির দুটি অর্থ—একটি ধ্বনি, অন্যটি অর্থবোধক বর্ণসমষ্টি (লেখায়) বা ধ্বনিসমষ্টি (উচ্চারণে)। প্রথমটি ইংরেজি Sound অর্থে, দ্বিতীয়টি ইংরেজি Word অর্থে। শব্দালংকার'-এর 'শব্দ' তাহলে কোন অর্থে? দুটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে অর্থটি বুঝে নেওয়া যাক।

প্রথম উদাহরণ, 'কষিত কনক কান্তি কমনীয় কায়'—এই ছত্রটিতে পাঁচটি শব্দ (Word) আছে, আবার পাঁচটি ক-ধ্বনিও আছে। পাঁচটি পৃথক শব্দ, কিন্তু একই ক-ধ্বনি পাঁচবার। ছত্রটি উচ্চারণ করলে ক-ধ্বনিটিই পরপর পাঁচবার কানে মৃদু আঘাত দেয়, একই ধ্বনি বারে বারে আবৃত্ত হয়ে মাধুর্য সৃষ্টি করে, তৈরি হয় ধ্বনির অলংকারশব্দালংকার। পৃথক পৃথক শব্দ (Word) এখানে কোনো অলংকার তৈরি করে না।

ওপরের উদাহরণটি থেকে বোঝা গেল, অলংকার তৈরি করে যে শব্দ তা Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি নয়, Sound বা ধ্বনি। অর্থাৎ, শব্দালংকারের 'শব্দ' ধ্বনি। কিন্তু এ বিষয়ে একটু তর্ক আছে। আরও একটি উদাহরণ থেকে তর্কও উঠবে, সে তর্কের মীমাংসাও হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ,

> আটপণে কিনিয়াছি আধসের চিনি।
> অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।।

এখানে 'চিনি' শব্দটি দুটি ছত্রে দুবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম 'চিনি' এক ধরনের মিষ্টি, দ্বিতীয় 'চিনি'-র অর্থ 'জানি' বা 'বুঝি'। একই শব্দ 'চিনি' দুবার উচ্চারিত হল দুটি পৃথক অর্থ নিয়ে। 'চিনি'-র পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ কানে মধুর লাগে, কানকে তৃপ্ত করে। এই মাধুর্যের একটুখানি চমক লাগে 'চিনি' শব্দটি দুবার দুটি অর্থ পাচ্ছে বলে।

শব্দালংকার ছয় প্রকার। অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি, ধন্যুক্তি এবং পুনরুক্তবদাভাস। আমরা এখানে প্রথম চারটি মুখ্য শব্দালংকারের আলোচনা করব।

৯.৩ মূল পাঠ : শব্দালংকার

৯.৩.১ অনুপ্রাস

সংজ্ঞা : একই ব্যঞ্জনধ্বনির সমব্যঞ্জনধ্বনির একাধিকবার উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের একাধিকবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণে, অথবা বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অনুপ্রাস অলংকার। (একই ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছের একাধিকবার উচ্চারণে অনুপ্রাস।)

একটু অন্যভাবে বলা যায়—এক রকমের বর্ণ একটি বা একগুচ্ছ যখন বার বার ব্যবহৃত হয়ে যে শব্দ-সাম্যের সৃষ্টি করে—তখন তার নাম হয় অনুপ্রাস। 'অনু'-উপসর্গটি 'পরে বা পশ্চাতে'—এই রকম আর্থেই বসে থাকে। আর 'প্রাস' শব্দের অর্থ হলো বিন্যাস, প্রয়োগ বা নিক্ষেপ। একই শব্দের পরে বা পশ্চাতে উক্ত শব্দের পুনর্বিন্যাস বা পুনঃপ্রয়োগের নামই অনুপ্রাস। এই প্রত্যয়গত অর্থকে মেজে ঘসে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের পরে ওই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের পুনঃপ্রয়োগের নাম অনুপ্রাস। যে বর্ণের অনুপ্রাস ঘটবে সেই বর্ণগুলি একটির থেকে অন্যটি ঘুর বেশি দূরে বিন্যস্ত হবে না। অদূরতা অনুপ্রাসের প্রধান লক্ষণ।

বৈশিষ্ট্য : ১। একই ব্যঞ্জনের দুবার বহুবার উচ্চারণ।

২। সমব্যঞ্জনের (জ-য, শ-য-স, ণ-ন) দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।

৩। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত (ম্ব-ম্ব, ন্ধ ন্ধ) বা বিযুক্ত (শিযের-শিশির, শাখার-শিখরে) উচ্চারণ।

৪। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত (বরী-রবী, বাকা) উচ্চারণ।

৫। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণ।

৬। বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার (ক-খ, চ-ছ, ট-ঠ) বা বহুবার (ত-থ-দ-ধ-ন) উচ্চারণ।

৭। স্বরধ্বনির সাম্য থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। একমাত্র প্রয়োগস্থানগত অনুপ্রাসে (আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস) স্বরধ্বনির সাম্য আবশ্যক।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

১. সরল অনুপ্রাস ২. বৃত্তানুপ্রাস; ৩. ছেকানুপ্রাস; ৪. সুত্যনুপ্রাস; ৫. আদ্যানুপ্রাস; ৬. অন্ত্যানুপ্রাস; ৭. সর্বানুপ্রাস; ৮. মালানুপ্রাস; ৯. গুচ্ছানুপ্রাস।

৯.৩.১.১ সরল অনুপ্রাস

একটি বা দুটি বর্ণ (স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি) একাধিকবার ধ্বনিত হলেই এই অনুপ্রাস হয়। প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ—

(ক) কুটিল কুন্তল কুসুম কাছনি কান্তি কুবলয় ভাসয়ে।
কুঞ্চিতাধর কুসুম কৌমুদী কুন্দকোরক হাসয়ে।।

ক-ধ্বনির অনুপ্রাস। সঙ্গে উ-ধ্বনিরও অনুপ্রাস আছে।

(খ) চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।

চ, ল, ক-ধ্বনির অনুপ্রাস। সঙ্গে র-, ণ-ধ্বনিরও অনুপ্রাস আছে।

(গ) কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি।

ক-ধ্বনির অনুপ্রাস। সঙ্গে এ-, শ-ধ্বনিরও অনুপ্রাস আছে।

(ঘ) শিকারের তাজা রক্তে শুচি শিলা শিহরে সহসা
আগুনের লোল জিহ্বা খোঁজে গঢ় সত্তার ধমনী।

(ঙ) পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে।
সে তরণী পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে।

(চ) সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

(ছ) ঝুলিছে ঝালরে মুকুতা।

(জ) কোকিল কুহলে কুতুহলে।

(ঝ) তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপনে।

(ঞ) দশদিশদামিনী দহন বিথার।

(ট) হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ার বেহালাখানি।

(ঠ) ব্যাহত বিধাতা ব্যক্তির বুদ্ধিতে।

(ড) মধুমাসে মলয় মারুত মমন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।। এবার স্বরধ্বনির উদাহরণ—

১. আমি অজর অমর অক্ষয় আমি অব্যয়।
২. অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি।
৩. ইঁদুরেরা ইতস্তত ইন্ধন যোগায়।
৪. উৎসবের উচ্চকিত উদ্দাম উল্লাস
৫. আশ্বিনে আসমানে আলোর খেলা
৬. অনাদি অসীম অতল অপার

৯.৩.১.২ বৃত্তানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণে বা ক্রম অনুসারে বহুবার (যুক্ত বা বিযুক্ত) উচ্চারণে বৃত্তানুপ্রাস।

১. একই ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনের ব' দুবার (বিদায়, বিষাদ) ধ্বনিত হওয়া বৃত্ত্যনুপ্রাস।

২. সমব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ জেগেছে যৌবন নব বসুধার দেহে।

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন 'জ' 'য' দুবার উচ্চারিত হওয়ার বৃত্ত্যনুপ্রাস।

৩. একই ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ চলচপলার চকিত চমকে করিছ চরণ বিচরণ।

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জন 'চ'-এর ছয়বার এবং 'র'-এর চারবার উচ্চারণে বৃত্তানুপ্রাস হয়েছে।

৪. সমব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ শরতের শেষে সরিষার রো।

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন 'শ' 'ষ' 'স' পাঁচবার ধ্বনিত হয়ে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

৫. ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক)—

(i) কবরী দিল করবীমালে ঢাকি।

ব্যাখ্যা : 'কবরী' আর 'করবী' শব্দদুটিতে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'বর'-এর বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে দুবারপ্রথমবার 'বরী' এবং দ্বিতীয়বার 'রবী'। 'ব-র'-এর বিন্যাস বদলে যাওয়ার (বরী গ্ন রবী)-এর উচ্চারণ ক্রম অনুসারে হয়নি, হয়েছে স্বরূপ। অনুসারে। অতএব কবরী-করবী উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে।

(i) বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য।

সংকেত : বাক্য > কাব্য।

৬. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী।—জগদানন্দ

সংকেত : 'ঞ-জ'-এর যুক্ত উচ্চারণ (ঞ্জ) তিনবার।

(ii) দিনান্তে, নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।—রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : একই স্বরধ্বনিসমেত 'ন্-ত্'-এর যুক্ত উচ্চারণ (আন্তে) তিনবার।

৭. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া।—নজরুল।

সংকেত : 'লক'-এর তিনবার উচ্চারণ স্বরধ্বনিসমেত ('লোক')।

(ii) কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।

সংকেত : 'কল'-এর চারবার উচ্চারণ (স্বরসাম্য নেই—'কল', 'কিল' - 'কুল' - 'কুল)।

৯.৩.১.৩ ছেকানুপ্রাস

সংজ্ঞা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার যুক্ত অথবা বিযুক্ত উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস। ('ছেক' শব্দের অর্থ বিদগ্ধ পণ্ডিত। ছেকানুপ্রাস বিদগ্ধজনের প্রিয় অনুপ্রাস।)

দুটি বা ততোধিক ব্যঞ্জনগুচ্ছ যদি দুবার মাত্র বাক্যে বসে—তবেই ছেকানুপ্রাস হয়। (দুবারের বেশী ধ্বনিত হলে অবশ্য তাকে আমরা গুচ্ছানুপ্রাস বলব।) ছেক শব্দের অর্থ পণ্ডিত, আর পণ্ডিতেরাই

পূর্বে এই জাতীয় অনুপ্রাস বেশী ব্যবহার করতেন বলেই এই অলংকারের এই নাম হয়েছে। আবার যেহেতু একই ক্রমে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি মাত্র একবার আবৃত্ত হয়—সেই জন্য একে অনেকে একানুপ্রাস বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ্‌ক্তি ধরা যাক—

যত পায় বেত, না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে। এখানে ''বেত, না''—এই অংশটুকুর ধ্বনি 'বেতন' পদের ধ্বনির সঙ্গে সদৃশ হয়েছে একবার এবং এই ধ্বনি-সাম্যের সৌকর্যেই ছেকানুপ্রাস অলংকার সম্ভব হলো।

চলিত কথায় আমরা অনেক সময় পণ্ডিতের মতোই এই ছেকানুপ্রাস প্রয়োগ করে থাকি। 'তিলকে তাল করা' বললে তিল এবং তালের যে শব্দগত ধ্বনি-সাম্য, তাতে ছেকানুপ্রাস হয়। এইরকম 'পেটে খেলে পিঠে সয়' কিম্বা 'কুলে কালি দেওয়া।

উদাহরণ :

১. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত উচ্চারণ (i) উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে।

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'ম্-ব্'-এর ক্রম অনুসারে যুক্ত উচ্চারণ () হয়েছে দুর্বার (কলম্ব, অম্বর)। অতএব, ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

(ii) কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।

সংকেত : 'ন্-ধ্'-এর যুক্ত উচ্চারণ (ন্ধ) দুবার।

২. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক) একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু।

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'শ-ষ-র'-এর ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে 'শিষের' ও 'শিশির' শব্দ দুটিতে। লক্ষণীয়। এখানে স্বরসাম্য নেই (ই-এ, ই-ই)। তবু ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

মন্তব্য : 'শ-ষ-র' এবং 'শ-শ-র' ধ্বনিগতভাবে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ। 'শ-ষ'-এর বর্ণগত পার্থক্য থাকলেও বাংলা উচ্চারণে এরা একই রকম ধ্বনি। ধ্বনিদুটিকে সমব্যঞ্জন বলা যায়।

৩. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত এবং বিযুক্ত উচ্চারণ—

(i) মরিতেছে মাথা খুঁজে পর-পিঞ্জরে।।

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'প-ঞ্-জ-র' ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হয়েছে 'পঞ্জর' ও 'পিরে' শব্দদুটিতে। এখানে 'প-র' ব্যঞ্জনদুটির উচ্চারণ বিযুক্তভাবে হলেও 'ঞ্-জ্'-এর উচ্চারণ হয়েছে যুক্তভাবে, স্বরধ্বনির সাম্যও এখানে নেই (পঞ্জর-পিঞ্জরে > অ-অ-অ > ই-অ-এ)। কিন্তু, ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থাকার কারণে এখানে ছেকানুপ্রাসই হয়েছে।

(ii) আমি কবি ভাই কর্মের ও ঘর্মের।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'র্-ম-র' ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হওয়ায় ছেকানুপ্রাস হয়েছে নিঃসন্দেহের (প্রথম উচ্চারণ কর্মের 'র্মের', দ্বিতীয় উচ্চারণ 'ঘর্মের মের')। কিন্তু

লক্ষণীয়, 'র্ম'-এর উচ্চারণ যুক্ত আর 'মের'-এর উচ্চারণ 'এ' স্বরধ্বনির দ্বারা বিযুক্ত।

ছেকানুপ্রাসের আরো কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

(ক) এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

(খ) কৃপা না চাইতে কৃপাণ দিয়েছে।

(গ) চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।

(ঘ) মধুকর বন্দিত নন্দিত সহকার
মুকুলিত নতশাখে মুখে চাহে কহো কার।

(ঙ) আমার মনের সুরের জোনাকি
আকাশ, তুমি কি তা সব জান কি?

(চ) আসার আশায় বসে আছি।

(ছ) জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা।

৯.৩.১.৪ শ্রত্যনুপ্রাস

সংজ্ঞা : বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে শ্রত্যনুপ্রাস। (একই ধ্বনির অনুপ্রাস নয়, তবে একই স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি বলে তারা শুতিতে বা শুনতে একইরকম। শুতিতে অনুপ্রাস বলেই এর নাম শুত্যনুপ্রাস।)

কণ্ঠ, তালু, দন্ত প্রভৃতি যে কোনো একস্থান থেকে উচ্চারিত অথচ ভিন্নবর্ণের সংগে মধুর সাদৃশ্য ঘটে, তবেই শুত্যনুপ্রাস হয়। যেমন—

(ক) যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে।
(এখানে সন্ধ্যার 'ন্ধ' মন্দের ন্দ-এর সঙ্গে এবং 'ন্দ'-'ন্ধ'র সঙ্গে অনুপ্রাসিত।

(খ) বর্ষায় দেখি শিখর শিখরী কি করি ভেবে
মেলে দেয় ডানা, নেচে ওঠে মহাখুসিতে হাসিতে বেগে।
(এখানে 'শিখরী' আর 'কি করি' লক্ষ্য করলেই শুত্যনুপ্রাস বোঝা যাবে।)

(গ) নিরাবরণ বক্ষে তবে নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।

(ঘ) অঞ্চলের অলিতে
মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে। (এখন 'জ' এর সঙ্গে 'ছ' অনুপ্রাসিত)

(ঙ) চঞ্চল শোণিতে যে
সত্তার ক্রন্দন ধ্বনিতেছে।

(চ) ওই মেঘ জমছে।
চল ভাই সমঝো।

(ছ) তিনি চোখের জল মোছান কিন্তু ঘোচান না।

১. একই স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

(i) বাতাস বহে বেগে, ঝিলিক মারে মেঘে।

ব্যাখ্যা : ‘গ-ঘ’ ভিন্ন দুটি ব্যঞ্জন হলেও বাগযন্ত্রের একই স্থান কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত। ফলে, ওই দুটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও তারা অনুয়াসে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে ‘বেগে’ আর ‘মেঘে’ শব্দদুটিতে। এ অনুপ্রাস। শ্রুতিগত বলে এটি শ্রুত্যনুপ্রাস।

(ii) চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।

সংকেত : ‘ক-খ’ (কণ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যনুপ্রাস ‘চিকন-লিখন’ শব্দটিতে

(iii) নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে।

সংকেত : ‘ব-ভ’ (ওষ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যনুপ্রাস ‘নিরাবরণ’ আর ‘নিরাভরণ’ শব্দদুটিতে।

২. একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যগ্রনের বহুবার উচ্চারণ—

ছন্দোবদ্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণের ‘ছন্দোবদ্ধগ্রন্থগীত’ অংশে ‘দ-ন্-ধ-থ-ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির সমাবেশ ঘটেছে। এই সমাবেশ মূলত চারটি ধ্বনিরত-থ-দ-ধ। এদের উচ্চারণস্থান দন্তমূল। ধ্বনিগতভাবে ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণ পৃথক হলেও শ্রুতিতে এরা একইরকম। সেই কারণে, মিলিতভাবে পাঁচবার উচ্চারিত হয়ে এরা শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

৯.৩.১.৫ আদ্যানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের বা পদের বা পর্বের আদিতে স্বসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে আদ্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই।

সংকেত : চরণের আদিতে ‘বড়ো’-জড়ো’ শব্দে ‘অড়ো’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে আদ্যানুপ্রাস।

(ii) নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণের প্রথম পর্বের আদিতে ‘নিত্য এবং দ্বিতীয় পর্বের আদিতে ‘চিত্ত’এই দুটি শব্দে ‘ইত্ত’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ‘ইত্ত’ ধ্বনিগুচ্ছে আছে স্বরধ্বনি ‘ই-অ’ সমেত ব্যনধ্বনি ‘ত্ত’ (ই-ত্-ত্-অ)। অতএব, এখানে আদ্যানুপ্রাস হয়েছে।

৯.৩.১.৬ অন্ত্যানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের শেষে, পদের শেষে, পর্বের শেষে, এমনকী পঙ্ক্তির (line) শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে অন্ত্যানুপ্রাস।

অন্যভাবে বলি, কবিতার চরণের শেষে যে মিল, তাকেই অত্যানুপ্রাস বলে। অত্যানুপ্রাস কাব্যের

উৎকর্ষ বাড়ায় এবং চমৎকারিত্ব দান করে। দু এক জায়গায় অভাবিতপূর্ব মিল দিয়ে কবি পাঠককুলকে মুগ্ধ করেন। নীচে কয়েকটি অস্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ দিলাম।

উদাহরণ :

(i) অজানু গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি।

ব্যাখ্যা : এ উদাহরণে প্রথম চরণটি সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় চরণ অপূর্ণ। প্রথম চরণের শেষে 'চমকি' আর দ্বিতীয় চরণের শেষে 'থমকি'—এই দুটি শব্দে 'অমকি' ধ্বনিগুচ্ছের (অ-ম্-অ-ক্-ই) অন্তর্গত তিনটি স্বরধ্বনিসমেত 'ক' ব্যঞ্জনগুচ্ছ পুনরাবৃত্ত হয়ে অত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

(ii) অমি নাব মহাকাব্য সংরচনে।

সংকেত : প্রথম দুটি পর্বের শেষে 'আরব' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

মন্তব্য : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'ব্-ব'-এর ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থেকে ছেকানুপ্রাসও হয়েছে।

(iii) তবে
একদিন কবে

সংকেত : এ উদাহরণে আছে দুটি পঙ্‌ক্তি। এর কোনোটিই চরণ নয়, পদ বা পর্বও নয়। এদের শেষে 'অবে' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

('বলাকা' কাব্যে এ-ধরনের কোনো কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে পঙ্‌ক্তিশেষে অন্ত্যানুপ্রাস রচনা করে গেছেন।

আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

(ক) নাম লেখে ওষুধের
এদেশে পশুদের।

(খ) শুদ্ধ নিয়ম-মতে মুরগিরে পালিয়া
গঙ্গাজলের যোগে রাঁধে তার কালিয়া।

(গ) হেঁটেছি তোমার বাড়ীর সামনে, করেছি কতই চাতুরী।
তোমাকে দেখার। কিন্তু সে আশা হেনেছে বক্ষে হাতুড়ি।

(ঘ) মনোহরী নিশীথিনী
ও পাড়ার পিসি যিনি
দাঁতে দিয়ে মিশি তিনি
কিনে আনে দিশি চিনি।

(ঙ) সাতাশ গণ্ডা পায়রা নিয়ে
আমার কি হয়রাণি এ।

(চ) লক্ষ্মীর সাথে মেয়েদের ভাব আন্তরিক,
টাকা নেই? তবে প্রেমে সে এবার ক্ষান্ত দিক।

(ছ) নীড় নেই কোনো পালাবার
চলো হিমাচলে চলো যাই দূরে মালাবার।

(জ) জিনিস যদি টাটকা না হয়
ভেঙে চুরে আটখানা হয়।

(ঝ) রজনী গন্ধা বাস বিলাললা,
সজনী সন্ধ্যা আসবি নালো?

৯.৩.১.৭ সর্বানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে দুটি চরণের সর্বশরীরে (প্রতিটি শব্দে) অনুপ্রাস থাকলে, অর্থাৎ প্রথম চরণের প্রতিটি শব্দের কোনো ধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে দ্বিতীয় চরণের প্রতিটি শব্দে পরপর পুনরাবৃত্ত হলে সর্বানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রতিটি চরণে তিনটি করে শব্দ। প্রথম শব্দযুগল 'গগন-চরণে', দ্বিতীয় শব্দযুগল 'ছড়ায়ে জড়ায়ে এবং তৃতীয় শব্দযুগদল 'এলোচুল-বনফুল'—এই তিনটি শব্দযুগলে যথাক্রমে 'অঅনে', 'অড়ায়ে' এবং 'উল' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এভাবে সর্বানুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।

(i) সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা।

সংকেত : 'অন্ধ্যা', 'উকের', 'ঔরবী', 'আশা' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি।

৯.৩.১.৮ মালানুপ্রাস

অনুপ্রাসের মালা অর্থাৎ একাধিক অনুপ্রাস যখন বাক্যে থাকে—তখন সেখানে মালানুপ্রাস রয়েছে বলা হয়। আসলে পর পর অনুপ্রাস সাজিয়েই এই মালা রচনা করা হয় বলে একে অনেকেই সেজন্যে অনুপ্রাসের স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে স্বীকার করেননি। যেমন—'শিশির কণায় মাণিক ঘনায়, দূর্বাদলে দ্বীপ জ্বলে।' এখানে প্রথমে 'ণ'-এর অনুপ্রাস, এবং তার পরেই দ-এর অনুপ্রাস; পর পর এই দুটি অনুপ্রাস নিয়েই মালা গাঁথা হয়েছে।

এই রকমের অন্য কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো—

(ক) ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত।

('ন' এর পরেই 'শ'-এর অনুপ্রাস হয়েছে।)

(খ) দেশ দেশ দিশি দিশি দৌড়িছে দিবা নিশি
অগণিত সিত পীত কৃষ্ণ।

কত কারখানা কল-কজার কল-কল
কলঝঙ্কৃত কালো অঙ্গ।
ইঞ্জিন-গুঞ্জন পুঞ্জিত বিদ্যুতে
চল নয়নে ভূভঙ্গ।

(আগে দ-এর, পরে ত-এর, তৎপরে ক-এর এবং শেষে 'এ'-এর অনুপ্রাস হয়েছে।)

(গ) চ্যুত মুকুল-কুল-সল দলি কুল,
গুণ গুণ রঞ্জন গানে।
মদকল-কোকিল কলবর সঙ্কুল,
রঞ্জিত বাদন তানে।
রতিপতি নর্তন বিরস বিকর্ত্তন,
শুভ ঋতুরাজ-সমাজে।
নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত,
ধীরে ধীরে সমীর বিরাজে।

(যথাক্রমে ক, ল, ন, ক, ত, ব এবং র-এর অনুপ্রাস হয়েছে।)

৯.৩.১.৯ গুচ্ছানুপ্রাস

একের বেশী ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত হয়—তখনই হয় গুচ্ছানুপ্রাস। যেমন—

এত ছলনা কেন বলনা
গোপ-ললনা হ'ল সারা।

এখানে 'লনা' এই ব্যঞ্জনধ্বনি একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত হওয়ায় গুচ্ছানুপ্রাস হয়েছে।

নীচে আরো কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

(ক) না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত।

(খ) কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, দবলী চরাই বনে।

(গ) নন্দ নন্দন চন্দন গন্ধ বিনিন্দিত অঙ্গ।

(ঘ) গত যামিনী জিত দামিনী কামিনী কুল লাজে।

(ঙ) তুমি সুগন্ধ হেনার গন্ধ অন্ধ কুঁড়ির মাঝে
বন্ধ হইয়া ছিলে মূকবেদনায়।

(চ) এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা।

৯.৩.২ যমক

সংজ্ঞা : একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা সার্থক-নিরর্থকভাবে

একাধিকবার উচ্চারিত হলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম যমক অলংকার। ধ্বনিগুচ্ছের নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে একাধিক ব্যবহারের নাম যমক।

যমক শব্দের অর্থ হলো যুগ্ম। একই শব্দ বা প্রায় এক রকমের উচ্চার্য শব্দ যদি দুবার কি তার বেশীবার আলাদা আলাদা অর্থে বসে—তবে যমক অলংকার হয়। যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা'—রবীন্দ্রনাথের এক পঙ্‌ক্তিতে 'সাড়া' এবং 'সারা' ভিন্ন অর্থে বসেছে। যদিও 'ড' এবং 'র' এক বর্ণ নয়, তবু ধ্বনিগত সাদৃশ্যের জন্যে এদের মধ্যে যমক হয়েছে বলতে হবে।

বৈশিষ্ট্য : ১। ধ্বনিগুচ্ছে স্বরধ্বনি থাকবে, ব্যঞ্জনধ্বনিও থাকবে।

২। বাংলায় সমধ্বনির (ই-ঈ, উ-উ, জ-য, শ-ষ-স) উচ্চারণে পার্থক্য নেই। অতএব যমকে সমধ্বনির প্রয়োগ হতে পারে।

৩। ধ্বনির পরিবর্তন হলে যমক থাকবে না, অনুপ্রাস হয়ে যেতে পারে।

৪। ধ্বনিগুচ্ছের একাধিক উচ্চারণ হবে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে। বিন্যাস ক্রমের পরিবর্তন হলে যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে।

৫। ধ্বনিগুচ্ছের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিক উচ্চারণ হবে। অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চারণেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অর্থযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছের নাম শব্দ। অতএব এটি হবে একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ, কিন্তু একই অর্থে নয়। এর নাম সার্থক যমক।

৬। ধ্বনিগুচ্ছের সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিক উচ্চারণ হতে পারে। এর অর্থ, ধ্বনিগুচ্ছের একবার সার্থক বা অর্থযুক্ত উচ্চারণ, অন্যবার নিরর্থক বা অর্থহীন উচ্চারণ। অর্থাৎ, একবার শব্দের উচ্চারণ, অন্যবার শব্দাংশের উচ্চারণ। এর নাম নিরর্থক যমক।

৭। ৫ম-৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা গেল, ধ্বনিগুচ্ছের একটি প্রয়োগ অর্থযুক্ত হবেই, অন্যপ্রয়োগ অর্থযুক্ত বা অর্থহীন হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি প্রয়োগেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থহীন হতে পারে না, হলে তা যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন, 'সৌরভ-রভসে"। এখানে 'রভ' ধ্বনিগুচ্ছ দুবারই উচ্চারিত হয়েছে নিরর্থক শব্দাংশ হিসেবে। অতএব এটি যমক নয় অনুপ্রাস।

এ রকম আরো ক'টি উদাহরণ—

(ক) মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।।

(এখানে মাটি দুবার বসেছে এবং দুটি অর্থ প্রকাশ করছে।)

(খ) ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে।

(এখানে প্রথম 'ঘন' শব্দের অর্থ নিবিড় আর দ্বিতীয় 'ঘন' মানে মেঘ।)

(গ) অনাদনের আনা যায় কত আনারস।

(ঘ) সুশাসনের দ্বারা হর্ষবর্ধন প্রজাদের হর্ষ বর্ধন করেছিলেন।

(ঙ) যাইতে মানস সরে, কার না মানস সরে?

(চ) গুরু কাছে লব গুরু দুখ।

(ছ) হে বসন্তের রাজা আমার।
নাও এসে মোর হার মানা হার!

(প্রথম হারের অর্থ-পরাজয়)

(জ) তুমি মম চির-পূজারিণী।।
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।

(ঝ) ডাকে প্রভাকর-কর, ওহে প্রভাকর-কর
প্রভাকর করের কি ভাব।

(প্রভাকর-কর হচ্ছেন প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দ্বিতীয় প্রভাকর করের অর্থ সূর্য-স্রষ্টা ঈশ্বর।)

(ঞ) যা নাই ভারতে (মহাভারতে) তা নাই ভারতে (ভারতবর্ষে)।

(ট) মনে করি করী করি, কিন্তু হয় হয়, হয় না। (মনে করি হাতী তৈরি করি, কিন্তু ঘোড়া হয়, হাতী হয় না।)

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের (ক) সার্থক যমক ; (খ) নিরর্থক যমক। প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের ১. আদ্যযমক; ২. মধ্যযমক; ৩. অন্ত্যযমক; ৪. সর্বযমক।

বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

(ক) সার্থক যমক :

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারের একই বা সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, তার নাম সার্থক যমক।

উদাহরণ : ১. একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ—

(i) কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার।

ব্যাখ্যা : একই শব্দ ‘কীর্তিবাস’ দুবার উচ্চারিত। প্রথম ‘কীর্তিবাস’ এখানে রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস অর্থে ভুল। বানানে লেখা, দ্বিতীয় ‘কীর্তিবাস’ অর্থ কীর্তির বসতি যেখানে। অতএব, এটি সার্থক যমক।

(খ) নিরর্থক যমক :

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারে একই ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ হয়, তার নাম নিরর্থক যমক।

উদাহরণ :

(i) যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।

ব্যাখ্যা : ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘বন’ প্রথমে উচ্চারিত হয়েছে ‘যৌবন’ শব্দের অংশ হিসেবে। এখানে তার

উচ্চারণ অর্থহীন বা নিরর্থক। ঐ 'বন' পরে উচ্চারিত হল একটি পূর্ণশব্দের মর্যাদা নিয়ে, যখন তার অর্থ হল 'অরণ্য। এখানে তার উচ্চারণ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অতএব, এ উদাহরণ নিরর্থক যমকের।

(ii) বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।

ব্যাখ্যা : 'রবি' ধ্বনিগুচ্ছ 'পূরবী' শব্দের অংশ, অতএব নিরর্থক। 'রবি' স্বতন্ত্র শব্দ, অতএব সার্থক। রবী : আর রাব মূলত একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ (রব), সমস্বরধ্বনি, 'ঈ' আর 'ই'-র সহযোগে তাদের গঠন। এই দুটি ধ্বনিগুচ্ছের একই উচ্চারণ। সুতরাং, এটি নিরর্থক যমক।

৯.৩.২.১ আদ্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের আদিতে যমক থাকলে তার নাম আদ্যমক।

উদাহরণ :

(i) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।

ব্যাখ্যা : 'ভারত' শব্দটির প্রথম প্রয়োগে 'কবি ভারতচন্দ্র রায়' অর্থে, দ্বিতীয় প্রয়োগ 'ভারতবর্ষ' অর্থে। অতএব এটি সার্থক যমক। যমকটি হয়েছে উদ্ধৃত চরণের আদিতে। অতএব, এটি আদ্যযমক।

৯.৩.২.২ মধ্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের মাঝখানে যমক থাকলে তার নাম মধ্যযমক।

উদাহরণ

(i) পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা।

ব্যাখ্যা : প্রথম 'তরি' : অর্থ নৌকা, দ্বিতীয় 'তরি' অর্থ পার হাই। এটি সার্থক যমক। যমকটি চরণের মাঝখানে রয়েছে। অতএব, এটি মধ্যযমকের উদাহরণ।

৯.৩.২.৩ অন্ত্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে একটি পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে, যমক থাকলে তার নাম অন্ত্যযমক।

উদাহরণ : মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয় হয় না।

ব্যাখ্যা : একই শব্দ হয়' চরণের শেষে দুবার উচ্চারিত দুটি ভিন্ন অর্থেপ্রথম অর্থ ঘোড়া, দ্বিতীয় অর্থ হয়ে যায়। অতএব এটি সার্থক যমক, এবং চরণের শেষে রয়েছে বলে অন্ত্যযমক।

৯.৩.২.৪ সর্বযমক :

সংজ্ঞা : একটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পরের চরণে আর একবার করে উচ্চারিত হলে অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ চরণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারিত হলে যে বাক্যগত শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সর্বর্যমক।

উদাহরণ :

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে। কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে।।

ব্যাখ্যা : প্রথম চরণে 'কান্তার' অর্থ বনভূমি, 'আমোদ' অর্থ সৌরভ, 'কান্ত' অর্থ বসন্তকাল আর

'সহকারে' অর্থ সমাগমে। দ্বিতীয় চরণে 'কান্তার' অর্থ প্রিয়তমার 'আমোদ' অর্থ আনন্দ, 'কান্ত' অর্থ প্রিয়তম, সহকারে' অর্থ সঙ্গে। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারণে প্রতিটি শব্দেই একটি করে সার্থক যমক হয়েছে। আবার সামগ্রিকভাবে প্রথম চরণের অর্থ-বনভূমি বসন্তসমাগমে সৌরভপূর্ণ, দ্বিতীয় চরণের অর্থপ্রিয়তমের সঙ্গলাভে প্রিয়তমার আনন্দ সম্পূর্ণ। অতএব, এটি বাক্যগত সার্থক যমক এবং সর্বযমক।

৯.৩.৩ শব্দশ্লেষ

সংজ্ঞ : একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ পেলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম শ্লেষ (শব্দশ্লেষ) অলঙ্কার। (একটি শব্দের একবার ব্যবহারে একাধিক অর্থ বোঝালে শ্লেষ।)

একটি শব্দ যখন একের বেশী অর্থে একবার বাক্যে বসেতখনই শ্লেষ অলংকার হয়। বাক্যে শব্দ একবার মাত্র বসবে, কিন্তু একাধিক অর্থ প্রকাশ করবে, বা এই একাধিক অর্থ প্রকাশ করতেই ইচ্ছুক থাকবেন, নচেৎ শ্লেষ হবে না। বক্ত এমন একাধিক শব্দ ব্যবহার করলেনযার একটি বিশিষ্ট অর্থ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বলেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শ্রোতা তার অন্য অর্থ খুঁজে বের করে শব্দটিকে অন্য রকমে বুঝেছেন তেমন ক্ষেত্রে শ্লেষ হয় না।

শব্দের দুটি অর্থ হবে ঠিকই, কিন্তু শব্দকে অক্ষত বা অবিকৃত থাকতে হবে, সেই জন্যে শব্দের যে ধ্বনিতা নিত্য হয়ে প্রাধান্য লাভ করছে; সুতরাং যমকের মতো শ্লেষও নিঃসন্দেহে শব্দালংকার।

বৈশিষ্ট্য :

১। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

২। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ—

(ক) আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে।।

এখানে 'গুণ' শব্দটি একবার মাত্র উল্লিখিত, কিন্তু দুটি অর্থ প্রকাশ করছে, একটি হলো ধনুকের ছিলা এবং অন্যটিচারিত্রিক গুণ বা উৎকর্ষ।

(খ) বুদ্ধের মতন যার আনন্দ সে নিত্য সহচর।

বুদ্ধদেবের যেমন আনন্দ নামে জনৈক শিষ্য সর্বদা বুদ্ধদেবের সঙ্গে থাকতেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের জীবনে আনন্দ নিত্য সহচর ছিল। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে আনন্দ শিষ্যের নাম, রবীন্দ্রনাথের হলো উচ্চজাতের সুখ।

(গ) কাটছে বটেপোকায় কিন্তু
আলমারি কি সিন্দুকেই। বই কাটছে, তবে পোকায়। কাটছে (কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া হিসেবে) বিক্রীত হচ্ছে—এই একটি অর্থ, আর পোকার দ্বারা নষ্ট হচ্ছে—এই দ্বিতীয় অর্থ সূচিত হচ্ছে।

(ঘ) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত লুকিয়ে নেই, তিনি সর্বত্রই আছেন, তাঁর জন্যেই সংবাদপত্র প্রভাকর প্রকাশিত হচ্ছে। আর অন্য অর্থও সূচিত হচ্ছেভগবান গুপ্ত নেই, তিনি সর্বত্র বিরাজিত, তাঁর তেজেই প্রভাকর সূর্য দীপ্তিমান হচ্ছে।

প্রকারভেদ

বাংলায় শ্লেষ বলতে শব্দ শ্লেষকেই বোঝায়। এই শ্লেষ বা শব্দশ্লেষ দু-রকমের

১. অভ শেষ ২. সভঙ্গ শ্লেষ।

সংজ্ঞা উদাহরণ ব্যাখ্যা

৯.৩.৩.১ অভঙ্গ শেষ

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম অভঙ্গ শেষ। শব্দকে ভঙ্গ না করে যখন দুটি অর্থে তাকে প্রয়োগ করা হয়—তখন শব্দের অভঙ্গ শ্লেষ হয়। আগের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে। এনেছে তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে'—এখানে 'গুণে' শব্দটিকে যথাযথ রেখে দিয়েই আমরা স্বভাবের মাধুর্য বা উৎকর্ষ এবং ধনুকের ছিলা' বুঝছি, 'গুণ' শব্দটিকে ভাঙতে হচ্ছে নাতাই এখানে অভঙ্গ শ্লেষ হয়েছে।

উদাহরণ :

(ক) মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে।

ব্যাখ্যা : 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই চরণটিতে বিদায়-মুহূর্তে কবি মধুসূদন মাতৃভূমির কাছে বিস্মৃত হবার যে আবেদন রাখছেন, সেই প্রসঙ্গে 'মধু' শব্দটিকে দুটি অর্থে তিনি প্রয়োগ করছেন। প্রথম অর্থ 'কবি মধুসূদন দত্ত, দ্বিতীয় অর্থ 'মউ'। একটি প্রয়োগে শব্দটিকে না ভেঙেই দুটি অর্থ পাওয়া গেল। অতএব, এটি অভঙ্গ শ্লেষ।

(খ) বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণের ষাট-বছর পেরিয়ে যাওয়া কবি তার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে আসার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে পূরবী' আর 'রবি' শব্দ দুটি করে অর্থে প্রয়োগ করেছেন। 'পূরবী'র একটি অর্থ কবির নিজের লেখা 'পূরবী' কাব্য, আর-একটি অর্থ 'সূর্য'। দুটি শব্দেরই দুটি করে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে শব্দদুটিকে না ভেঙে এবং একবার মাত্র উচ্চারণ করে। অতএব, এখানকার অলংকার অভঙ্গ শ্লেষ।

মন্তব্য : পূরবী আর 'রবি' শব্দের শ্লেষ গোটা বাক্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। বাক্যটির প্রথম অর্থ, পূরবী-কাব্যের ছন্দে রবীন্দ্রনাথের জীবন-শেষ হয়ে আসার করুণ ভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বিতীয় অর্থ, পূরবী রাগিণীর করুণ সুরে বীণা বাজছে সূর্যাস্তের মুহূর্তে। অন্যদিকে 'পূরবী'র নিরর্থক অংশ 'রবী' আর সার্থক 'রবি'—এই দুটি শব্দ শব্দাংশ দিয়ে নিরর্থক যমক অলংকারও তৈরি হয়েছে।

৯.৩.৩.২ সভঙ্গ শ্লেষ :

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম সভা শ্লেষ।

বাংলা ভাষায় সভঙ্গ শ্লেষের চল নেই। তবু দু'একটা চলতি উদাহরণ আছে—

(ক) জগৎটা কার বশ? (জগৎ টাকার বশ।)।

(এখানে 'টাকার' শব্দকে ভেঙে 'টা' এবং 'কার'এই দুটি ভাগ করা হয়েছে, জগতের সঙ্গে 'টা' যুক্ত করপ্রেশ্নসূচক বাক্যের এক মানে, আবার টাকার শব্দকে একত্রে রেখে জগৎ শব্দ থেকে বিচ্যুত করে নিলে বাক্যটি উত্তর সূচক হয়ে দাঁড়াবে। টাকার শব্দটিকে ভঙ্গ করা হলো বলেই দুটি অর্থ পাওয়া গেল, তাই এখানে সভঙ্গ শ্লেষ হয়েছে বলতে হবে।)

আরও উদাহরণ —

(i) আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মুলতানে
গুঞ্জন তার রবে চিরনি, ভুলে যাবে তার মানে।

ব্যাখ্যা : 'রোগশয্যায়' কাব্য থেকে উদ্ধৃত অংশের প্রথম চরণে 'মূলতান' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন দুটি অর্থে। প্রথম অর্থ 'সূর্যাস্তকালীন রাগিণীবিশেষ'এটি অখন্ড 'সুলতান' শব্দেরই অর্থ। 'মূলতান' শব্দটিকে 'মূল' আর 'তান' এই দুটি অংশে ভাঙলে যে অর্থটি মেলে তা এই—'বিশ্ববীণার মূল বা উৎস-তন্ত্রীতে আনন্দের যে তান বা সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে।' প্রথমে না ভেঙে একটি অর্থ, পরে ভেঙে আর-একটি অর্থ 'মূলতান' শব্দটি থেকে পাওয়া গেল। অতএব, এটি সভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ।

৯.৩.৪ বক্রোক্তি

সংজ্ঞা : যেখানে বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে বাঁকাভাবে অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বলা হয়, অথবা বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেখানে কণ্ঠভঙ্গি অথবা শ্লেষের কারণে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়। এর নাম বক্রোকি অলংকার। বা কোনো কথা ঘুরিয়ে বললে অথবা শ্রোতা কথাটির সহজ অর্থ ছেড়ে দিয়ে অন্য অর্থ ধরলেই বক্রোক্তি।

এক অর্থে ব্যবহার করা শব্দকে যদি প্রশ্ন বা স্বর-বিকৃতির দ্বারা অন্য অর্থে সহযাজন করে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলেই বক্রোক্তি অলংকার হয়।

বৈশিষ্ট্য :

১। বক্রোক্তি' (বক্র + উক্তি) অর্থ বাঁকা কথা। কথায় সৌন্দর্য ফোটানোর লক্ষ্যেই এ ও আবশ্যক। উক্তির এই ক্রতা সৃষ্টির জন্য কবিরা দুটি কৌশল প্রয়োগ করেন—একটি 'কাকু' বা কষ্টভঙ্গি, আর একটি 'শ্লেষ' বা দ্ব্যর্থকতা (কথাটির দুটি অর্থ)।

২। বক্রোক্তির প্রথম লক্ষণ বক্তার তরফে বক্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে বলা। 'কাকু' বা বিশেষ ভঙ্গির সাহায্যেই কথায় বক্রতা আনা যেতে পারে। ভঙ্গিটা যদি এমন হয় যে, হাঁ-প্রশ্নবাক্য দিয়ে না-বোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্য দিয়ে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তাহলে হবে কাকু-বক্রোক্তি।

৩। বক্রোক্তির দ্বিতীয় লক্ষণ, শ্রোতার তরফে বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, বক্তা যে কথাটির প্রয়োগ করেছেন তার দুটি অর্থ—একটি বক্তার অভিপ্রেত অর্থ, অনাটি শ্রোতাব গৃহীত অর্থ। অতএব, কথাটির প্রয়োগে শ্লেষ আছে। দেখা যায়, শ্লেষের সুযোগ নিয়ে শ্রোতা প্রতিবারই কথাটিকে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের দিকে টেনে নিচ্ছেন, অভিপ্রেত অর্থটি বারে বারে উপেক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে বক্তা এবং শ্রোতাব উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্য তৈরি হতে থাকে। এরই নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

প্রকারভেদ

বক্রোক্তি দু-রকমের—১. কাকু-বক্রোক্তি; ২. শ্লেষ বক্রোক্তি।

৯.৩.৪.১ কাকু-বক্রোক্তি

সংজ্ঞা : যে বক্রোক্তি অলংকারে কাকু বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির হাঁ-প্রশ্নবোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্যে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তার নাম কাকু-বক্রোক্তি।

উদাহরণ :

(i) রাবণ শশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?

ব্যাখ্যা : ‘মেঘনাদকাব্য’ থেকে উদ্ধৃত এই চরণদুটি হাঁ-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত। এর উত্তরে শ্রোতাকে উপলব্ধি করতে হয় যে, প্রমীলা ভিখারি রাঘবকে একটু ভয় করে না। উপলব্ধিটি না-বোধক। বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত হাঁ-প্রশ্নবোধ না-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পেল বলে এখানে কাকু-বক্রোক্তি হয়েছে।

(ii) মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?

ব্যাখ্যা : ‘গান্ধারীর আবেদন’ থেকে উদ্ধৃত গান্ধারীর এই উক্তি না-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত (‘নহি’ ‘বহি নাই’)। স্নেহ-দুর্বল ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর বক্তব্য—তিনিও মা, দুর্যোধনকে গর্ভে বহন করার দুঃখ তিনি বরণ করেছেন। বক্তব্যবটি হাঁ-বোধক। কিন্তু এটি প্রকাশ পেল বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত না-প্রশ্নবাক্য থেকে। এতএব অলংকার এখানে কাকু-বক্রোক্তি।

এই রকম আরো দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(ক) কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?

(খ) দানব নন্দিনী আমি রক্ষঃকুলবধূ;
রাবণ শশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?

(গ) স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?

(ঘ) কে না জানে অলংকারে অঙ্গনা বিলাসী?
(ঙ) গ্রহ দোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী?
(চ) ফোটে কি কমল কভু কমল সলিলে?
(ছ) ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার?
(জ) বিদ্যুতে কেবা মুঠিতে ধরিতে পারে?
(ঝ) নাহি মোর অস্ত্র মোরা তোর সমজনে
ইচ্ছা? শৃগাল সহ সিংহী কি বিরাজে?
(ঞ) কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে?
(ট) কোনো এক সুদূর আকাশে।
ছোট ছোট তারা যদি সূর্যগ্রভ হয়,
তবে স্ফুলিঙ্গের মতো যত তৃপ্তি এ হৃদয়ে আসে
প্রাণের অনন্তলোকে তারা কি শাশ্বত সূর্য নয়?

৯.৩.৪.২ শ্লেষ-বক্রোক্তি

সংজ্ঞা : যে বক্রোক্তি অলংকারে বক্তার কথায় শ্লেষ বা দুটি অর্থ থাকে এবং শ্রোতা বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ উ না করে অন্য অনভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ করেন, তার নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

উদাহরণ :

বক্তা—দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন?
শ্রোতা—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।
বক্তা—বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?
শ্রোতা—সুরে না সেবিলে বল মুক্তি কিসে হয়?

ব্যাখ্যা : বক্তার প্রথম কথায় 'দ্বিজ' এবং বারুণী' শব্দের দুটি করে অর্থ। 'দ্বিজ' শব্দের একটি অর্থ ব্রাত্মণ এবং 'বারুণী'-র একটি অর্থ মদ। অতএব বক্তার অভিপ্রেত অর্থ-ব্রাত্মণ হয়ে মদ খাও কেন? 'দ্বিজ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ চাঁদ, 'বারুণীর'-র অর্থ পশ্চিমদিক। শ্রোতার গৃহীত অর্থটি এইরকমচাদ পশ্চিমদিকে যাচ্ছে কেন? এই অর্থ ধরেই তার উত্তর-সূর্য উঠছে তাই চাদ ডুবছে। এটি বক্তার অনভিপ্রেত অর্থ। এইভাবে শ্রোতা শ্লেষের সুযোগে বস্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অনভিপ্রেত অন্য অর্থটি গ্রহণ করায় শ্লেষ-বক্রোক্তি হয়েছে।

বক্তার দ্বিতীয় বাক্যেও একইভাবে 'সুরাসক্ত' শব্দটিকে কেন্দ্র করে বক্রোক্তি হয়েছে। 'সুরাসক্ত' থেকে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ 'সুরায় আসক্ত' বা মদখোর (সুরা + আসক্ত), কিন্তু শ্রোতার গৃহীত অর্থ 'সুরে আসক্ত' বা দেবভক্ত (সুর + আসক্ত)। বক্তার এই অনভিপ্রেত অর্থটি ধরেই শ্রোতার উত্তরদেবসেবা ছাড়া মুক্তি নেই। অতএব, এখানেও শ্লেষ-বক্রোক্তি।

৯.৪ সারাংশ

শব্দ হল মূর্ত ধ্বনি বা ধ্বনি-সংকেত। শব্দের বহিরঙ্গের যে ধ্বনি তার ওপরেই শব্দালংকারের ভিত্তি। শব্দের ধ্বনিকে কেন্দ্র করে যে অলংকার গড়ে ওঠে তাকে বলে শব্দালংকার। শব্দালংকার ছয় প্রকার। অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি, ধন্যক্তি এবং পুনরুক্তিবদাভাস।

অনুপ্রাস—একই ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছের একাধিকবার উচ্চারণে অনুপ্রাস। **প্রকারভেদ**—১. সরল অনুপ্রাস ২. বৃত্ত্যনুপ্রাস; ৩. ছেকানুপ্রাস; ৪. শ্রুত্যনুপ্রাস; ৫. আদ্যানুপ্রাস; ৬. অন্ত্যানুপ্রাস; ৭. সর্বানুপ্রাস; ৮. মালানুপ্রাস; ৯. গুচ্ছানুপ্রাস। একটি বা দুটি বর্ণ (স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি) একাধিকবার ধ্বনিত হলেই এই সরল অনুপ্রাস হয়। **বৃত্ত্যনুপ্রাস**—একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণে বা ক্রম অনুসারে বহুবার (যুক্ত বা বিযুক্ত) উচ্চারণে বৃত্তানুপ্রাস। **ছেকানুপ্রাস**—একই ব্যনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার যুক্ত অথবা বিযুক্ত উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস। **শ্রুত্যনুপ্রাস**—বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে শ্রুত্যনুপ্রাস। **আদ্যানুপ্রাস**—পদ্যে পরপর দুটি চরণের বা পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে আদ্যানুপ্রাস। **অন্ত্যানুপ্রাস**—পদ্যে পরপর দুটি চরণের শেষে, পদের শেষে, পর্বের শেষে, এমনকী পঙ্ক্তির (ভুদ্রত্র) শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে অত্যানুপ্রাস। **সর্বানুপ্রাস**—পদ্যে দুটি চরণের সর্বশরীরে (প্রতিটি শব্দে) অনুপ্রাস থাকলে, অর্থাৎ প্রথম চরণের প্রতিটি শব্দের কোনো ধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে দ্বিতীয় চরণের প্রতিটি শব্দে পরপর পুনরাবৃত্ত হলে সর্বানুপ্রাস। **মালানুপ্রাস**—অনুপ্রাসের মালা অর্থাৎ একাধিক অনুপ্রাস যখন বাক্যে থাকে---তখন সেখানে মালানুপ্রাস রয়েছে বলা হয়। **গুচ্ছানুপ্রাস**—একের বেশী ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত হয়—তখনই হয় গুচ্ছানুপ্রাস।

যমক—একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিকবার উচ্চারিত হলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম যমক অলংকার। ধ্বনিগুচ্ছের নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে একাধিক ব্যবহারের নাম যমক। প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের—(ক) সার্থক যমক ; (খ) নিরর্থক যমক। প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের—১. আদ্যযমক; ২. মধ্যযমক; ৩. অন্ত্যযমক; ৪. সর্বমক। যে যমক অলংকারের একই বা সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, তার নাম সার্থক যমক। যে যমক অলংকারে একই ধ্বনিগুচ্ছের। একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ এবং অন্যবার শব্দাংশরপে নিরর্থক উচ্চারণ হয়, তার নাম **নিরর্থক যমক**। **আদ্যযমক**—পদ্যে চরণের আদিতে যমক থাকলে তার নাম আদ্যযমক। **মধ্যযমক**—পদ্যে চরণের মাঝখানে যমক থাকলে তার নাম মধ্যযমক। **অন্ত্যযমক**—পদ্যে একটি পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে, যমক থাকলে তার নাম অন্ত্যযমক। **সর্বযমক**—এটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পরের চরণে আর একবার করে উচ্চারিত হলে তার নাম সমক।

শব্দশ্লেষ—একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ পেলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম শ্লেষ অলঙ্কার। **প্রকারভেদ**—এই শ্লেষ বা শব্দশ্লেষ দু-রকমের ১. অভঙ্গ শ্লেষ ২. সভঙ্গ শ্লেষ। **অভঙ্গ শ্লেষ**—যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম

অভঙ্গ শ্লেষ। **সভঙ্গ শ্লেষ**—যে যে অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম সভঙ্গ শ্লেষ।

বক্রোক্তি—বক্তা কোনো কথা ঘুরিয়ে বললে অথবা শ্রোতা কথাটির সহজ অর্থ ছেড়ে দিয়ে অন্য অর্থ ধরলেই বক্রোক্তি। বক্রোক্তি দু-রকমের ১. কাকু-বক্রোক্তি; ২. শ্লেষ-বক্রোক্তি। **কাকু-বক্রোক্তি**—যে বক্রোক্তি অলংকারে কাকু বা বিশেষ কভঙ্গির হাঁ-প্রশ্নবোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্যে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তার নাম কাকু-বক্রোক্তি। **শ্লেষ-বক্রোক্তি**—যে বক্রোক্তি অলংকারে বক্তার কথায় শ্লেষ বা দুটি অর্থ থাকে এবং শ্রোতা বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ করে অন্য অনভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ করেন, তার নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

৯.৫ অনুশীলনী

১. শব্দালংকার বলতে কী বোঝায়, সংক্ষেপে লিখুন।

২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার, অর্থের অলংকার নয়।

৩. প্রধান চারটি শব্দালংকারের নাম এবং তাদের বিভাগগুলির নাম উল্লেখ করুন।

৪. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—ছেকানুপ্রাস, নিরর্থক যমক, অভঙ্গ শ্লেষ, কাকু-বক্রোক্তি।

৫. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) পৃথিবীটা কার বশ!

(খ) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।

(গ) ধরি তার কর দুটি আদেশ পাইলে উঠি।

(ঘ) লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।

(ঙ) কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি।

(চ) মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয় হয় না।

(ছ) না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত।

(জ) কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, দবলী চরাই বনে।

(ঝ) নন্দ নন্দন চন্দন গন্ধ বিনিন্দিত অঙ্গ।

(ঞ) গত যামিনী জিত দামিনী কামিনী কুল লাজে।

৬. সঠিক অলংকার কোনটি, লিখুন—

(ক) কবির বুকের দুখের কাব্য—ছেকানুপ্রাস না বৃত্ত্যানুপ্রাস?

(খ) আর কি শুধু আসার আশায় থাকি—যমক না ছেকানুপ্রাস?

(গ) একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু—যমক না ছেকানুপ্রাস?

একক ১১ : অর্থালংকার

একক গঠন :

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ ভূমিকা

১১.৩ শব্দালংকার আর অর্থালংকারের পার্থক্য

১১.৪ মূলপাঠ : সাদৃশ্যমূলক অলংকার

১১.৪.১ উপমা

১১.৪.১.১ পূর্ণোপমা

১১.৪.১.২ লুপ্তোপমা

১১.৪.১.৩ মালোপমা

১১.৪.১.৪ স্মরণোপমা

১১.৪.১.৫ মহোপমা

১১.৪.২ রূপক

১১.৪.২.১ নিরঙ্গরূপক

১১.৪.২.১.১ কেবল নিরঙ্গরূপক

১১.৪.২.১.২ মালা নিরঙ্গরূপক

১১.৪.২.২ সাঙ্গরূপক

১১.৪.২.৩ পরম্পরিত রূপক

১১.৪.২.৪ অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক

১১.৪.৩ উৎপ্রেক্ষা

১১.৪.৩.১ বাচ্যোৎপ্রেক্ষা

১১.৪.৩.২ প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা

১১.৪.৩.৩ মালোৎপ্রেক্ষা

১১.৪.৪ অপহ্নুতি

১১.৪.৫ সমাসোক্তি

১১.৪.৬ অতিশয়োক্তি

১১.৪.৭ ব্যতিরেক

১১.৪.৭.১ উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক
১১.৪.৭.২ অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক
১১.৭ সারাংশ
১১.৮ অনুশীলনী

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল শব্দের ধ্বনিরূপকে অতিক্রম করে কীভাবে শব্দের অর্থগৌরব বড় হয়ে ওঠে সেটি দেখানো। সে-সঙ্গে কবিতার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করতে শব্দার্থ কীভাবে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, তা উল্লেখ করা। শিক্ষার্থীর কাছে ধরা দেবে কবির শব্দার্থের প্রয়োগগত কৌশল। নিরন্তর চর্চায় শিক্ষার্থী এ বিষয়ে পারঙ্গম হয়ে উঠবে এটিই প্রত্যাশা।

১১.২ ভূমিকা

অর্থালংকারে বাইরের রূপটি বড় নয়। শব্দের ধ্বনিগত উজ্জ্বলতায় এই অলংকার নিরূপিত হয় না। অর্থালংকার শব্দের রূপ থেকে অরূপের দিকে চলে। বাচ্যকে অতিক্রম করে বাচ্যাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করে। স্তবক বা তার অন্তর্গত চরণ বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর গড়ে ওঠে, তাহলে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। 'অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে' বলতে এই বোঝাতে চাই, বাক্য বা শব্দের অর্থ অক্ষত রেখে শব্দ বদল করে দিলেও অলংকার যা ছিল, তাই থাকবে। কিন্তু শব্দ বদলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থটিও যদি বদলে যায়, তাহলে অলংকারটি আর টিকবে না। যে অলংকার অর্থের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকেই অর্থালংকার বলে। এই জাতের অলংকার শব্দকে যদি সরিয়ে রেখে তার প্রতিশব্দ বসানো যায়, তবুও অলংকারের সৌন্দর্যনাশ হয় না। তাই একে অর্থালংকার বলে।

১১.৩ শব্দালংকার আর অর্থালংকারের পার্থক্য

১. শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, অর্থালংকার অর্থের অলংকার। প্রথমটি ধ্বনির মাধুর্য, দ্বিতীয়টি অর্থের সৌন্দর্য।

২. শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে, অর্থালংকারের আবেদন বোধের কাছে।

৩. শব্দালংকার শব্দের বদল সহ্য করে না, শব্দবদলে এর অপমৃত্যু। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে; শব্দ-অর্থ দুই-ই বদলে গেলে অর্থালংকারেরও অপমৃত্যু।

সংস্কৃত কাব্যে যেসব অর্থালংকারের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সংখ্যা অনেক। বাংলা কবিতায় এর প্রয়োগ তুলনায় অনেকটা সীমিত। অনেক রকমের অর্থালংকার আছে। তবু ওদের সাধারণ লক্ষণ দেখে যদি শ্রেণীবিভাগ করা যায় তবে পাঁচটা শ্রেণীতে ওদের ফেলতে হবে। যথা—সাদৃশ্যমূল, বিরোধমূল, শৃঙ্খলামূল, ন্যায়মূল আর গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূল অলংকার। নামগুলি সংস্কৃত আলংকারিকদের দেওয়া।

আমরা প্রথমে সাদৃশ্যমূল অলংকারের আলোচনা করবো। সাদৃশ্যমূল অলংকারের মধ্যে পড়ে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, উল্লেখ, সন্দেহ, দীপক, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, নির্দশনা, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, তুল্যযোগিতা প্রভৃতি। আমাদের আলোচ্য—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অপহ্নুতি, সমাসক্তি, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি।

১১.৪ সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

দুটি বস্তুর সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা একটিকে আর একটির সঙ্গে তুলনা করে থাকি। অতএব, অলংকার-নির্মাণের জন্য যে-সাদৃশ্য কবিরা খোঁজেন, তার মূল শর্তই হল দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান। বস্তুদুটি বাইরে থেকে যত বেশি বিসদৃশ বা বিজাতীয় হবে, সাদৃশ্য তত বেশি সুক্ষ্ম হবে, অলংকার তত আকর্ষক হবে। এই সাদৃশ্য কবিরা প্রধানত তিনটি উপায়ে দেখিয়ে থাকেন :

১. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়েও তাদের জন্য সমান মূল্য বরাদ্দ।
২. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা।
৩. বস্তুদুটির পার্থক্য বা ভেদকে প্রাধান্য দেওয়া।

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের চারটি অঙ্গ বা অবয়ব :

১. যা তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু।
২. যার সঙ্গে তুলনা।
৩. যে-ধর্ম দুটি বস্তুতেই থাকে এবং বস্তুদুটিকে তুলনীয় করে।
৪. যে ভঙ্গিতে তুলনা করা হয়।

প্রথমটি উপমেয়, দ্বিতীয়টি উপমান, তৃতীয়টি সাধারণ ধর্ম, চতুর্থটি সাদৃশ্য অথবা তুলনাবাচক শব্দ।

উদাহরণ ব্যাখ্যা করে অঙ্গ-চারটি বোঝার চেষ্টা করা যাক :

১১.৪.১ উপমা

সংজ্ঞা : একই বাক্যে বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উপমা অলংকার।

একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সদৃশ বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের উল্লেখের

দ্বারা যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়—তাকেই উপমা বলে। সংক্ষেপে বলা যায় যে সমধর্মবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন জাতীয় মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোই উপমা বলে।

যে দুটি বস্তুর সাদৃশ্য দেখানো হচ্ছে তাদের মধ্যে বৈধর্ম অবশ্যই থাকবে, আর সেই বৈধর্মের উল্লেখ না করে শুধু সাদৃশ্যের উল্লেখ করতে হবে। উপমা অলংকার প্রসঙ্গে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। একটা উদাহরণ ধরা যাক।

সর্পসম কুর
খল জল ছল-ভরা।

জল এবং সাপ দুটি ভিন্ন বস্তু, উভয়ের মধ্যে বৈধর্ম রয়েছে; কিন্তু সে বৈধর্মের উল্লেখ নেই; এবং উভয় বস্তুর মধ্যে ক্রুরতা এবং খলত্বের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, চমৎকারিত্বেরও সৃষ্টি হয়েছে—এবং একই বাক্যে এই কাণ্ডটি ঘটেছে। তাই এটি উপমা অলংকারের একটি সুন্দর উদাহরণ।

বৈশিষ্ট্য :

১। একটিমাত্র বাক্য থাকবে।

২। দুটি বিজাতীয় বা বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে তুলনা হবে (উপমেয়-উপমান)।

৩। বস্তুদুটির বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যের উল্লেখ থাকবে না।

৪। বস্তুদুটির মধ্যে সাদৃশ্য বা মিলটুকু দেখানো হবে (সাধারণ ধর্ম)।

৫। সাদৃশ্য দেখানো হবে সাধারণত বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে (সাদৃশ্যবাচক শব্দ)। উপমা অলংকারে ব্যবহার্য সাদৃশ্যবাচক শব্দের তালিকাটি এইরকম : মত, মতন, ন্যায়, রূপে, নিভ, পারা, প্রায়, তুলা, সম, তুল্য, হেন যেমতি, কল্স, সদৃশ, বৎ, যথা যেন, রীতি ইত্যাদি।

অতএব, উপমার চারটি অঙ্গ-উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

৬। উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো—বিজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য-প্রতিষ্ঠার এটি প্রথম স্তর।

উপমেয়—যার তুলনা দেওয়া হয়—তা হলো উপমেয়। ‘পদ্মের মতো সুন্দর’ বললে মুখের তুলনা দেওয়া হচ্ছে, তাই মুখ উপমেয়। মুখকেই আমি বর্ণনা করছি মুখ তাই প্রধান, সে ক্ষেত্রে মুখ উপমেয় ঠিকই থাকতো, যার সঙ্গে তুলনা দিচ্ছি—সেই পদটির বদল হতো। তাতে বর্ণনীয় বিষয়ের (পদটির) কিছু যেত আসতো না। তাই উপমেয়কেই আলংকারিকেরা ‘প্রকৃত’ বা ‘বর্ণনীয় বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। মুখ এখানে প্রকৃত বা বর্ণনীয় বিষয়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে উপমেয়কে প্রস্তুত।

উপমান—যার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়—তুলনা করা হয়—তাই হচ্ছে উপমান। (অর্থাৎ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যে বস্তু অনুপস্থিত থাকে—অথচ ঐ অনুপস্থিত বস্তুর উল্লেখ করে তার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে—তাকে উপমান বলে।) উপমেয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত বাক্যে ‘পদ্ম’ উপমান; কারণ অনুপস্থিত পদ্মের সঙ্গে মুখের তুলনা করা হচ্ছে। উপমান প্রসঙ্গপ্রাপ্ত নয়, কতকটা বাইরের বস্তু, তাই একে অপ্রস্তুত বা অপ্রাকৃত বলা হয়েছে।

সামান্য বা সাধারণ ধর্ম—যে ধর্ম বা গুণ উপমেয় আর উপমানের মধ্যে থেকে তুলনাকে সম্ভব ও সফল করে তোলে তাকে **সামান্য বা সাধারণ ধর্ম** বলে। পদ্মে এবং মুখে সৌন্দর্য রয়েছে, এবং এই সদৃশ ধর্মের সূত্র ধরেই উপমান এবং উপমেয়ের মেলবন্ধন ঘটেছে। তাই 'সুন্দর' সামান্যধর্ম। সংক্ষেপে বলা যায় যে উপমেয় এবং উপমানের যা সাধারণ সম্পত্তি—তাই সামান্যধর্ম। সামান্য ধর্মের আর এক নাম হচ্ছে সাধারণ ধর্ম।

সাদৃশ্যবাচক শব্দ—মত বা মতে, মতন, সম, যথা, নিভ, তুল, সমতুল, যেমন, জনু, যথা, যৈছে, প্রায়, পারা, উপমা, তুল্য, হেন, ন্যায়, জাতীয়, সদৃশ, সমান, যেন, প্রতিম, ভাতি, রীতি, সংকাশ, প্রমাণ, বৎ প্রভৃতি অব্যয়গুলিকে (যাদের দ্বারা উপমা বোঝায়) **সাদৃশ্যবাচক শব্দ** বলে। এরাই উপমেয় এবং উপমানকে একত্রে গ্রথিত করে।

মত : (ক) ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ।
(খ) মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে।

মতন : (ক) তারার মতন স্থির, হীরকের মত শুচিস্মিত।
(খ) প্রেতের মতন এক ধূসর বিষাদ এইখানে থাকে।

সম : (ক) এ হৃদয় মম।
তপোভঙ্গভয়ভীত তপোবন সম।
(খ) কণ্টক গাড়ি কমল পদ পদতল
মীর চীর হি ঝাপি।
(গ) তারে ঘিরে সামান্য এ ভাষা
উদ্বাহু বামন সম অনন্তের স্পর্শের প্রত্যাশা।

যথা : সিন্দুর বিন্দু শোভিত ললাটে
গোধূলি ললাটে আঁকা তারারত্ন

নিভা : হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননি।

তুল : তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল্ কোন্ ফুল?

সমতুল : রচিয়াছ রাজা-কবি! কাহিনী প্রিয়ার
আঁখিজল জমানো বরফ—
সমতুল মর্মর—কাগজ তুহার

দুনিয়ার মাণিক হরফ।

যেমন : আমরা একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর (পদ্মর) উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে অথচ দূর দিয়ে।

সদৃশ : অগ্নি সদৃশ্য ক্রোধে সে জ্বলছে,
নবনী সদৃশ মনটা গলছে।

জনু : লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।

যৈছে : কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌম আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।

প্রায় : (ক) এতক্ষণ ছায়া প্রায়।
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে ঘেঁষে।
(খ) কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা,
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা।
(গ) এই বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায় প্রান্তর তার ছায়,
আজ বঙ্গের বীর সিংহের নাম অন্তর তার পায়।

পারা : আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।

উপমা : (ক) প্রতি অঙ্গ নিরূপম লাবণ্যের সীমা।
কোটিচন্দ্র নহে এক নখের উপমা।
(এখানে উপমা শব্দের অর্থ মত। এটি ব্যতিরেকে অলংকারেরও সুন্দর উদাহরণ।)

(খ) বিষে তনু নীলরুচি আত্মা তবু শুভ্র শুচি
নীলাম্বরে পূর্ণ চন্দ্রোপম।
সহস্র ফণার মাঝে তোমার পৌরুষ রাজে
মহাবীর্য্য গরুড়ের সম।

তুল্য : এতক্ষণের কান্না শেষে মায়ের কোলে শিশু
হাসি দিয়ে খুললোরে মুখ খুললো—
ফুটলো হাসি সদ্য তোলা ছোট্ট সাজিভরা
শিশির ভেজা শেফালিকাতুল্য।

হেন : (ক) জ্বলন অনল হেনরমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি তেজিল তার লেহ। বাসু ঘোষ
(খ) কানু হেন গুণনিদি কারে দিয়ে যাব।

ন্যায় : রমণীর রূপ-মোহে নর পোড়ে হায়,
বহ্নিমুখে প্রবেশেছু পতঙ্গের ন্যায়।

জাতীয় : গদ্যজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া ভার।

সদৃশ : প্রেমিকের মুখে আহা আধো আধো কথা,
অর্ধস্ফুট দলম্রেলা ফুলের সদৃশ।

সমান : (ক) শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।
(খ) অনল সমান পোড়ে চইতের খরা
চালুসেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা।
(গ) ভাঙ্গিল দরদ ভুজগ-ঈশ।
উগরে অনল সমান বিষ।

যেন : মায়ার আবর্ত রচে আসায় যাওয়ার চল সংসারে।
ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ায় ভাটায় জোয়ারে।

প্রতিম : নীরেন্দ্র প্রতিম নীল নির্মল আকাশ।

ভাতি : পুরাণ বসন ভাতি অবলা জনের জাতি।

রীতি : কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।

সংকাশ : রামানন্দ তাকিয়ে আছেন
জবাকুসুম সংকাশ সূর্যোদয়ের দিকে।

প্রমাণ : মনে মনে বলি আমরা মানুষ
হিসেব খতিয়ে-খতিয়ে—
মাঝে মাঝে গ্লানি পাহাড় প্রমাণ
দম্ভ, হতাশা, নির্বেদ।

বৎ : পড়ে আছে প্রাণহীন পথ,—
আদিম সৃষ্টির বুকে অতিকায় সরীসৃপবৎ।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

বাংলায় উপমার উল্লেখযোগ্য বিভাগ পাঁচটি

(ক) পূর্ণোপমা;

(খ) লুপ্তোপমা;

(গ) মালোপমা;

(ঘ) স্মরণোপমা;

(ঙ) মহোপমা।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

১১.৪.১.১ পূর্ণোপমা :

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারের উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকে, তার নাম পূর্ণোপমা (পূর্ণ + উপমা)।

উদাহরণ :

(ক) আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম।

সংকেত : ছুরি এখানে উপমেয়, 'প্রভাতরশ্মি' উপমান, 'তীক্ষ দীপ্ত' সামান্য ধর্ম আর 'সম' হচ্ছে সাদৃশ্যবাচক শব্দ। এখানে উপমার চারটে অঙ্গই উপস্থিত।

(খ) সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারার-যথা!

সংকেত : উপমেয় 'সিদ্রবিন্দু', উপমান 'তারার', সাধারণ ধর্ম 'শোভাসৃষ্টি', ('শোভিল'—ক্রিয়াগত), সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'যথা'।

(গ) তোমার চুলের মত কালো অন্ধকার।

(এখানে অন্ধকার উপমেয় আর চুল উপমান, ঘন এবং কালো—হচ্ছে সামান্য বা সাধারণ ধর্ম, আর 'মত' হচ্ছে সাদৃশ্যবাচক শব্দ।)

(ঘ) কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ।

(চাঁদ—উপমেয়, কাস্তে = উপমান, বাঁকা = সামান্যধর্ম, মত—সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

১১.৪.১.২ লুপ্তোপমা :

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের (উপমান-সাধারণ ধর্ম-সাদৃশ্যবাচক শব্দ) যে কোনো একটি বা দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে (অর্থাৎ, এদের উল্লেখ থাকে না), তার নাম লুপ্তোপমা (লুপ্ত + উপমা)।

উদাহরণ :

১. সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যে 'বন্যেরা' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তুলনা করা হচ্ছে), 'শিশুরা' উপমান (অন্য বস্তু যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), সাধারণ ধর্ম 'সৌন্দর্য' ('সুন্দর' হওয়ার গুণটি উপমেয়-উপমান দু-পক্ষেই আছে), কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে বন্যেরা এবং শিশুরা এই দুইটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে, কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে। এতএব, এটি উপমা অলংকার। অলংকারটিতে উপমেয় ছাড়া উপমান, সাধারণ ধর্মেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু একটি অঙ্গ সাদৃশ্যবাচক শব্দের উল্লেখ নেই বলে এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

ভদ্র মোরা শান্ত বড়ো
পোষমানা এ প্রাণ।
বোতাম আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।

এখানে উপমান ''পাখি'' এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মতো' অনুপস্থিত। পোষমানা পাখির মতো প্রাণ এই অর্থ ব্যঞ্জিত হচ্ছে।

২. সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে 'চোখ' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তুলনা করা হচ্ছে), 'পাখির নীড়' উপমান (অন্য বস্তু, যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), 'মতো' সাদৃশ্যবাচক শব্দ, কিন্তু সাধারণ ধর্ম (প্রশান্তি) লুপ্ত। উদ্ধৃত চরণটিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে 'চোখ' আর 'পাখির নীড়' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, অলংকার এখানে উপমা। অলংকারটিতে উপমেয় আছে, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের অন্যতম সাধারণ ধর্ম লুপ্ত বলে এটি 'লুপ্তোপমা'।

৩. সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

(ক) কচি কলাপাতা সন্ধ্যা।

ব্যাখ্যা : তিন শব্দের এই বাক্যে 'সন্ধ্যা' উপমেয়, 'কচি কলাপাতা' উপমান, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত। বাক্যটিতে 'সন্ধ্যা' আর কচি কলাপাতা এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি উপমা অলংকার। কিন্তু উপমেয়ের উল্লেখ থাকলেও অন্য তিনটি অঙ্গের একমাত্র উপমান ছাড়া আর দুটি অঙ্গই (সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম) লুপ্ত। সুতরাং, এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

(খ) টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে দিনের মুখের উপর।
(গ) চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।

৪. উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—
দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে।
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যের শেষ শব্দ 'হরিণ-চোখ'-এ সাদৃশ্যের সঞ্চার হয়েছে। হরিণ-চোখ আসলে হরিণের চোখ নয়, ওটা কালো মেয়েরই চোখ। সাদৃশ্যের টানেও হরিণ আসেনি, এসেছে হরিণের চোখ-ই। কেননা, কবির দৃষ্টিপাত কালো মেয়ের চোখের প্রতি নিবদ্ধ। অর্থাৎ, এখানে বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয় কালো মেয়ের চোখ' যা কবি দেখেছিলেন, আর। উপমান হরিণের 'চোখ' যা কবি কল্পনা করেছিলেন। হরিণ-চোখ'-এর অর্থ যদি 'হরিণের চোখ' হত, তাহলে ওই 'হরিণ-চোখ'-এ সমাসবদ্ধ হয়ে তা উপমান 'চোখ' আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মত' দুটিকেই হারিয়েছে, রক্ষা করেছে কেবল কালোমেয়ের 'চোখ', যা হরিণের চোখের মতোই কালো, অতএব উপমেয়। সুতরাং, বাক্যটিতে দুটি বিজাতীয় বস্তু 'কালো মেয়ের চোখ' ও 'হরিণের চোখ'-এর সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, তৈরি হয়েছে উপমা অলংকার। আর, উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত রয়েছে বলে এটি নিঃসন্দেহে লুপ্তোপমা। 'মেয়ে' আর 'হরিণ' বিজাতীয়, অতএব তাদের চোখও বিজাতীয়।

৫. উপমান সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—
নীরবিলা বীণাবাণী

ব্যাখ্যা : 'মেঘনাদবধকাব্য' থেকে উদ্ধৃত উদাহরণটিতে উপমেয় প্রমীলা—'বীণাবাণী'-বিশেষণের রূপে। কিন্তু, উপমান সাধারণ ধর্ম সাদৃশ্যবাচক শব্দে এখানে লুপ্ত। বীণার বাণীর মতো বাণী যার, সেই প্রমীলা উপমেয় হলেও 'বীণা' তার উপমান নয়, 'বাণীর সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে তা প্রমীলার বিশেষণ হয়ে আছে। তবে 'বাণী'র ধারক হিসেবে 'বীণা'র সঙ্গে প্রমীলা সাদৃশ্যসূত্রে বাঁধা পড়েছে। সুতরাং, বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো ফলে এখানে উপমা অলংকার হয়েছে এবং উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গই লুপ্ত থাকার কারণে এটি লুপ্তোপমা।

১১.৪.১.৩ মালোপমা :

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি, তার নাম মালোপমা (মালা + উপমা)।

এক উপমেয়ের যদি একাধিক উপমান হয়—তবেই তাকে মালোপমা বলে। অর্থাৎ উপমেয় একটা, তার অনেকগুলো উপমান। এখানে উপমা দিয়ে যেন মালা রচনা করা হয়। যদি বলা যায়—বজ্রের মতো কঠোর, কুসুমের মতো মৃদু হিমশিলার ন্যায় স্বচ্ছ ও গঙ্গাধারা ন্যায় বিদ্রুত তাঁর

চিত্ত' তাহলে মালোপমা অলংকার হবে। চিত্ত এখানে একটি মাত্র উপমেয়, এবং এর উপমান বজ্র, কুসুম, হিমশিলা আর গঙ্গাধারা। এই চারটে উপমান দিয়ে উপমার মালা রচনা করা হয়েছে তাই একে মালোপমা বলা হয়।

উদাহরণ :

(i) তোমার সে-চুল।

জড়ানো সূতার মত তা, নিশীথের মেঘের মতন।—বুদ্ধদেব বসু।

সংকেত : উপমেয় 'চুল', উপমান 'সূতা' আর 'মেঘ'।

(i) উড়ে হোক ক্ষয়,
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

সংকেত : উপমেয় 'সঞয়', উপমান 'ধূলি' আর 'তৃণ'।

(খ) সুখ অতি সহজ সরল, কাননের প্রস্ফুট ফুলের মততা, শিশু-আননের হাসির মতন।
(সুখের দুটি উপমান ফুল আর হাসি।)

(গ) সিংহ পৃষ্ঠে যথা
মহিষমর্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র রমণী
শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে।

[এখানে সতী (প্রমীলা) উপমেয় আর দুর্গা, শচী, রমা এই তিনটি উপমান।]

১১.৪.১.৪ স্মরণোপমা

কোনো বস্তুর স্মরণ বা অনুভব থেকে যদি সমধর্মের অন্য কোনো বস্তুকে মনে পড়ে যায় তবে স্মরণোপমা অলংকার হবে। একটি বস্তুর স্মরণে অনুরূপ আর কোনো বস্তু—যা সদৃশ্য কিম্বা বিসদৃশ যাই হোক না কেন, কিন্তু বিসদৃশ হলে সামান্য ধর্মের জোরে (অর্থাৎ একই গুণ বা ক্রিয়ার দৌলতে) সদৃশতা প্রাপ্ত হয়েছে—তা যদি স্মৃতিপথে উদিত হয় তবেই স্মরণোপমা হবে। স্মরণোপমা উপমার লক্ষণকে ত' উপেক্ষা করা যায় না।

যদি একটি বস্তুর স্মরণে অন্য বা বিসদৃশ বস্তুর কথা মনে পড়ে, এবং ঐ মনে পড়ার মধ্যে যদি চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয় তবে তা স্মরণ বা স্মরণালংকার, স্মরণোপমা নয়। স্মরণোপমার সাদৃশ্যের জোরে উপমান থেকে উপমেয়ের স্মরণ ঘটে।

(ক) ''কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।'' [চণ্ডীদাসের এই পংক্তিতে কালো জল ঢালতে গিয়ে শ্রীরাধিকার কালো বরণের শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হয়েছে। জল এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন বস্তু, কিন্তু 'কালো' এই গুণে (সামান্য ধর্মের জোরে) উভয়েই সদৃশতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং একের স্মরণ বা অনুভব অন্যকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, সুতরাং এটি স্মরণোপমা অলংকার।]

(খ) চাঁদ দেখে বার বার শুধু মনে হয়।
মার কোলে ছোট শিশু হাসিখুসিময়।

এখানেও স্মরণোপমা হয়েছে। চাঁদ এবং শিশু সামান্যধর্মের অনুল্লেখ সত্ত্বেও সদৃশতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

(গ) বরষায় আজি কদম্বতনু জড়ায়েছে শ্যামালতা;
সহসা পড়িল মনে মোর বঁধূ হারানো দিনের কথা :
এমনি করিয়া তোমার বক্ষে লুটায়ে রহিত যবে
এ তনুবল্লী কণ্ঠ তোমার বাঁধি বাহুপল্লবে।

১১.৪.১.৫ মহোপমা

মহোপমা ঠিক একটি অলংকার নয়। তাই অনেক আলংকারিক একে উপমার স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে স্বীকার করেননি। যে উপমায় উপমানের সৌন্দর্য এমনভাবে বাড়ানো হয়, যাতে প্রায় একটি নতুন চিত্রের সৃষ্টি হয়, তখন সেই অলংকারকে মহোপমা বলা হয়।

১১.৪.২ রূপক

সংজ্ঞা : বিষয়ের অপহ্নব না ঘটিয়ে (উপমেয়কে লুপ্ত না করে) তার ওপর বিষয়ীর (উপমানের) অভেদ আরোপ করলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম রূপক অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক।)

উপমান উপমেয়ের তুলনা করতে গিয়ে যখন তাদের অভেদ কল্পনা করা হয় তখন রূপক অলংকার হয়। এমনভাবে অভেদ কল্পিত হয় যাতে মনে হবে যে উপমেয় আর উপমানের যেন কোনো পার্থক্যই নেই। এই পার্থক্য না-থাকাটা কিন্তু কাল্পনিক। উপমেয়ের ওপর উপমানকে এমনভাবে আরোপ করতে হবে যাতে উভয় বস্তুর সর্বসাম্য ঘটে অর্থাৎ উপমেয় আর উপমান একীভূত হয়ে যায়। একের রূপ অন্যে আরোপিত হয় বলেই এই অলংকারের নাম রূপক হয়েছে।

রূপক অলংকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানে উপমানের প্রাধান্য ঘটবে। তাই আপাতদৃষ্টিতে রূপক অলংকার যতটা সহজবোধ্য বলে মনে হয়, আসলে এটি ততখানি সহজ নয়।

উপমান-উপমেয়ের পৃথক সত্তা বজায় থাকলে বুঝতে হবে উপমা অলংকার হয়েছে, আর ওরা যখন এক হয়ে যায়—তখনই হয় রূপক অলংকার।

আধুনিক বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে রূপক অলংকারের অজস্র ছড়াছড়ি। বাউল-মাঠ, পথিক-মন, ভালোবাসার পাখি, রোদ-শাড়ি, স্বপ্নের কুসুম কি প্রাণের সিড়ি, আকাশ-আঙিনা, ফর্সা সাদা মেয়ে-পদ্মচর, গানের ঝুমঝুমি বা এই জাতীয় আরো অনেক কিছু।

বৈশিষ্ট্য :

১। বাক্যে উপমেয় এবং উপমানের উল্লেখ থাকবে, সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকবে না।

২। উপমেয় এক হয়ে যাবে উপমানের সঙ্গে। এরই নাম অভেদ। সাদৃশ্যের প্রথম স্তর

উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো (উপমা), দ্বিতীয় স্তরভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো (ব্যতিরেকে), তৃতীয় স্তর অভেদ (রূপক)।

৩। বাক্যে উপমানই প্রধান, ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বাক্যাংশ উপমানকেই অনুসরণ করবে। উপমেয় লুপ্ত নয়, তবে গৌণ।

৪। জীবন অঙ্গী, শৈশব-যৌবন বার্ধক্য তার অঙ্গ; আকাশ অঙ্গী, মেঘ-তারা-নীলরং তার অঙ্গ; নদী। অঙ্গী—ধারা-ঢেউ-ফেনা-তীর তার অঙ্গ। অঙ্গী উপমেয়ের অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গী উপমানের অঙ্গের অভেদ হতে পারে।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

বাংলায় রূপকের উল্লেখযোগ্য বিভাগ তিনটি

(ক) নিরঙ্গরূপক; (খ) সাঙ্গরূপক; (গ) পরম্পরিত রূপক। এছাড়া আছে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরূপক, আখ্যানরূপক। তবে প্রথম তিনটি রূপকই প্রধান।

নিরঙ্গরূপক দু-রকমের—

(ক) কেবল নিরঙ্গরূপক; (খ) মালা নিরঙ্গরূপক।

১১.৪.২.১ নিরঙ্গরূপক

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে কোনো অঙ্গের অভেদ কল্পনা না করে কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম নিরঙ্গরূপক। নিরঙ্গ রূপকের আর এক নাম হচ্ছে সাধারণ রূপক। এই রূপকে একটি মাত্র উপমেয় আর একটি মাত্র উপমানের অভেদ বোঝায়। যে রূপকটির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে উপমান বা উপমেয়ের মধ্যে বিস্তৃত কোনো আলোচনা থাকে না, অর্থাৎ বৃপরে অন্তর্গত উপমেয়ের কোনো অঙ্গেরই ব্যাখ্যা থাকে না, বা উপমানের কোনো অঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা বলা হয় না কেবল বপকটিই উল্লিখিত হয়। যেমন

দোসর ওগো দোসর আমার, কোনসুদূরে।
ঘরছাড়া মোর ভাবনা-বাউল বেড়ায় ঘুরে।

এখানে উপমেয় 'ভাবনা' আর উপমান 'বাউল' এই দুই পদের কাছে না রা হয়েছে, ঘুরে বেড়ানো ক্রিয়ার জলেখে বোঝা গেল উপমান প্রধান্য লাভ করেছে, এবং উপমেয় এবং উপরে কোনো অঙ্গ সম্পর্কে কোনো বিস্তার হয়নি, সুতরাং এটি নিরঙ্গ রূপক।

নিরঙ্গরূপক দুরকমের, কেবল আর মালা। একটি উপমানের অভেদ আরোপ হলে কেবল নিরঙ্গরূপক, আর একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ হলে মালা নিরঙ্গরূপক।

উদাহরণ :

১১.৪.২.১.১ কেবল নিরঙ্গরূপক (একটি উপমেয়, একটি উপমান)—

(i) শিশুফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে।

সংকেত : উপমেয় 'শিশু', উপমান 'ফুলগুলি'। ক্রিয়াপদ 'ফুটে' 'ফুলগুলি'র অনুসারী। 'শিশু'রা ওপর কেবল 'ফুলগুলি'র অভেদ আরোপ।

(ii) যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি।

সংকেত : উপমেয় 'যৌবন', উপমান কেবল 'মৌবন'। 'মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি'—এই বাক্যাংশ উপমান 'মৌবন'-এর অনুসারী।

মন্তব্য : এখানে 'যৌবনের মৌবনে' অংশে 'বনে' ধ্বনিগুচ্ছে একথা শপে সার্থক উচ্চারণ (মৌ-'বনে') এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ (যৌ-'বনে'-রি) হচ্ছে বলে নিছক যাক অলংকংও হয়েছে। লক্ষণীয়, মৌবনে শব্দটি 'মৌ' এবং 'বনে'-এ দুটি স্বতন্ত্র শব্দের সমাসে তৈরি বলে 'বনে' শব্দে মদ পাবে।

এখানে আরো কয়েকটা ''কেবল নিরঙ্গ রূপকে''র উদাহরণ তুলে দিলাম—

(ক) জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই।

(খ) সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে পুখের রাশিয়া।

(গ) দুই তুরঙ্গ জীবন ও মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম দুয়েরি বল্গা নাই।

(ঘ) দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় তৃষায় হানে।

(ঙ) বর্ষা এয়েছে তার মেঘময় বেণী।

(চ) ঢেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার,
কে হয় জোয়ার হাতীর মাহুত?

(ছ) বিকট ঘর্ঘর রবে ছুটিয়াছে বুভুক্ষার রথ।

(জ) নির্ঝরিণী
সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।

১১.৩.২.১.২ মালা নিরঙ্গরূপক (মালারূপক একটি উপমেয়, একের বেশি উপমান)—

একটি উপমেয়কে কেন্দ্র করে বহু উপমানের যদি আরোপ হয় (এবং বলাবাহুল্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপমান-উপমেয়ের মধ্যে অভেদ বোঝাবে)—তবে তাকে মালা রূপক বলে। বিদ্যাপতির কবিতাংশ এই মালারূপকের অত্যন্ত বিখ্যাত উদাহরণ।

(ক) শীতের ওড়নী পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।।

(এখানে পিয়া (প্রিয়া)—এই একটি উপমাকে কেন্দ্র করে শীত বস্ত্র, গ্রীষ্ম বাতাস, বর্ষার ছাতা আর দরিয়ার নৌকা—এতগুলি উপমানের অভিন্নতা আরোপিত হয়েছে—তাই একে মালা রূপক বলা হয়েছে।)

(খ) অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—
চারদিকে চিরযামিনী।

সংকেত : উপমেয় 'তুমি একা', উপমান 'একটি স্বপ্ন', 'একটি পদ্ম', 'একটি চন্দ্র'। একটি উপমেয়ের ওপর তিনটি উপমানের অভেদ আরোপ।

(গ) আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁটা?

সংকেত : উপমেয় 'আমি', উপমান 'উপদ্রব', 'অভিশাপ', 'দুরদৃষ্ট', 'দুঃস্বপ্ন', 'কাঁটা'। একটি উপমেয়ের ওপর পাঁচটি উপমানের অভেদ আরোপ।

(ঘ) ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,
ওই আমাদের নিখাত সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।

১১.৪.২.২ সাঙ্গরূপক :

সংজ্ঞা : **যে রূপক অলংকারে বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম সাঙ্গরূপক। অর্থাৎ, উপমেয়-উপমান অঙ্গসমেত এক হয়ে গেলে সাঙ্গরূপক। উপমেয় আর উপমানে অভেদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের অঙ্গগুলিরও অনুরূপ অভেদ দেখানো হয়— তবেই সাঙ্গরূপক অলঙ্কার হয়। সোজা কথায়, উপমেয়ের অঙ্গগুলিও যদি উপমানের অঙ্গগুলির সঙ্গে অভেদ-কল্পনার দ্বারা একীভূত হয়ে যায়, তবেই সাঙ্গরূপক হয়।**

উদাহরণ :

(ক) শঙ্খধবল আকাশগাঙে
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে?

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকে একদিকে উপমেয় 'আকাশ' অঙ্গী, অন্যদিকে উপমান 'গাঙ' অঙ্গী। অঙ্গী 'আকাশ'-এর অঙ্গ 'মেঘ' 'জ্যোৎস্না' 'ধরা'—কেননা, মেঘ-জ্যোৎস্না আধার আকাশ, আকাশ থেকে যাত্রা শুরু, ধরায় যাত্রাসমাপন। অন্যদিকে অঙ্গী 'গাঙে'র অঙ্গ 'পাল' 'তরী' 'ঘাট'—পালসহ তরী গাঙেই ভাসে, ঘাট গাঙেরই সংলগ্ন হয়ে থাকে। উদ্ধৃত বাক্যে 'পালটি মেলে' বাক্যাংশ উপমান 'গাঙ'র সঙ্গে

এক হয়ে যাওয়া অর্থাৎ 'আকাশ'-এর ওপর 'গাঙ"-এর অভেদ অরোপে এখানে রূপক অলংকার হয়েছে। সেই সঙ্গে উপমেয় 'আকাশ'-এর অঙ্গ 'মেঘ', 'জ্যোৎস্না' আর 'ধরার ওপর উপমান 'গাঙ'-এর অঙ্গ যথাক্রমে 'পাল', 'তরী' আর 'ঘাট'-এর অভেদ-ও আরোপ করা হয়েছে (অর্থাৎ মেঘ-পাল, জ্যোৎস্না-তরী আর ধরা-ঘাট এক হয়ে গেছে।) অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়েছে বলে।

(খ) সৌন্দর্য-পাথারে
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী
সে বাতাসে, কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল;

অঙ্গী উপমেয় সৌন্দর্য, তার অঙ্গ 'বেদনা', 'মন', 'হৃদয়'। অঙ্গী উপমান 'পাথার' তার অঙ্গ 'বায়ু', 'তরী', 'পাল'।

(গ) শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রু বারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব!

শোক আর ঝড়—উপমেয় এবং উপমান। এরা উভয়েই অঙ্গী—কারণ এদের অঙ্গ এখানে উপস্থিত। শোকের অঙ্গ হলো বামাকুল (শোকের আধার বলে), মুক্তকেশ, ঘননিশ্বাস, অণু-বারিধারা, এবং হাহাকার রব। আর, ঝড়ের অঙ্গ হলো সুরসুন্দরী (বিদ্যুৎকে বোঝাচ্ছে), মেঘমালা, প্রলয় বায়ু, আসার বর্ষণ ও জীমূতমন্ত্র (মেঘগর্জন)। উপমেয় এবং উপমান—এই দুই অঙ্গীর রূপক হয়েছে—এদের একের অঙ্গের সুন্দরভাবে অন্যের অঙ্গের পর ক্রমানুসারে অভেদারোপ ঘটেছে, তাই এই জাতের রূপক হলো সাঙ্গরূপক।

(ঘ) সেই দয়া, সেই প্রীতি, স্নেহ-পারাবার—
কাননে দ্বিতীয় বর্ষা হইল সঞ্চার
চিকুর প্রপাত মেঘ; বিজলী সে হাসি;
সুশীলতল বারিধারা স্নেহসুধা রাশি।

উপমেয় হিসেবে (ঋষিরমণীদের) স্নেহপ্রীতি হলো অঙ্গী আর উপমান হিসেবে বর্ষা হলো অঙ্গী। উপমেয়ের অঙ্গ চিকুর, হাসি, স্নেহসুধা, আর উপমানের অঙ্গ মেঘ, বিজলী এবং বারিধারা যথাক্রমে অভিন্নতা-প্রাপ্ত হয়েছে।

(ঙ) ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে।

আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে নাও।
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।।

অঙ্গী হৃদয় এখানে উপমেয়; এর অঙ্গ হলো কাম প্রভৃতি এবং বিবেক। এদের ওপর অঙ্গী রত্নাকর (উপমান) এবং তার অঙ্গ কুম্ভীর ও হল্‌দির যথাক্রমে অভেদারোপ হয়েছে।

১১.৪.২.৩ পরম্পরিত রূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে একটি অলংকারে একটি উপমেয়ের ওপর একটি উপমানের অভেদ-আরোপের কারণে অন্য একটি উপমেয়ের ওপর অন্য একটি উপমানের অভেদ-আরোপের জন্ম হয়, তার নাম পরম্পরিত রূপক।

একটি নিরঙ্গরূপক থেকে আর একটি নিরঙ্গরূপকের জন্ম এইভাবে রূপকের পরম্পরা বা ধারা তৈরি হতে থাকে বলে এর নাম পরম্পরিত রূপক।

একটা রূপকের সৃষ্টি করে তাকে আরো সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তোলার জন্যে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন আর একটা রূপকের অবতারণা করা যায় তাহলে পরম্পরিত রূপক হয়। অর্থাৎ একটি রূপকের উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য একের বেশি রূপক সৃষ্টি করলেই পরম্পরিত রূপক হয়!

এই অলংকারে প্রথম রূপকটি দ্বিতীয় রূপকটির কারণ হয়ে থাকে। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয় রূপকটি কার্যকারণ ভাবের পরম্পরা অর্থাৎ ধরা থাকে—তাই এ জাতীয় রূপকের নাম পরম্পরিত রূপক। একটি উদাহরণ ধরা যাক :

চঞ্চল চরণ— কমল-তলে ঝঙ্করু।
কভত-ভ্রমরগণ ভোর।

এখানে মহাপ্রভুর চরণকে কমলের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করায় দ্বিতীয় রূপকটির জন্ম। দ্বিতীয় রূপকটির কারণ কিন্তু এই প্রথম রূপকটি। চরণে কমলত্ব আরোপের জন্যই ভক্তগণ যাঁরা মহাপ্রভুর পায়ের কাছে রয়েছেন, ভ্রমররূপে কল্পিত হয়েছেন। চরণ কমল হয়েছে বলেই ভক্তকে ভ্রমর হতে হয়েছে। পরম্পরিত রূপকে প্রথম রূপকটিকে সৌন্দর্য ও সৌকর্য দানের জন্যে, অর্থাৎ বেশি করে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই দ্বিতীয় রূপকটির ব্যবহার হয়।

উদাহরণ :

(ক) মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধারপর্ণপুটে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় 'আলো'র ওপর প্রথম উপমান 'কমলকলিকা'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'আঁধারে'র ওপর দ্বিতীয় উপমান 'পর্ণপুট'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। সেই কারণে এখানে পরম্পরিত রূপক অলংকার হয়েছে। 'আলো-আঁধার' আর 'কমলকলিকা-পর্ণপুট'-এ অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক থাকলেও কার্যকারণ-পরম্পরার ভাব প্রবল হওয়ায় এখানে সাঙ্গরূপক না হয়ে পরম্পরিত রূপকই হয়েছে।

(খ) তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছো ভবিষ্যৎ আর
অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথমে উপমেয় 'দীর্ঘশ্বাস'র ওপর প্রথম উপমান 'ধোঁয়ার'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'অনুশোচনার' ওপর দ্বিতীয় উপমান 'আগুন'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। আবার দ্বিতীয় অভেদ-আরোপ থেকে তৃতীয় উপমেয় 'উৎসাহ'-এর ওপর তৃতীয় 'কয়লা'র অভেদ-আরোপের জন্ম—এইভাবে রূপকের কার্যকারণ-পরম্পরা তৈরি হচ্ছে বলে এটি পরম্পরিত রূপক।

পরম্পরিত রূপকের আরো কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) কাছে তুমি কর্মতট আত্মাতটিনীর,
দূরে তুমি শান্ত সিন্ধু অনন্ত গভীর।

(২) প্রতাপ-তপনে কীর্তি-পদ্ম বিকশিয়া,
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচল করিয়া।

(৩) কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।

(৪) সুবাসিত চুল, তাই হবে মোর গহন রাতি,
কপালের টিপে পাবো প্রিয়তম তারকাটিও।
(চুল রাত বলেই টিপকে তারা বলতে হয়েছে।)

(৫) সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র বিস্মৃতি কীট কাটে।

(৬) হৃদয়-বৃন্দাবনে কানু ঘুমায়ল।
প্রেম-প্রহরী রহুঁ জাগি।

১১.৪.২.৪ অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক

উপমানে যদি কোনো বিশেষ কিম্বা অসম্ভব গুণ বা ধর্ম আরোপ করা হয়, এবং ঐ বিশেষ গুণ বা ধর্ময়ক উপমানকে যদি উপমেয়ের ওপর অভিন্নভাবে স্থাপিত করে রূপক সৃষ্টি করা হয় তখন সেই রূপককেই অধিকরূঢ়বৈশিষ্ট্য রুপক বলে। উপমানে একটি বৈশিষ্ট্য অধিক আরূঢ় হয় বলেই এই অলংকারকে 'অধিকারুঢ়বৈশিষ্ট'রপক বলে অভিহিত করা হয়েছে। অনেক আলংকারিক এই জাতীয় রূপককে শুধু বিশিষ্ট রূপক বলে অভিহিত করেছেন। বিশিষ্ট নামটি বলা বাহুল্য যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনই শোভন ও সুন্দর। একটি উদাহরণ ধরা যাক—

হায়েনার হাসি যখন কাঁপাচ্ছে বন,
কালো এই দুর্যোগের রাতে
দিকে দিকে মানুষের ব্যাকুল নিঃশ্বাস;
তুমি শুধু স্থির, শান্ত, অচপল চোখ,
সুধীর নিশ্চল তব তনুর সমুদ্র।

এখানে 'তনুর সমুদ্র' কাব্যাংশে রূপক রয়েছে, তনুতে সমুদ্রত্ব আরোপিত হয়েছে। তনু উপমেয়, সমদ্র উপমান। সমুদ্র দুর্যোগের রাতে নিশ্চল থাকে না, সুধীর অবস্থা সমুদ্রের কোনো সময়ই থাকে না। এখানে এই রূপক অলংকারে (তনুর সমুদ্র—এই রূপকে) উপমান 'সমুদ্রে' ধীরতা ও নিশ্চলতা—এই অসম্ভব গুণ আরোপ করা হয়েছে, এবং এই অসম্ভব গুণযুক্ত করেই উপমানকে উপমেয়ের ওপর আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং এটি বিশিষ্ট অথবা অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপকের সুন্দর উদাহরণ।

নীচে আরো কয়েকটি উদাহরণ দিলাম—

(ক) অপরূপ পেখলু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।

(হরিণ—কলঙ্ক, হিমধামা—চাঁদ।)

(খ) সারা দেহব্যাপী তড়িতের খেলা একি দেখি অচপল।

(যৌবনদীপ্তিকে 'অচপল তড়িৎ' কল্পনার জন্যে অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক হয়েছে।)

(গ) ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ।।

(ঘ) নাহি কালদেশ তুমি অনিমেষ মূরতি
তুমি অচপল দামিনী।

(ঙ) অশনি আলোকে হেরি তারে থির-বিজলী-উজর অভিরাম।

(চ) পথে পথে ওই গিরি নুয়ে যায়, কটাক্ষে রবি অস্তমান্,
খড়্গ তাহার থির-বিদ্যুৎ ধুলিধ্বজা তার মেঘ সমান।

(ছ) বয়ন শরদসুধানিধি নিষ্কলঙ্ক।

(জ) অন্য কাননে যাস্‌নে রে চোর, নিজেকে আয় করবি চুরি,
যাকে চেয়েছিস গোপনে সে তোর বুকের আকাশে থির বিজুরী।

(ঝ) অধর পরে অধর পরশ জ্বালায় শিরা মজ্জা,
অথির বুকের স্থির সাগরে হায়রে শেষের শয্যা!

১১.৪.২ উৎপ্রেক্ষা

সংজ্ঞা : গভীর সাদৃশ্যের কারণে প্রকৃতকে (উপমেয়কে) যদি পরাত্মা (উপমান) বলে উৎকট (প্রবল) সংশয় হয় এবং যদি সে সংশয় কবিত্বময় হয়ে ওঠে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উৎপ্রেক্ষা অলংকার। উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা।

উৎপ্রেক্ষার অর্থ হলো সংশয়। অবশ্য প্রত্যয়গত অর্থ হচ্ছে উপমা সম্পর্কে উৎকট ধারণা। উপমেয়কে যদি প্রবলসাদৃশ্যের জন্যে উপমান বলে সংশয় হয়—তখন উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়।

অন্যভাবে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে যেখানে উপমান বস্তুতে উপমেয়ের সম্ভাবনা আরোপিত হয় সেখানেই উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়।

উৎপ্রেক্ষা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই অলংকারে সংশয়ের ভাব থাকবেই এবং সেই সংশয়ে উপমানই বেশী প্রবল হয়ে উঠবে। বাংলা ভাষার উপমার পরই কিন্তু উৎপ্রেক্ষার আধিপত্য।

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়-উপমানের সাধারণ সাদৃশ্য থেকে উপমা, অভেদ থেকে রূপক, আর প্রবল সংশয় থেকে উৎপ্রেক্ষা। গভীর সাদৃশ্য এ সংশয়ের কারণ।

২। সংশয় একদিকে—উপমেয়কে উপমান বলে সংশয়।

৩। এ সংশয় কবিত্বময়, সাধারণ সংশয় থেকে অলংকার হয় না।

৪। কবিত্বের গুণে প্রত্যক্ষ উপমেয়ের তুলনায় কাল্পনিক উপমানকেই বেশি সত্য বলে মনে হয়।

প্রকারভেদ

উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু-রকমের—

(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা

(বাচ্য + উৎপ্রেক্ষা) (প্রতীয়মান + উৎপ্রেক্ষা)

বাচ্য এবং প্রতীয়মান

এই দু'রকমের উৎপ্রেক্ষা ছাড়া মালোৎপ্রেক্ষা (মালা + উৎপ্রেক্ষা) বলে আর এক রকমের উৎপ্রেক্ষার উল্লেখ করেছেন কয়েকজন আলংকারিক। কিন্তু উৎপ্রেক্ষা অলংকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট বুঝলেই মালোৎপ্রেক্ষা বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না।

সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

১১.৪.৩.১ বাচ্যোৎপেক্ষা :

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে 'যেন', 'বুঝি', 'জনু', 'প্রায়', 'মনে হয়', 'মনে গণি' জাতীয় কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে, তার নাম বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

উপমেয়কে প্রবল সাদৃশ্যের জন্যে উপমান বলে সংশয় হবে—আর সেই সংশয় সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখে—(বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেন' শব্দের জ্বলন্ত উপস্থিতিতে) স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখনই বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার হবে।

উদাহরণ :

(ক) বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী' (অশোকবনে সীতার পদতলে বসা সরমা), উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' (প্রদীপ)। সীতার পদতলে বসা যুবতী সরমাকে দেখে মনে

হচ্ছে, তুলসীতলায় জ্বলে উঠল সন্ধ্যার প্রদীপটি। দুটি দৃশ্যেই আছে একটি পবিত্র সৌন্দর্য। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী'কে উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। অতএব, এটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার। সংশয়বাচক 'যেন' শব্দের সংযোগে, সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বলে এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(খ) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কলঙ্কিত গোলাকৃতির সাদৃশ্যে উপমেয় 'পূর্ণিমা-চাঁদ'-কে ক্ষুধাতুর মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপমান 'ঝলসানো রুটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অতএব, এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

আরও উদাহরণ—

(গ) সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।

(স্রোত—এই উপমেয়ের সঙ্গে উপমান তলোয়ারের এমনই তীব্র সাদৃশ্য দেখা দিচ্ছে যে উপমেয়কে উপমান বলেই সংশয় হচ্ছে। কিম্বা, উপমান বস্তুতে (তলোয়ারে) উপমেয়ের (স্রোতের) সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। স্রোতকে উপমান তলোয়ার বলেই সংশয় হচ্ছে এখানে ''যেন'' এই সম্ভাবনাবাচক শব্দও রয়েছে— তাই এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা)।

(খ) সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে।

(গ) অর্ধমগ্ন বালুচর।
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহইছে শুয়ে।

(ঘ) মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন।

(ঙ) পূর্ব দিকে আরক্তিম অরুণ প্রকাশে
পশ্চিমে দ্বিজেশ যান রোহিণীর পাশে,
সারা নিশি গেল তাঁর নক্ষত্র সভায়,
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ সরমের দায়।

(এখানে 'বুঝি' এই সম্ভাবনাবাচক শব্দ থাকায় এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়েছে।)

(চ) কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন রোগ শয্যা ছেড়ে
ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।

(ছ) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গ।
তার পাছে ব্যাধ যেন উড়িছে পতঙ্গ।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে প্রথম চরণে উপমেয় 'ভগবতী'তে উপমান 'দীঘল তরঙ্গ' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় জেগেছে। ভগবতীর চলনভঙ্গীতে 'তরঙ্গে'র নাচন কবি লক্ষ্য করেছেন। এই গভীর সাদৃশ্য থেকেই কবির মনে সংশয়, এবং প্রকাশের ভঙ্গিতে তা কবিত্বময়। অতএব, অলংকার এখানে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়সূচক শব্দের উল্লেখ না থাকলেও অর্থ থেকে সংশয়ের ভাব অনুমিত হওয়ায় এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

দ্বিতীয় চরণেও উপমেয় 'ব্যাধ'-কে উপমান 'পতঙ্গ' বলে কবির মনে প্রবল সংশয়। এর মূলেও রয়েছে 'ব্যাধ' আর 'পতঙ্গে'র চলনভঙ্গির সাদৃশ্য। অতএব, এখানেও উৎপ্রেক্ষা, তবে সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

১১.৪.৩.২ প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা :

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমান করে নেওয়া যায়, তার নাম প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা সম্ভাবনাসূচক শব্দ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সম্ভাবনার ভাবটি স্পষ্ট বোঝা যায়। অন্যভাবে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে যেখানে উৎপ্রেক্ষা বাচক বা সম্ভাবনাসূচক শব্দগুলি থাকে না, অথচ সম্ভাবনার ভাবটি স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে সেইখানেই প্রতীয়মাননাৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। যেমন—

উদাহরণ :

(ক) এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'ব্রহ্মাণ্ড', উপমান 'মাকাল ফল। বাইরের রূপ লোভনীয় অথচ ভেতরের সারশূন্য 'ব্রহ্মাণ্ড' এবং 'মাকাল ফল' দুই-ই। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণ 'ব্রহ্মাণ্ড'-কে একটি ঝুলন্ত প্রকাণ্ড 'মাকাল ফল' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়ের কবিত্বময় প্রকাশে এখানে অলংকার হয়েছে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়মূলক শব্দের কোনো উল্লেখ নেই বলে উদাহরণটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

(খ) কুহেলী গেল আকাশে আলো
দিল যে পরকাশি,
ধূর্জটীর মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

(এখানে শেষ পঙ্‌ক্তির আগে একটি 'যেন' না হলে অর্থ হচ্ছে না। কুয়াশার পর আকাশের আলোর স্নিগ্ধতাকে পার্বতীর হাসি বলে সংশয় হচ্ছে। এই সম্ভাবনার ভাবটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, অথচ 'যেন' বা ঐ জাতীয় কোনো শব্দের প্রয়োগ নেই, তাই এটি প্রতীয়মাননাৎপ্রেক্ষা।)

(গ) সুবর্ণে আসনে গিয়া বসে রূপবতী।
চারিদিকে জ্বালি দেয় সোহাগের বাতি।।

(ঘ) জামরুল গাছে ধরে অজস্র ফুল,
হরণ করেছে সুরবালিকার হাজার কানের দুল।

(ঙ) হাতে মসী মুখে মসী মেঘে ঢাকা শিশু শশী।

(চ) বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়,
তুফান মাঝে ক্ষীণ তরী।

(ছ) সুন্দর মুখে নিলীন হাসিটি তব
বিকচ পদ্মে লাবণ্য অভিনব।

১১.৪.৩.৩ মালোৎপ্রেক্ষা

একই উপমেয়কে কেন্দ্র করে যদি একাধিক উপমানের দ্বারা একাধিক উৎপ্রেক্ষার মালা সাজানো হয়—তবে তাকে মালোৎপ্রেক্ষা অলংকার বলে।

নীচে দু-একটি উদাহরণ দিলাম—

(ক) যত তাপস বালক
শিশির সুস্নিগ্ধ যেন অরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা।

(খ) নিরখি তোমারে ভীষণ-মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতি দূর
উজ্জ্বল যেন দেব রোষানল, উদ্যত যেন বাজ।

(গ) যেন অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।

১১.৪.৪ অপহ্নুতি

উপমেয়কে নিষিদ্ধ করে বা গোপন রেখে উপমানকে স্থাপন বা প্রকাশ করাকে অপহ্নুতি অলংকার বলে। অপহ্নুতি কথাটির অর্থ হলো গোপন বা অস্বীকার। উপমেয় অর্থাৎ প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের অস্বীকার করে অপ্রকৃতকে অর্থাৎ উপমানকে স্বীকার করে নেওয়া বা প্রকাশ করা হয় বলেই এই অলংকারের নাম অপহ্নুতি। এই অলংকারে প্রায়ই না, নয়, ছলে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থাকে। না, নয় প্রভৃতির দ্বারা অপহ্নুতি অলংকার সূচিত হলে উপমেয় এবং উপমান পৃথক বাক্যে বসে; আর, ছলে বা ছলনায় শব্দের প্রয়োগে অপহ্নুতি অলংকার সূচিত হলে উপমান প্রায়ই এক বাক্যে বসে থাকে। যেমন—

বৃষ্টিচ্ছলে গগন কাঁদিলা।

এখানে বৃষ্টি উপমেয় অর্থাৎ আসল বর্ণনীয় বিষয়, কিন্তু বৃষ্টিকে অস্বীকার করে গগনের কান্নাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হলো। এই কান্না এখানে উপমান। উপমেয়কে অস্বীকারপূর্বক উপমানকে প্রকাশ করা হলো। তাই এটিকে অপহ্নুতি অলংকার। একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে 'ছলে' শব্দটি থাকায়—উপমেয় ও উপমান একই বাক্যে ন্যস্ত হয়েছে। আরো কয়েকটি উদাহরণ—

(ক) শিশির বিন্দুর চলে উষা দেবী কুতূহলে
ফুল্ল নলিনীর ভালে
পরাইছে সাবধানে মুকুতার মালা।

এখানে শিশিরকে মুক্তার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে—তাই শিশির উপমেয়, আর মুক্তা উপমান। শিশির জমেছে পদ্মের ওপর, কিন্তু কবি বলেছেন—ও যে মুক্তার মালা। উপমেয় গুপ্ত বা নিষিদ্ধ (অর্থাৎ অস্বীকৃত) থাকছে। উপমানই সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত বা প্রকাশিত, তাই এটি অপহ্নুতি অলংকার। এখানেও 'ছলে' শব্দের দ্বারা অপহ্নব (নিষেধ বা অস্বীকার)।

সূচিত হয়েছে বলে একই বাক্যে উপমেয় এবং উপমান অবস্থিত।

(খ) এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।

(গ) ও যেন বৃষ্টি নয়;
কোনো বিরহিণী দিগ্বধূর অশ্রান্ত ক্রন্দন।

(ঘ) তারাই আজ নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হয়ে অন্নহারা।
দেশের যত নদীর ধারা, জল না ওরা অশ্রুধারা।

(ঙ) কপালে সিন্দুর বিন্দু নব অরবিন্দ বন্ধ,
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তলা ছলা
বন্দী সে করিলা রবি-ইন্দু।।

(এখানে 'কুন্তল' হচ্ছে উপমেয়, আর উপমান হলো তিমির। 'ছলা' শব্দের উপস্থিতিতে বোঝা যাচ্ছে যে উপমেয় অস্বীকৃত হয়েছে এবং উপমানেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে।)

(চ) পুষ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝঙ্কৃত স্বপন।

(ছ) ও ত আলো নয় ও যে অমরার দীপ্ত আশীর্বাদ,
ঝরিতেছে নিরবধি।

(জ) নয় নয় ও তো আষাঢ় গগনে জলদের গরজন,
দুনিয়ার যত চাপা ক্রন্দন গুমরি উঠিয়ে শোন।

(ঝ) মেঘ ওতো নয়, মুক্তকেশীর
এলিয়ে পড়া চুলের রাশি!

বিদ্যুৎ কোথা? চেয়ে দেখ, ও যে
পাগলী মেয়ের অট্টহাসি।

(ঞ) ঝরণার ধারা নয় ওতো নয়,
চেয়ে দেখ ভাল করে,
কার মণিহার ছিঁড়ে গেছে তাই
মণি রাশি পড়ে ঝরে।

১১.৪.৫ সমাসোক্তি

সংজ্ঞা : বর্ণনীয় বিষয়ের (উপমেয়) ওপর অন্যবস্তুর (উপমান) ব্যবহার আরোপ করা হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সমাসোক্তি অলংকার। উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হলে সমাসোক্তি।

প্রস্তুতে অর্থাৎ বর্ণনীয় অপ্রস্তুতের অর্থাৎ অন্য বিষয়ের ব্যবহার আরোপকে সমাসোক্তি বলে। বর্ণনীয় নির্জীব পদার্থে সজীব পদার্থের ব্যবহার যখন সমান কাজ, সমান লিঙ্গ বা সমান বিশেষণের দ্বারা আরোপ করা হয়—তখন সমাসোক্তি অলংকার হয়। সোজা উপমানের গণ বা কর্মের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্জীব বস্তুতে চেতনা আরোপের সহজ অর্থ হলো জড়ে মনুষ্যধর্মের আরোপ। এই আলোপ কিন্তু সংক্ষেপে সারতে হয়; সংক্ষেপকেই সমাস বলে, এবং উপমেয়ে উপমানবস্তুর সমারোপ সংক্ষেপে উক্ত হয় বলেই এই অলংকারের নাম সমাসোক্তি।

বৈশিষ্ট্য : ১। উপমানের কোনো উল্লেখ থাকে না, তবে তার ব্যবহার বা আচরণের উল্লেখ থাকে।

২। উপমেয় একা এবং আরোপিত আচরণ পুরোপুরি উপমানের।

৩। উপমেয়ের ওপর আরোপিত বা ব্যবহার থেকেই উপমানকে চেনা যায়।

৪। ব্যবহার বা আচরণ সাধারণভাবে গুণগত বা ক্রিয়াগত।

৫। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপমেয় অচেতন বস্তু, তার ব্যবহার চেতনের।

উদাহরণ :

(i) শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই,
‘আয়’ ‘আয়’ কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।

সংকেত : যে কান্না মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অচেতন ‘সানাই’-এর ওপর তা আরোপিত। চেতন মানুষই এখানে উপমেয়, কিন্তু তার উল্লেখ নেই, আছে তার ব্যবহারের (কান্নার) উল্লেখ। এই ব্যবহারের আরোপ হল ‘সানাই’-এর ওপর। অতএব, ‘সানাই’ এখানে অনুক্ত ‘মানুষ’-এর উপমান। অলংকার সমাসোক্তি।

(ii) শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছে এলোচুলে

দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া;

ব্যাখ্যা : 'বসুন্ধরা' উদ্ধৃত স্তবকের উপমেয় বা বর্ণনীয় বিষয়, উপমানের উল্লেখ নেই। আমাদের পরিচিত 'বসুন্ধরা' (মাটির পৃথিবী) অচেতন। কিন্তু এখানকার বর্ণিত 'বসুন্ধরা' মেঠোসুরে বাঁশির কান্না শুনে 'উদাসী', 'হিরণ্য অঞ্চল বক্ষে' টেনে এলোচুলে বসে আছেন। বলা বাহুল্য, এ স্বভাব 'বসুন্ধরা'র নয়। ওই নারীই 'বসুন্ধরা'-র উপমান। উপমান 'নারী'কে চেনা যায় উপমেয় 'বসুন্ধরা'র ওপর আরোপিত আচরণের বর্ণনা থেকেই। অতএব, উপমেয়ের উপর উপমানের ব্যবহার আরোপের সৌন্দর্যই উদ্ধৃত স্তবকের অলংকার, সে অলংকারের নাম সমাসোক্তি।

(iii) নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।

এখানে 'সন্ধ্যা' উপমেয়—নারীর সঙ্গে উপমিত হয়েছে, উপমান 'নারীর' সমান কার্য, লিঙ্গ এবং বিশেষণ উপমেয় সন্ধ্যায় আরোপিত হয়েছে। উপমান হাজির নেই, কিন্তু তার কাজের ওপরেই উপমেয়ের প্রতিষ্ঠা। তাই এটি সমাসোক্তি। আরো কয়েকটি শিষ্ট উদাহরণ দিচ্ছি—

ক. হেথা সুখ গেলে—
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্য গৃহে।

খ. পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো।

গ. কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
'ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে'।

ঘ. ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে।

ঙ. হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান

চ. আসন্ন শীতের বেলা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে।

ছ. দূর দিগন্তে শঙ্কিত গ্রাম
ঘুমায় তিমির মুড়ি।

জ. আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্বত।

১১.৪.৬ অতিশয়োক্তি

সংজ্ঞা : বিষয়ীর (উপমানের) সিদ্ধ অধ্যবসায় হলে, অর্থাৎ উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললে এবং সেই কারণে উপমেয়ের কোনো উল্লেখ না থাকলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়,

তারই নাম সাধারণ অতিশয়োক্তি। উপমেয় লুপ্ত এবং উপমান প্রবল হলে অতিশয়োক্তি।

উপমেয়ের উল্লেখ না করে উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করার নামই হলো অতিশয়োক্তি। এই অলংকারে উপমেয় গ্রস্ত হয় আর উপমানের প্রাধান্য ঘটে। যদি বলা যায় যে 'মুখ থেকে অমৃত ঝরছে, তখন মধুর কথার সঙ্গে অমৃতের অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উপমেয় ''কথার'' উল্লেখ না করেই উপমান 'অমৃত' এসে হাজির হলো, সুতরাং এটি অতিশয়োক্তি অলংকার। এখানে উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করে উপমানকেই যেন উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হলো, তাই এটি অতিশয়োক্তি অলংকার।

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়ের উল্লেখ থাকে না, অর্থাৎ উপমেয়ের লুপ্ত।

২। বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থেকে উপমেয়কে চেনা যায়।

৩। উপমান একা, সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

৪। উপমেয়-উপমানের সাদৃশ্য এখানে চূড়ান্ত, অভেদ সম্পূর্ণ।

৫। 'উপমা'য় উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো, 'ব্যতিরেকে' ওই ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো, 'রূপকে' অসম্পূর্ণ অভেদ, 'অপহ্নুতি'-তে অভেদ মেনে নিয়ে উপমেয়ের অস্বীকৃতি, 'অতিশয়োক্তিতে সাদৃশ্যের চূড়ান্ত পরিণাম—অভেদ সম্পূর্ণ।

উদাহরণ :

(ক) মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা!

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলের দিকে পা-বাড়ানো মেঘনাদের বিদায়-মুহূর্তের একটি করুণ দৃশ্য উদ্ধৃত উদাহরণটি। বেদনার্ত প্রমীলার ক্রন্দন-দৃশ্য। নয়ন থেকে অশ্রুধারাই তো বর্ষিত হল। কিন্তু অশ্রু এখানে অনুক্ত। প্রমীলার নয়ন বা বর্ষণ করল, কবের চোখে তা 'মুকুতা'। তারই উল্লেখ এখানে আছে। অর্থাৎ, প্রকৃত বা উপমেয় 'অশু'-র উল্লেখ নেই, আছে কেবল অপ্রকৃত বা উপমান 'মুকুতা'র (মুক্তা) উল্লেখ। অতএব, অলংকার এখানে অতিশয়োক্তি (বিশেষ নাম 'রূপকাতিশয়োক্তি)।

(খ) হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে?

ব্যাখ্যা : বিধ্বংসী লঙ্কাযুদ্ধের জন্য রাবণ দায়ী করলেন সূর্পণখাকে। পঞ্চবটীবনে 'কালকূটে ভরা ভুজগ'টিকে দেখারই পরিণাম এ যুদ্ধ। কিন্তু, বিধ্বস্ত রাবণের দৃষ্টিতে যা 'ভুজগ' (সাপ), প্রকৃত অর্থে তিনি এখানে রামচন্দ্র। সূর্পণখা রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে দেখেই কামাসক্ত হয়ে রক্তারক্তি-কাণ্ডের সূচনা করেছিল, কোনো সাপ দেখে নয়। অতএব, 'ভুজগ' এখানে উপমা-মাত্র, তার উপমেয় রামচন্দ্র।

বক্তার (রাবণের) মূল্যায়নে এবং কবির প্রকাশভঙ্গিতে উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং তাদের অভেদ এখানে পরিপূর্ণ। ফলে, বাক্যে উপমেয় রামচন্দ্র' পুরোপুরি লুপ্ত, উপমান 'ভুজঙ্গ' সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, উপমান সম্পূর্ণভাবে উপমেয়কে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং, এখানকার অলংকার অতিশয়োক্তি।

(গ) বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি,
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে।

(গৈরিক (বস্ত্র) এখানে উপমান, লাল ধূলির আবরণ—উপমেয় উপমেয়কে গ্রাস করেই উপমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং অতিশয়োক্তি।)

(ঘ) দূরপ্রসারী লবণ-বারি,
ভাসছে সাগর-মরাল-সারি;
গাহন করে পাষাণ-করী,
শীকর-ঝারি ঝরে।

লবণাক্ত সমুদ্রজলে সাদা পাল তোলা ছোট্ট নৌকাগুলিকে গ্রাস করে উপমান 'মরাল' প্রধান হয়েছে। ভেদেই অভেদ ঘটেছে। উপমেয় জলের ডোবা ছোট্ট শিলাপাহাড়গুলিকে উল্লেখ না করে উপমান 'হস্তী'কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখানে অবশ্য পাষাণ শব্দটি থাকায় ডুবো পাহাড়কে অনেক হয়তো রূপক বলবেন। কিন্তু পাষাণকে যদি বিশেষণ হিসেবে ধরা যায়, তবে এখানে এটি একটি অতিশয়োক্তি বলতে বাধা নেই।

(ঙ) উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা নিকর।

(এখানে মুকুতা উপমান, জলকণারাশি উপমেয়—টার উল্লেখ নেই কারণ উপমানের দ্বারা সে গ্রস্ত হয়েছে।

(চ) সর্বগ্রাসী আগুন নিবাতে
হৃদয়ে শ্রাবণ আনি নিদ্রাহীন রাতে।

(এখানে আগুন প্রেমকে গ্রাস করে বসেছে। আগুনের মতো প্রেম—এই অর্থেই আগুন।)

১১.৪.৭ ব্যতিরেক

সংজ্ঞা : উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে যে অর্থ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যতিরেক অলংকার। উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে ব্যতিরেক। অনেক সময় এই উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কারণের উল্লেখ থাকে, আবার অনেক সময় তা থাকেও না।

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমান অপেক্ষা উপমেয় উৎকৃষ্ট হয়ে পারে। তখন অলংকার হবে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

২। উপমান অপেক্ষা উপমেয় নিকৃষ্ট হতে পারে। তখন অলংকার হবে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

৩। অধিক-চেয়ে-অপেক্ষা, নিন্দি-নিন্দিত-নিন্দু, জিনি-জিতল, গঞ্জি-গঞ্জন, লাজ-লজ্জা, ছার ইত্যাদি তারতম্যবোধক শব্দের প্রয়োগে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়।

৪। সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে থাকে।

৫। কখনো কখনো বর্ণনায় অন্তর্নিহিত থাকে উৎকর্ষ-অপকর্ষ, ভাব বা অর্থ থেকে বুঝে নিতে হয়।

৬। ব্যতিরেক অলংকারে উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো হয়। এটি সাদৃশ্যের দ্বিতীয় স্তর। (প্রথম স্তর উপমায়, যেখানে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়।)

রূপে গুণে রস সিন্ধুমুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।

শ্রীকৃষ্ণের মুখশ্রী চন্দ্রের লালিত্যকে ম্লান করেছে, জয় করেছে। মুখটা-উপমেয় ইন্দু উপমান। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণিত হয়েছে, তাই এটি ব্যতিরেক অলংকার।

ব্যতিরেক অলংকার দু'রকমের। যখন উপমানকে নিন্দিত করে উপমেয়ের উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়—তখন তাকে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক বলা হয়; এবং এই জাতীয় ব্যতিরেক অলংকারই হচ্ছে প্রধান, সাহিত্যে এরই প্রচলন বেশী।

আর যখন উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অপকর্ষ বর্ণিত হয়—তখন তাকে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক বলে; এই জাতীয় ব্যতিরেকের প্রয়োগ বড় একটা দেখা যায় না; কারণ উপমেয়ের অপকর্ষ বর্ণনা করে সাহিত্যীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টির রেওয়াজ কম। তবে একেবারে যে নেই—তা নয়। নীচে এই দু'রকম ব্যতিরেকেই উদাহরণ দিয়েছি। তার আগে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই।

উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকারে প্রায়ই আমরা জিনি, গঞ্জি, লাঞ্ছন, ছার, নিন্দি বা নিন্দিত প্রভৃতি শব্দ দেখতে পাই। অনেক সময় অবশ্য ব্যতিরেক-জ্ঞাপক এই শব্দগুলি অনুপস্থিত থাকে—তখন অর্থ বুঝে বা বাচনভঙ্গীর তাৎপর্য অনুধাবন করে ব্যতিরেক অলংকার বুঝতে হয়।

১১.৪.৭.১ উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক

উদাহরণ :

(ক) কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'নারীকণ্ঠের কাকলি' উপমান কলকল্লোল। এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ নেই, আছে তারতম্য-বোধক 'লাজ দিল' কথাটি—এর সাহায্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝা যাচ্ছে। উপমেয় 'নারীকণ্ঠের কাকলি' লজ্জা দিল উপমান 'কলকল্লোল'কে। লজ্জা যে দেয়, সে তার শ্রেষ্ঠত্বকে বা উৎকর্ষের কারণেই দেয়। এখানে 'নারীকণ্ঠের কাকলি'রই উৎকর্ষ। কিন্তু, কোন্ গুণে এই উৎকর্ষ, সে

কারণটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তা অনুমান করা যায়। কলধ্বনি নারীর কণ্ঠেও আছে, কল্লোলের (ঢেউ) মৃদু আঘাতেও আছে। এই ধ্বনির উচ্চতায় 'কলকল্লোল' অপেক্ষা নারীকণ্ঠের 'কাকলি'রই উৎকর্ষ। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এ উদাহরণে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকার হয়েছে।

(খ) কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা।
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উপমেয় 'রাবণের রাজসভা' (ইহা), উপমান 'ইন্দ্রপথের পাণ্ডব-সভা'। দুটি সভাই ঐশ্বর্যময়। তবে, তারতম্য-বোধক 'ছার' শব্দের প্রয়োগে ঐশ্বর্যের পরিমাণের দিক থেকে দুটি রাজ্যসভায় উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে 'রাবণের রাজসভা'রই উৎকর্য। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্য দেখানো হয়েছে বলে এখানকার উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেকের আরও উদাহরণ—

(ক) কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।

(খ) কনকলতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ কাজে।

(গ) বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভূজে জিনিয়া করি-শুণ্ড।
কম্ব জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।।

(ঘ) কপাট বিশাল বুক নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মুক্তাপাতি জিনিয়া দশন।

(ঙ) এই দুটি।
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে ধরা।

(চ) কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল।
কি ছার বংশীধ্বনি, নহে তার তুল।

(ছ) বাতাসের চেয়ে স্বচ্ছ তোমার সে প্রত্যাশাকে নিয়ে
বসে থাকা শেষ হয়ে গেছে।

(জ) ভাতিছে কেশে রত্ন রাশি; মরি
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে?

(ঝ) দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্রে যুগ্মনেত্রে পরশয়ে শ্রুতি।।

(ঞ) কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পাদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা।।

১১.৪.৭.১ অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক

পূর্বেই বলেছি— অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেকের সাক্ষাৎ বেশি পাওয়া যায় না; নীচে কয়েকটি এই জাতীয় ব্যতিরেকের উদাহরণ দিলাম—

(ক) দিনে দিনে শশধর হয় বটে তনুতর
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু, ক্রমশঃ হইলে তনু
আর ত' নূতন নাহি হয়।

এখানে নরের তনু-উপমেয়, আর শশধর হলো উপমান। উভয়েই ক্ষীণ হয়—কিন্তু উপমান পুনরায় পূর্ণ জীবন পায়, অথচ উপমেয় আর নূতন হয় না; তাই উপমেয় অপেক্ষা এখানে উপমানের উৎকর্ষই প্রকাশিত হচ্ছে। উলটে বললে বলা যায় যে এখানে উপমেয়ের অপকর্ষ ঘটেছে তাই একে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক বলতে হবে।

(খ) ব্যবহারে সে নিতান্ত পাষণ্ডকেও হার মানায়।

পাষণ্ড উপমান আর 'সে' হচ্ছে উপমেয়। ব্যবহারে পাষণ্ড অপেক্ষাকৃত ভালো বলায় উপমানে উৎকর্ষ সূচিত হলো।

১১.৭ সারাংশ

অর্থালংকারে বাইরের রূপটি বড় নয়। শব্দের ধ্বনিগত উজ্জ্বলতায় এই অলংকার নিরূপিত হয় না। বাক্য বা শব্দের অর্থ অক্ষত রেখে শব্দ বদল করে দিলেও অলংকার যা ছিল, তাই থাকবে। কিন্তু শব্দ বদলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থটিও যদি বদলে যায়, তাহলে অলংকারটি আর টিকবে না। অনেক রকমের অর্থালংকার আছে। ওদের সাধারণ লক্ষণ দেখে যদি শ্রেণীবিভাগ করা যায় তবে পাঁচটা শ্রেণীতে ওদের ফেলতে হবে। যথা—সাদৃশ্যমূল, বিরোধমূল, শৃঙ্খলামূল, ন্যায়মূল আর গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূল অলংকার।

উপমা : সমধর্মবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন জাতীয় মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোই উপমা বলে। উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ। উপমেয়—যার তুলনা দেওয়া হয় তা হলো

উপমেয়। উপমান- যার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়—তুলনা করা হয়—তাই হচ্ছে উপমান। সামান্য বা সাধারণ ধর্ম যে ধর্ম বা গুণ উপমেয় আর উপমানের মধ্যে থেকে তুলনাকে সম্ভব ও সফল করে তোলে তাকে সামান্য বা সাধারণ ধর্ম বলে। সাদৃশ্যবাচক শব্দ—মত বা মতে, মতন, সম, যথা, নিভ, তুল, সমতুল, যেমন, জনু, যথা, যৈছে, প্রায়, পারা, উপমা, তুল্য, হেন, ন্যায়, জাতীয়, সদৃশ, সমান, যেন, প্রতিম, ভাতি, রীতি, সংকাশ, প্রমাণ, বৎ—প্রভৃতি অব্যয়গুলিকে (যাদের দ্বারা উপমা বোঝায়) সাদৃশ্যবাচক শব্দ বলে। বাংলায় উপমার বিভাগ পাঁচটি- ১। পূর্ণোপমা; ২। লুপ্তোপমা; ৩। মালোপমা; ৪। স্মরণোপমা; ৫। মহোপমা।

পূর্ণোপমা : যে উপমা অলংকারের উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকে, তার নাম পূর্ণোপমা। লুপ্তোপমা : যে উপমা অলংকারে উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের যে কোনো একটি বা দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে, তার নাম লুপ্তোপমা। মালোপমা: যে উপমা অলংকারে উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি, তার নাম মালোপমা। স্মরণোপমা : কোনো বস্তুর স্মরণ বা অনুভব থেকে যদি সমধর্মের অন্য কোনো বস্তুকে মনে পড়ে যায় তবে স্মরণোপমা অলংকার হবে। মহোপমা : মহোপমা ঠিক একটি অলংকার নয়। তাই অনেক আলংকারিক একে উপমার স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে স্বীকার করেননি।

রূপক : বিষয়ের অপহ্নব না ঘটিয়ে তার ওপর বিষয়ীর (উপমানের) অভেদ আরোপ করলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম রূপক অলংকার। বাংলায় রূপকের উল্লেখযোগ্য বিভাগ তিনটি—

(ক) নিরঙ্গরূপক; (খ) সাঙ্গরূপক; (গ) পরম্পরিত রূপক। এছাড়া আছে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরূপক, আখ্যানরূপক। তবে প্রথম তিনটি রূপকই প্রধান। নিরঙ্গরূপক দু-রকমের— (ক) কেবল নিরঙ্গরূপক; (খ) মালা নিরঙ্গরূপক। নিরঙ্গরূপক : যে রূপক অলংকারে কোনো অঙ্গের অভেদ কল্পনা না করে কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম নিরঙ্গরূপক। নিরঙ্গরূপক দুরকমের, কেবল আর মালা। একটি উপমানের অভেদ আরোপ হলে কেবল নিরঙ্গরূপক, আর একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ হলে মালা নিরঙ্গরূপক। সাঙ্গরূপক : যে রূপক অলংকারে বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমনের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম সাঙ্গরূপক। পরম্পরিত রূপক : যে রূপক অলংকারে একটি অলংকারে একটি উপমেয়ের ওপর একটি উপমানের অভেদ-আরোপের কারণে অন্য একটি উপমেয়ের ওপর অন্য একটি উপমানের অভেদ-আরোপের জন্ম হয়, তার নাম পরম্পরিত রূপক। অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক : উপমানে যদি কোনো বিশেষ কিম্বা অসম্ভব গুণ বা ধর্ম আরোপ করা হয়, এবং ঐ বিশেষ গুণ বা ধর্মযুক্ত উপমানকে যদি উপমেয়ের ওপর অভিন্নভাবে স্থাপিত করে রূপক সৃষ্টি করা হয়—তখন সেই রূপককেই অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক বলে।

উৎপ্রেক্ষা : গভীর সাদৃশ্যের কারণে প্রকৃতকে (উপমেয়কে) যদি পরাত্মা (উপমান) বলে উৎকট (প্রবল) সংশয় হয় এবং যদি সে সংশয় কবিত্বময় হয়ে ওঠে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার

নাম উৎপ্রেক্ষা অলংকার। উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু-রকমের বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। বাচ্যোৎপ্রেক্ষা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে 'যেন', 'বুঝি, 'জনু'', 'প্রায়', 'মনে হয়', 'মনে গণি' জাতীয় কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে, তার নাম বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমান করে নেওয়া যায়, তার নাম প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। মালোৎপ্রেক্ষা : একই উপমেয়কে কেন্দ্র করে যদি একাধিক উপমানের দ্বারা একাধিক উৎপ্রেক্ষার মালা সাজানো হয়—তবে তাকে মালোৎপ্রেক্ষা অলংকার বলে।

অপহ্নুতি : উপমেয়কে নিষিদ্ধ করে বা গোপন রেখে উপমানকে স্থাপন বা প্রকাশ করাকে অপহ্নুতি অলংকার বলে। সমাসোক্তি : বর্ণনীয় বিষয়ের (উপমেয়) ওপর অন্যবস্তুর (উপমান) ব্যবহার আরোপ করা হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সমাসোক্তি অলংকার।

অতিশয়োক্তি : বিষয়ীর (উপমানের) সিদ্ধ অধ্যবসায় হলে, অর্থাৎ উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললে এবং সেই কারণে উপমেয়ের কোনো উল্লেখ না থাকলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তারই নাম সাধারণ অতিশয়োক্তি।

ব্যতিরেক : উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে যে অর্থ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যতিরেক অলংকার। ব্যতিরেক অলংকার দু'রকমের। যখন উপমানকে নিন্দিত করে উপমেয়ের উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়—তখন তাকে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক বলা হয়; আর যখন উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অপকর্ষ বর্ণিত হয় তখন তাকে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক বলে।

১১.৮ অনুশীলনী

১. অর্থালংকার বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে লিখুন।

২. সাদৃশ্যমূলক অলংকার কাকে বলে? ব্যাখ্যা করুন।

৩. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—অর্থালংকার অর্থেরই অলংকার, শব্দের (ধ্বনির) অলংকার নয়।

৪. শব্দালংকার আর অর্থালংকারের মূল পার্থক্য কী কী লিখুন।

৫. অর্থালংকারের শ্রেণিগুলির নাম লিখুন।

৬. সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মূল ভাগ ক'টি? নামোল্লেখ করে বিস্তারিত লিখুন।

৭. কী কী উপায়ে কবিরা দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখান, উদাহরণসহ লিখুন।

৮. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন : পূর্ণোপমা, সাঙ্গ রূপক, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক।

৯. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।

(খ) নয়ন বর্ষিল উজ্জ্বলতর মুকুতা।

(গ) তটিনী চলেছে অভিসারে।

(ঘ) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গ।

(ঙ) অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।

(চ) কচি কলাপাতা সন্ধ্যা।

(ছ) জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই।

(জ) সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা।

(ঝ) মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধারপর্ণপুটে।

(ঞ) ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে।

(ট) হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান

(ঠ) আসন্ন শীতের বেলা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে।

একক ১২ : বিরোধমূলক অর্থালংকার

একক গঠন :

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ ভূমিকা

১২.৩ মূলপাঠ : বিরোধমূলক অর্থালংকার

১২.৩.১ বিরোধাভাস (বিরোধ)

১২.৪ মূলপাঠ : ন্যায়মূল অলংকার

১২.৪.১ অর্থান্তরন্যাস

১২.৫ গূঢ়ার্থপ্রতিমূলক অর্থালংকার

১২.৫.১ ব্যাজস্তুতি

১২.৬ সারাংশ

১২.৭ অনুশীলনী

১২.১ উদ্দেশ্য

এতক্ষণ আমরা দেখলাম, সাদৃশ্যমূলক অলংকারের নানা রূপ। দুটি সদৃশ বা বিসদৃশ বস্তুর সাদৃশ্য প্রদর্শন করে অর্থালংকারের বিবিধ রূপটি প্রকাশিত হয় সাদৃশ্যের চারটি অঙ্গের হেরফেরে। এবার আমরা দেখব অর্থালংকারের অন্য রূপ। এবার জেনে নিন অর্থালংকারের বাকি চারটি লক্ষণ থেকে তৈরি আরও তিনটি শ্রেণির কথা—বিরোধমূলক, ন্যায়মূলক আর গঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকারের কথা। এই এককটির উদ্দেশ্য তার পরিচয়টি বিশদ করা। এর ফলে শিক্ষার্থী অলংকার নির্ণয়ে অধিকতর স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন এবং অর্থালংকারের সার্বিক পরিচয় লাভ করবেন।

১২.২ ভূমিকা

কোনো কবির লেখায় যদি দেখি, কার্য-কারণ-ঘটনাক্রম তার স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অন্যপথ বা উলটোপথে চলছে, তখনই বুঝব সেখানে 'বিরোধ' আছে। যেহেতু তা কবির লেখা, সেই কারণে ধরে নিতে হবে—সেখানে যা-কিছু বিরোধ সবই বাইরে থেকে বিরোধ বলে মনে হয়, একটু তলিয়ে ভাবলেই তার মীমাংসা খুঁজে পাব, বিরোধ মিলিয়ে যাবে। কাব্য-কবিতার বিরোধের ব্যাপারটি কয়েকটি উদাহরণ থেকে বুঝে নেওয়া যাক :

১. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।

২. মেঘ নাই তবু অঝোরে ঝরিল জল।

৩. আছে চক্ষু, কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।

৪. তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

৫. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

৬. এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে বাঁধিতে গলায়?

প্রথম উদাহরণে আছে একটি শিশু আর শিশুর পিতা। শিশুটি তার পিতার কোলে ঘুমিয়ে আছে, এই তথ্য অভিজ্ঞ মানুষের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু, শিশুর পিতাটি ঘুমিয়ে আছে শিশুর মধ্যে—এ ধরনের কথায় মনে খটকা লাগে, অভিজ্ঞতা ধাক্কা খায় একটা বিপরীত ছবির কল্পনায়। পাঠককে ভাবায়, পাঠক কিছু সময়ের জন্য গভীর জলে পড়ে যায়, এর অর্থ খুঁজে বের করে অবশেষে কিনারা পায়। এটাই বিরোধ, এখানেই কথার সৌন্দর্য, অর্থের অলংকার।

দ্বিতীয় উদাহরণে মেঘশূন্য নীল আকাশ থেকে অঝোরে বর্ষণ, তৃতীয় উদাহরণে চোখ থেকেও দৃষ্টি না-থাকা-কারণ-কার্যের স্বাভাবিক সম্পর্ককে অস্বীকার করছে বলে বিরোধ। চতুর্থ উদাহরণে শ্রাবণের ধারা ঝরল একটি বনে, কদম ফুটল অন্য একটি বনে। এমন ঘটনা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের আইন অমান্য করছে। অতএব, খবর হিসেবে এটি মিথ্যা, অন্ততপক্ষে অবিশ্বাস্য। বনে বনে সন্ধান করেও এর সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু ওই বিরোধের খোলসটা ছাড়িয়ে পাঠকের মনে যে কদম ফুটে উঠল ক্রমশ, তার সৌন্দর্য পাঠকই উপভোগ করবেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী তার আস্বাদ পাবেন না। পঞ্চম উদাহরণে সুখের আশায় বাঁধ ঘর আগুনে পুড়ে দুঃখ এনে দিল, বস্তুজীবনেও এমনটি ঘটে। এই স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেও তো বিরোধ আছেই। এই বিরোধটাই কবি কাজে লাগাচ্ছেন তাঁর কবিতায়, যেখানে সত্যি সত্যি ঘর-বাঁধা বা ঘর-পোড়ার ঘটনা ঘটছে না, ঘটছে কারো মনে সুখের বদগলে দুঃখের আনাগোনা। শেষ উদাহরণের দৃশ্যটা অদ্ভুত এবং কিঞ্চিৎ ভয়ংকর। এমন সাপের কথা কবি বলছেন, যাকে দেখলে ভয় শিউরে ওঠার বদলে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে। খবর হিসেবে এটাও অবিশ্বাস্য। এখানেই এর বিরোধ। কেন সাপটাকে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে বুঝতে পারলেই চমক, চমৎকারিত্ব। গলায় বাঁধা ওই সাপটা সত্যি সত্যি হয়ে উঠবে অলংকার—গলারও, মনেরও।

১২.৩ মূলপাঠ : বিরোধমূলক অর্থালংকার।

১২.৩.১ বিরোধাভাস (বিরোধ)

সংজ্ঞা : যদি দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখানো হয়, কিন্তু অর্থবোধে যদি সে বিরোধের অবসান ঘটে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার। দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখানো হলে বিরোধাভাস।

দুটি বস্তুর যদি আপাত বিরোধ দেখা যায় এবং ঐ বিরোধে যদি চমৎকারিত্বের বা কাব্যোৎকর্ষের

সৃষ্টি হয়— তখনই বিরোধাভাস অলংকার হয়। এই অলংকার প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে যথার্থ বিরোধ হলে বিরোধাভাস অলংকার হয় না। বিরোধ এখানে শুধু উক্তিতে, অর্থ বা তাৎপর্যে এ বিরোধ নেই। যেমন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।।

এখানে সীমার মাঝে অসীমের স্থিতি আপাত বিরোধী চিন্তা, কিন্তু অসীম ঈশ্বর সীমিত বিশ্বও বিরাজমান। সুতরাং বিরোধ এখানে যথার্থ নয়, কাব্যে চারুত্ব দান করার জন্য উল্লিখিত। তাই এখানে বিরোধাভাস হয়েছে। সত্যকার বিরোধ থাকলে অলংকার কখনোই থাকে না। আরেকটা উদাহরণ দিই।

'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।'

কাদম্বিনী মরেনি—এই ব্যাপারটা সে বুঝিয়ে দিলে; এটি আপাতবিরোধী। ভাষাগতভাবেও বিরোধ রয়েছে 'মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই'—মরে না-মরা কিভাবে প্রমাণিত হয়? গোটা গল্পটার আলোকে এর উত্তর সহজ, এবং বিরোধটুকুও যথার্থ নয়।

উদাহরণ :

(i) বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে।

ব্যাখ্যা : 'মুক্তি'র বিপরীত 'বন্ধন'। 'শৃঙ্খলমুক্ত করা' আর 'শৃঙ্খলে বাঁধা' বিরুদ্ধ দুটি কাজ। অতএব, শ্যামা বজ্রসেনকে শৃঙ্খলমুক্ত করে শৃঙ্খলেই বেঁধেছে—এ কথা শুনে মনে হয়, শ্যামার এ দুটি কাজের মধ্যে বিরোধ আছে। কিন্তু এ শৃঙ্খলমুক্তি 'ক্ষণিকে'র আর এ শৃঙ্খলে বাঁধা 'অনন্তে'র। এর অর্থ কারাগারের লোহার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি যা মুহূর্তেই ঘটে গেছে) আর প্রেমের শৃঙ্খলে বন্ধন (যা চিরকালের)। এই অর্থবোধ থেকে শ্যামার দুটি কাজের আপাত বিরোধের অবসান ঘটল। অতএব, এখানে বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার হয়েছে।

(ii) অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।।

ব্যাখ্যা : 'বন্ধন' আর 'মুক্তি' বিপরীত দুটি শব্দ। অতএব, 'বন্ধনমাঝে' 'মুক্তির স্বাদ' পাবার কল্পনায় বিরোধ আছে। কিন্তু 'বন্ধন' যদি হয় 'অসংখ্য' আর 'মুক্তির স্বাদ' যদি হয় 'মহানন্দময়', তাহলে সে 'বন্ধন' আর 'মুক্তির অন্য অর্থ অবশ্যই আছে। আমাদের চারপাশের সীমানার যে বন্ধন, তা বাইরের। সেই বাইরের বন্ধনে বাঁধা থেকেই কবি চেয়েছেন মনের মুক্তি। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার অনুভবে যে আনন্দের সন্ধান কবি পেতে চান, কবির পক্ষে সেইটেই হবে সীমার বাহ্য বন্ধনের থেকেও অসীম আনন্দলোকে সত্যকার মুক্তি। এই অর্থবোধ থেকেই 'বন্ধন'-'মুক্তি'র আপাত বিরোধের অবসান ঘটে বলে এখানে বিরোধাভাস অলংকার আছে।

(iii) এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

ব্যাখ্যা : ‘মৃত্যুহীন’ যে প্রাণ, ‘মরণে’ তাকেই দান করা হল। ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’-এর সঙ্গে ‘মরণ’-এর সংযোগ—এতে বিরোধ আছে। এ বিরোধ শব্দের সঙ্গে শব্দের, অতএব ভাষাগত বাহ্য বিরোধ। কিন্তু, কথাটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো মহান পুরুষ সম্পর্কে উচ্চারিত। এখানে ‘প্রাণ’-এর অর্থ আত্মার বাণী, তার মৃত্যু বা বিনাশ নেই বলে সে-‘প্রাণ’ ‘মৃত্যুহীন’। আর, ‘মরণ’ কেবল শরীরের, ‘প্রাণের’ নয়। দেশবন্ধু তাঁর শরীরী মৃত্যুতে আত্মার অমর বাণী দেশবাসীর জন্য রেখে গেলেন—এই অর্থবোধ থেকে উদ্ধৃত স্তবকটির ভাষাগত আপাত বিরোধের অবসান ঘটে। অতএব, এখানে বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার আছে।

আরও কিছু উদাহরণ—

(ক) হে দূর হতে দূর, হে নিকটতম।

(খ) ভীষণ সুন্দর বৃদ্ধ শিশুদল।

(গ) যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই।

(ঘ) রাজ্য লয়ে রহ রাজ্যহীন।

(ঙ) ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে।
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতার সব শিশুদের অন্তরে।

(চ) ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে।

(ছ) কি রহস্য ধেয়াইছে দিগন্ত শয়নে
জ্যোতির্ময়ী তমস্বিনী বিনিদ্র নয়নে।

(জ) দুই জনে পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।

(ঝ) তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা।

১২.৪ মূলপাঠ : ন্যায়মূল অলংকার

যখন কোনো বক্তব্যের মধ্যে ন্যায়বাচক উক্তি থাকে এবং উক্তির দ্বারাই বক্তব্যকে জোরালো করা হয় তখনই ন্যায়মূল অলঙ্কার হয়। এই জাতীয় অলঙ্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাত্র দুটি অলঙ্কার—অর্থান্তরন্যাস এবং কাব্যলিঙ্গ। আমরা কেবলমাত্র প্রথমটি আলোচনা করব।

১২.৪.১ অর্থান্তরন্যাস

সংজ্ঞা : সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার। সামান্যের দ্বারা

বিশেষ অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্য যখন সমর্থিত হয় তখন এবং কাজের দ্বারা কারণ অথবা কারণের দ্বারা কাজ যখন সমর্থিত হয়, তখন অর্থান্তরন্যাস হয়। সংস্কৃত আলংকারিকদের কেউ কেউ অর্থান্তরন্যাসকে 'বিশ্বব্যাপী' বলেছেন।

বৈশিষ্ট্য :

১। এ অলংকারের বিশেষ লক্ষণ সমর্থন।

২। সাধারণত দুটি বাক্য থাকে, দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যকে সমর্থন করে।

৩। একটি বাক্যে সামান্য (বা সাধারণ বিবৃতি) থাকলে অন্য বাক্যে বিশেষ, একটি বাক্যে কারণ থাকলে অন্য বাক্যে কার্য।

৪। দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের বিশেষের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের বিশেষ দ্বারা প্রথম বাক্যের সামান্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কারণের দ্বারা প্রথম বাক্যের কার্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কার্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের কারণের সমর্থন—সমর্থন এই চার রকমের হতে পারে।

উদাহরণ :

১। সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন—

হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকে দুটি বাক্য। প্রথম বাক্যে আছে একটি বিশেষ বিবৃতি—মেঘনাদের কাকা ('পিতৃব্য') বিভীষণ-রাম-লক্ষ্মণ-বানরের সঙ্গে বাস করে ('হেন সহবাসে') বর্বরতা শিখিয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যে ব্যক্তি নিম্নরুচির মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করে (গতি যার নীচ সহ) তার নিজের রুচিও নীচেই নেমে যায় ('নীচ সে দুর্ম্মতি')। দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত মানব-স্বভাবের এই সামান্য বা সাধারণ নিয়মটি সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের অন্তর্গত বিভীষণের বর্বর হয়ে যাওয়ার পরিণামকে। সমর্থনসূচক বাক্যাংশ 'বর্বরতা কেন না শিখিবে?' সমর্থনকে আরও জোরদার করে তুলেছে। অতএব, সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থন থাকায় স্তবকটিতে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়েছে।

২. বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন—

এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যদুটির প্রথম বাক্যে আছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যার বেশি বেশি আছে, সে আরও বেশি চায়। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি বিশেষ উদাহরণ—বাবুর মতো রাজারাই উপেনের মতো গরিবের ধন চুরি করে নেয়। স্পষ্টত, দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ সত্যটি প্রথম বাক্যের অন্তর্গত সাধারণ সত্যকেই সমর্থন করছে। বিশেষের দ্বারা সামান্যের এই সমর্থন উদ্ধৃত স্তবকে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে।

৩. কারণ দ্বারা কার্যের সমর্থন—

হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ?

ব্যাখ্যা : শত্রুপক্ষের লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলায় এনে নিজের বংশকে বিনাশ করে দেবার যে আয়োজন বিভীষণ ('তাত') করল, সে কাজের অনৌচিত্য-ঘোষণা ('উচিত কি তব একাজ') উদ্ধৃত স্তবকের প্রথম অংশে রয়েছে। স্তবকের পরবর্তী অংশে আছে বিভীষণের বংশকৌলিন্যের ব্যাখ্যা। এই বংশকৌলিন্যই পূর্ববর্তী অনৌচিত্যের কারণ। স্তবকের পরবর্তী অংশের অন্তর্গত এই কারণটি সমর্থন করছে পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্গত কার্যকে (অনৌচিত্যকে)। এই সমর্থন থেকেই স্তবকটিতে একটি অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

(ক) চির সুখীজন, ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

[সুখী ব্যক্তি ব্যথিতের বেদনা বুঝতে পারে না—এই সামান্য সত্য (General truth) সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষের জ্বালাবোধোপলব্ধির (এটি বিশেষ উক্তি— Particular Statement) দ্বারা সমর্থিত হয়েছ। তাই এটি অর্থান্তরন্যাস।]

(খ) একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।

(এখানে বিশেষ সামান্যের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।)

(গ) মুছবে রে সব এই জগতে
ভাই, থাকবে শুধু কাজ।
কালিদাস ত' গেছেন চলে,
তাঁর কেতাব বাঁচে আজ।

(বিশেষের দ্বারা এখানে সামান্য সমর্থিত হয়েছে।)

১২.৫ গূঢ়ার্থপ্রীতিমূলক অর্থালংকার

গূঢ় অর্থ (গূঢ়ার্থ) হচ্ছে কবিতার বা স্তবকের এমন অর্থ, যা লুকিয়ে থাকে শব্দ-বাক্যের আড়ালে। শব্দ-বাক্যের এক-একটা অর্থ থাকে, যা বোঝা যায় শব্দগুলি চেনা শব্দ হলেই। এই অর্থটা কথার বাইরের অর্থ। কিন্তু এই বাইরের অর্থে অনেক সময়ই কবির বক্তব্য ধরা পড়ে না, তখন কথাগুলি

অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেখানে আসল বক্তব্য বা গূঢ়ার্থ লুকিয়ে থাকে অন্য আরেক বাচ্যার্থের আড়ালে সেখানেই এই গূঢ়ার্থমূল অলংকার হয়। এই জাতীয় অলংকারের মধ্যে ছটি অলংকার বিশেষ উল্লেখযোগ—ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা, সূক্ষ্ম, অর্থাপত্তি, স্বভাবোক্তি এবং আপেক্ষ। আমাদের আলোচ্য কেবলমাত্র ব্যাজস্তুতি।

১২.৫.১ ব্যাজস্তুতি

সংজ্ঞা : ভাষায় বা বাইরের অর্থে (বাচ্যার্থে) যাকে নিন্দা বা স্তুতি বলে মনে হয়, গভীর অর্থে (গূঢ়ার্থে) যদি তা যথাক্রমে স্তুতি বা নিন্দা বলে বোঝা যায়, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যাজস্তুতি অলংকার। নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি।

উদাহরণ :

১. নিন্দার ছলে স্তুতি—

(i) ভাঙ্ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।

ব্যাখ্যা : শিবকে নেশাখোর (ভাঙ্ খান) মাতাল (মত্ত) বলা হল। দুটি বিশেষণই নিন্দাসূচক। এ কথাও বলা হল, প্রতিটি বিষয়েই তার অসন্তোষ, অতৃপ্তি। কেবলমাত্র বেলপাতা (বিল্বদল) পেলেই তিনি খুশি। সুতরাং, সব মিলিয়ে যে চরিত্রটি প্রকাশ পেল, তা সাধারণভাবে অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু 'কেবল তুষ্ট বিল্বদলে' কথাটির গভীরতর তাৎপর্য এই, অন্তরের ভক্তিটুকু মিশিয়ে তাঁকে একটুখানি স্মরণ করলেই তিনি তুষ্ট। এ কারণে শিবের আর একটি নাম আশুতোষ। তুষ্ট হলে যেকোনো কাম্যবস্তু অতি সহজেই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব। এইখানেই তাঁর শ্রদ্ধেয় পরিচয়। বাক্যের নিন্দাসূচক ইঙ্গিত বাইরে থেকে পাওয়া গেলেও শিব প্রশংসিতই হলেন। নিন্দার ছলে স্তুতি প্রকাশ পেল বলে এখানকার অলংকার ব্যাজস্তুতি।

(ii) ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।।

সংকেত : আমার স্বামী ভূত নাচিয়ে বেড়ান, এমন বিয়ে যিনি দিলেন, সেই নিষ্ঠুর বাপের মৃত্যু হলেই ভালো। এ অর্থ নিন্দাসূচক। কিন্তু, আমার স্বামী ভূতনাথ—দেবাদিদেব মহাদেব, এমন স্বামীর সঙ্গে যিনি আমাকে ধন্য করেছেন, তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি হিমালয় পর্বত। এ অর্থ স্তুতিবাচক। নিন্দার ছলে স্তুতি।

২. স্তুতির ছলে নিন্দা—

(i) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ!

ব্যাখ্যা : 'সুন্দর মালা' যার গলায়, তিনিও সুন্দর, শ্রদ্ধেয়। অতএব, উদ্ধৃত বাক্যের অন্তর্গত সম্বোধন সমুদ্রের (প্রচেতঃ) প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করা হল, বাহ্যত তা স্তুতি বা প্রশংসার ভাষা। কিন্তু, বাইরের অর্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে (গূঢ়ার্থ) পৌঁছলেই বোঝায় যায়, এ 'মালা' আসলে বানরসৈন্যের তৈরি

সেতু, যার বন্ধনে বাঁধা পরে অলঙ্ঘ্য অজেয় সমুদ্র আজ রামচন্দ্রের কাছে বন্দি। এ 'সুন্দর মালা'র গূঢ়ার্থ পরাক্রান্ত সমুদ্রের পায়ে বাঁধা শিকল'। সমুদ্রের পক্ষে এ লজ্জার, নিন্দার বিষয়। ভাষায় যাকে স্তুতি বলে মনে হয়, অর্থে তা নিন্দা বলে বোঝা গেল। সুতরাং উদ্ধৃত বাক্যে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়েছে।

(ii) বন্ধু! তোমরা দিলে নাক দাম
রাজ সরকার রেখেছেন মান!
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন।

ব্যাখ্যা : 'রাজ সরকার' (ইংরেজ সরকার) সত্যি যদি কবির লেখাকে অমূল্য সম্পদ (যার অসীম মূল্য) গণ্য করে থাকেন, তবে কবির পক্ষে অবশ্যই তা সম্মানের, শ্লাঘার বিষয় এবং এ আচরণ ইংরেজ সরকারের পক্ষে প্রশংসার বিষয়। তবে, এই অর্থটি উদ্ধৃত স্তবকের বাইরের অর্থ (বাচ্যার্থ)। এই বাইরের অর্থে অবশ্যই রয়েছে ইংরেজ সরকারের প্রতি কবির স্তুতি। কিন্তু এই বাচ্যার্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে পৌঁছলেই বোঝা যাবে কবি প্রতি ইংরেজ সরকারের প্রকৃত আচরণটি। 'অ-মূল্য' শব্দটি প্রয়োগ করে (মূল্যহীন অর্থে) কবি ইঙ্গিত করলেন একটি তথ্যের দিকে সরকার বিনামূল্যেই কবির লেখা সংগ্রহ করে নিয়েছিল ওগুলি বাজেয়াপ্ত করে। সরকারের এই আচরণ অবশ্যই নিন্দনীয়। গূঢ়ার্থে সেই নিন্দাই উচ্চারিত। অতএব, স্তবকটিতে রয়েছে ব্যাজস্তুতি।

নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা করার সার্থক উদাহরণের প্রসঙ্গে আমরা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থে দেবী অন্নদার আত্মপরিচয়টুকু স্মরণ করি।

(ক) অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সাথে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।

(নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা সূচিত হচ্ছে।)

অবশ্য স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বোঝাতে এই অলংকারের প্রয়োগ একটু বেশী হয়ে থাকে। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে এই জাতীয় ব্যাজস্তুতির একটি বিখ্যাত উদাহরণ হলো—"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, হে প্রচেতঃ!" এখানে পথের-বাঁধা সাগরকে মালা-পরিহিত রূপে কল্পনা করার মধ্যে নিন্দা করার ব্যাঙ্গার্থই আছে। তাই একে ব্যাজস্তুতি না বলে ব্যাঙ্গোক্তি বলাই বোধহয় সঙ্গত।

আর কয়েকটি উদাহরণ—

(খ) তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে। (স্তুতিচ্ছলে নিন্দা)

(গ) ব্যয়ে তিনি এমনই মুক্তহস্ত যে নিজের সর্বস্ব উড়াইয়া দিয়া স্ত্রী পুত্রকে পর্যন্ত পথের ভিখারী করিয়াছেন।

(ঘ) আমার ছোট কাকা বংশের গুণধর সন্তান ছিলেনহাজত, ফাটক আর থানা পুলিশেই লোকে সেটা জেনেছে।

(ঙ) আত্মবৎ সর্বভূতেষু নীতি তিনি বর্ণে বর্ণে পালন করেনপরের অর্থ সম্বন্ধেও।

(চ) তিনি বেশ সাধু লোক, গরীবের টাকা চিরকালের জন্য নিজের কাছে জমা রাখেন।

১২.৬ সারাংশ

দুটি সদৃশ বা বিসদৃশ বস্তুর সাদৃশ্য প্রদর্শন করে অর্থালংকারের বিবিধ রূপটি প্রকাশিত হয় সাদৃশ্যের চারটি অঙ্গের হেরফেরে। এবার জেনে নিন অর্থালংকারের বাকি চারটি লক্ষণ থেকে তৈরি আরও তিনটি শ্রেণির কথা—বিরোধমূলক, ন্যায়মূলক আর গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকারের কথা।

বিরোধাভাস (বিরোধ) : যদি দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখানো হয়, কিন্তু অর্থবোধে যদি সে বিরোধের অবসান ঘটে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার।

ন্যায়মূল অলংকার — যখন কোনো বক্তব্যের মধ্যে ন্যায়বাচক উক্তি থাকে এবং উক্তির দ্বারাই বক্তব্যকে জোরালো করা হয় তখনই ন্যায়মূল অলঙ্কার হয়। এই জাতীয় অলঙ্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—অর্থান্তরন্যাস। অর্থান্তরন্যাস—সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

গূঢ়ার্থপ্রীতিমূলক অর্থালংকার — গূঢ় অর্থ (গূঢ়ার্থ) হচ্ছে কবিতার বা স্তবকের এমন অর্থ, যা লুকিয়ে থাকে। শব্দ-বাক্যের আড়ালে। যেখানে আসল বক্তব্য বা গূঢ়ার্থ লুকিয়ে থাকে অন্য আরেক বাচ্যার্থের আড়ালে সেখানেই এই গূঢ়ার্থমূল অলংকার হয়। ব্যাজস্তুতি—নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি।

১২.৭ অনুশীলনী

১. বিরোধমূলক অলংকার কাকে বলে? তার বৈশিষ্ট্য কী কী?

২. ন্যায়মূল অলংকারের বিশেষত্ব কোথায়? এই শ্রেণীর একটি অলংকারের উদাহরণসহ সংজ্ঞা দিন।

৩. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—বিরোধাভাস, ব্যাজস্তুতি।

৪. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।

(খ) পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি।
আস্তে একটু চলনা ঠাকুর-ঝি।
** **
জ্যৈষ্ঠ আসতে কদিন দেরি ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?

(গ) গাছে গাছে ফল, ফুলে ফুলে অলি—

(ঘ) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।

(ঙ) সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।

(চ) 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।'

(ছ) ভাঙ্ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।

(জ) অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।।

(ঝ) এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

(ঞ) হে দূর হতে দূর, হে নিকটতম।

(ট) ভীষণ সুন্দর বৃদ্ধ শিশুদল।

(ঠ) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,

(ড) যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই।

(ঢ) রাজ্য লয়ে রহ রাজ্যহীন।

(ণ) অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।

(ত) ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতার সব শিশুদের অন্তরে।

(থ) ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে।

(দ) কি রহস্য ধেয়াইছে দিগন্ত শয়নে
জ্যোতির্ময়ী তমস্বিনী বিনিদ্র নয়নে।

(ধ) দুই জনে পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।

(ন) তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা।

(প) হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্মতি।

(ফ) তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।

(ব) এ জগতে হায়! সেই বেশী চায় যার আছে ভুরি ভুরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

একক ১৩-১৪ অলঙ্কার নির্ণয়

একক গঠন :

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ ভূমিকা

১৩.৩ মূলপাঠ ১ : অলংকার-নির্ণয়ের সূত্র

১৩.৪ মূলপাঠ ২ : অলংকার-নির্ণয় পদ্ধতি

১৩.৫ অনুশীলনী

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল, এত প্রকার অলংকারের মধ্যে প্রদত্ত উদাহরণের প্রকৃত অলংকারটিকে নিশ্চিত কীভাবে করা সম্ভব তার চর্চা করা। এর ফলে শিক্ষার্থী অনুসন্ধানী হবে, যুক্তিবাদী হবে এবং অলংকারের বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণার অধিকারী হবে।

১৩.২ ভূমিকা

অলংকার নির্ণয়ের পদ্ধতি জানার পরেও কিছু কিছু সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে! প্রধানত তিন রকমের সমস্যা এইরকম—এক, একটি গোটা স্তবকে একরকমের অলংকার, অথচ স্তবকটির অংশবিশেষ পৃথক হয়ে গেলে তৈরি হয়ে গেলে তৈরি হতে পারে আর এক রকমের অলংকার। দুই, একই উদাহরণে একটি অলংকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে আর একটি অলংকার। তিন, একই উদাহরণে দু-তিন রকমের লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যদিও তার মধ্যে একটি লক্ষণই সঠিক এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা অলংকারটিই হবে সঠিক অলংকার। অলংকার একটি কবিতা বা স্তবকের সমগ্র শরীরে ছড়ানো থাকতে পারে, স্তবকের একটি অংশে—বাক্যে বা চরণে আবদ্ধ থাকতে পারে। কিন্তু একটি সমগ্র স্তবকের অলংকার আর তার একটি অংশের অলংকার এক হতে পারে, ভিন্নও হতে পারে।

এ কারণে প্রথমেই আমরা আলোচিত অলংকারগুলির মূল লক্ষণ চিনে রাখি।

১৩.৩ মূলপাঠ ১ : অলংকার-নির্ণয়ের সূত্র

অলংকার	মূল লক্ষণ
অনুপ্রাস	স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি
সরল অনুপ্রাস	একটি বা দুটি বর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত

বৃত্ত্যনুপ্রাস	একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণ
ছেকানুপ্রাস	একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার উচ্চারণ
শ্রুত্যনুপ্রাস	বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশ
আদ্যানুপ্রাস	পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি
অন্ত্যানুপ্রাস	দুটি পঙক্তির শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি
সর্বানুপ্রাস	দুটি চরণের সর্বশরীরে অনুপ্রাস
মালানুপ্রাস	একাধিক অনুপ্রাস বাক্যে থাকে।
গুচ্ছানুপ্রাস	একের বেশী ব্যঞ্জনধ্বনি একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত
যমক	একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার উচ্চারিত
আদ্যযমক	পদ্যে চরণের আদিতে যমক
মধ্যযমক	চরণের মাঝখানে যমক
অন্ত্যযমক	পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে যমক
সর্বমক	একটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উচ্চারিত
শ্লেষ	একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ
অভঙ্গ শ্লেষ	উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়
সভঙ্গ শ্লেষ	উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়
বক্রোক্তি	বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ না ধরে শ্রোতা অন্য অর্থ ধরলে
কাকু-বক্রোক্তি	বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির প্রশ্নবোধক বক্তব্যের উত্তর হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়
শ্লেষ-বক্রোক্তি	বক্তার কথায় শ্লেষ বা দুটি অর্থ থাকে
উপমা	সমধর্মবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন জাতীয় মধ্যে সাদৃশ্য
পূর্ণোপমা	উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ
লুপ্তোপমা	উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য এক বা একাধিক অঙ্গের লুপ্তি
মালোপমা	উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি
স্মরণোপমা	কোনো বস্তুর স্মরণ বা অনুভব থেকে সমধর্মের অন্য কোনো বস্তুকে মনে পড়া
মহোপমা	মহোপমা ঠিক একটি অলংকার নয়

রূপক	উপমেয় ও উপমানের অভেদ আরোপ
নিরঙ্গরূপক	একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ
কেবল নিরঙ্গরূপক	একটি উপমানের অভেদ আরোপ
মালা নিরঙ্গরূপক	একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ
সাঙ্গরূপক	উপমেয়-উপমান অঙ্গসমেত এক হয়ে যাওয়া
পরম্পরিত রূপক	এক উপমেয় ও উপমানের কারণে আর একটি উপমেয়-উপমানের জন্ম
অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক	উপমানে বিশেষ কিম্বা অসম্ভব গুণ বা ধর্ম আরোপ
উৎপ্রেক্ষা	উপমেয়কে উপমান বলে উকট সংশয়
বাচ্যোৎপ্রেক্ষা	কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ
প্রতীয়মাননাৎপ্রেক্ষা	সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমিত হয়
মালোৎপ্রেক্ষা	একটি উপমেয়, একাধিক উপমান
অপহ্নুতি	উপমেয়কে নিষিদ্ধ বা গোপন রেখে উপমানের প্রতিষ্ঠা
সমাসোক্তি	নির্জীব বস্তুতে সজীব বস্তু বা প্রাণীর গুণ আরোপ
অতিশয়োক্তি	উপমেয়ের উল্লেখ না করে উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করা
ব্যতিরেক	উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো
উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক	উপমানকে নিন্দিত করে উপমেয়ের উৎকর্ষ স্থাপন
অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক	উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অপকর্ষ
বিরোধাভাস (বিরোধ)	দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ কিন্তু অর্থবোধে সে বিরোধের অবসান
অর্থান্তরন্যাস	সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন
ব্যাজস্তুতি	নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা

এবার শুরু হবে পরবর্তী ধাপ। লক্ষণগুলি মাথায় রেখে দেখুন, উদাহরণটি শব্দালংকার না অর্থালংকার? প্রথম কাজ উদাহরণের ধ্বনিগুলি নজর করা। স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি থাকলে অনুপ্রাসের অন্তর্গত হবে। অনুপ্রাসের অনেকগুলি বিভাগ আছে। কোন্ বিভাগের অন্তর্গত সেটি বুঝতে হলে দেখুন একটি বা দুটি বর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হলে হবে সরল অনুপ্রাস। একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণ হলে হবে বৃত্ত্যনুপ্রাস। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার উচ্চারণ ঘটলে হবে ছেকানুপ্রাস। বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশ ঘটলে

হবে শুত্যনুপ্রাস। পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি হলে আদ্যানুপ্রাস। অন্ত্যানুপ্রাস হবে দুটি পঙক্তির শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি হলে। দুটি চরণের সর্বশরীরে অনুপ্রাস থাকলে সর্বানুপ্রাস। একাধিক অনুপ্রাস বাক্যে যদি থাকে তবে মালানুপ্রাস। একের বেশী ব্যঞ্জনধ্বনি একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত হলে গুচ্ছানুপ্রাস।

অনুপ্রাস না থাকলে শব্দের প্রতি দৃষ্টি দিন। দেখুন, একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে কিনা। হলে যমক। অনুপ্রাসের নিয়মেই ভাগগুলির প্রতি দৃষ্টি দিন এবং বিভাগ নির্ণয় করুন। যমক না হলে খেয়াল করুন একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ হয়েছে নাকি। যদি তেমন হয়, তবে বুঝবেন ওটি শ্লেষ অলংকার। এতগুলি স্তর পেরিয়ে এবার দেখুন দু'জন বক্তার কথোপকথন আছে কিনা। যদি দেখেন, বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ না ধরে শ্রোতা অন্য অর্থ ধরেছেন, তবে সেটি হবে বক্রোক্তি অলংকার।

শব্দের কারুকাজ পেরিয়ে আসুন অর্থালংকারে। মনে রাখবেন, অর্থালংকারে পথ হারাবার সম্ভাবনা বেশি। তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রথমেই খুঁজে নিন সাদৃশ্যমূলক অলংকারের চারটি অঙ্গই আছে কিনা। সমধর্মবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর। মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হলে সেটি উপমা অলংকারের মধ্যে গণ্য হবে। এবার সংকেতসূচি স্মরণে রেখে কোন্ উপবিভাগের মধ্যে উদাহরণটি গণ্য হবে, সেটি দেখুন। মনে রাখুন, উপমেয় ও উপমানের অভেদ আরোপ হলে রূপক, উপমেয়কে উপমান বলে উৎকট সংশয় জন্মালে উৎপ্রেক্ষা, উপমেয়কে নিষিদ্ধ বা গোপন রেখে উপমানের প্রতিষ্ঠা হলে অপহ্নুতি, নির্জীব বস্তুতে সজীব বস্তু বা প্রাণীর গুণ আরোপিত হলে সমাসক্তি, উপমেয়ের উল্লেখ না করে উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হলে অতিশয়োক্তি, উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে ব্যতিরেক অলংকার হয়।

এবার অর্থালংকারের তিনটি বিভাজন। দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখানো হলেও অর্থবোধে সে বিরোধের অবসান ঘটলে বিরোধাভাস—এটি বিরোধমূলক অলংকার। সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন করা হলে অর্থান্তরন্যাস অলংকার—এটি ন্যায়মূলক অলংকার। আর সবশেষে নিন্দার ছলে স্তুতি বা সুতির ছলে নিন্দা করা হলে হবে ব্যাজ্স্তুতি অলংকার—এটি গূঢ়ার্থপ্রতিমূলক অলংকার।

মনে রাখবেন, অলংকার-ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ব্যাখ্যাই আপনাকে পৌঁছে দেবে যথার্থ অলংকার-নির্ণয়ে। দ্বিতীয়ত, উদাহরণে একাধিক অলংকার থাকা অস্বাভাবিক নয়। একাধিক অলংকার থাকলে সেটি নির্দেশ করতে হবে।

সাদৃশ্যমূলক অলংকারে উপমেয়, উপমান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিচারশক্তি। আমরা আশা করব, এতক্ষণ ধরে অলংকারের আলোচনায় আপনারা সংশয়মুক্ত হতে পেরেছেন। এবার অনুশীলন।

১৩.৫ অনুশীলনী

১. আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।

২. জাগে লজ্জা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে...

৩. এ পুরীর পথ-মাঝে যত আছে শিলা,
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি তার।

৪. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

৫. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?

৬. হলুদ পাতার মত, আলোয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মত ঘেঁড়া-মেঘ আকাশের ধারে।

৭. যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে তব কিছু নাই।

৮. পড়ুক দুফোঁটা অশ্রু জগতের ‘পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।।

৯. কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

১০. ওগো আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারই আকাশ
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ—
তাই তো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানি,
কখনো জাফরানি।

১১. কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাপি।

১২. যত তাপস বালক
শিশির সুস্নিগ্ধ যেন অরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা।

১৩. অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

১৪. জলে সে নহে পদ্ম নাহি যাহে,
পদ্ম নহে নাহি যেথায় অলি, অলি সে নয় গান যে নাহি গাহে,
গান সে নহে হৃদয়মন না যায় যাহে গলি।

১৫. যাইতে মানস-সরে কার না মানস সরে?

১৬. দূরে বালুচরে রোদ কাঁপে থর থর'
ঝিঝির পাখার চেয়ে সে তীব্রতর।

১৭. সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

১৮. কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ?

১৯. কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে,
গগনের নীলগাঙে, হাবুডুবু খায় তারা বুদবুদ
জোছনা সোনায় রাঙে!

২০. বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতহীন। অধমগ্ন তরী' পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা।

২১. ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোমানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।

২২. যোলটি বছরে জমানো অশ্রু
জমাট পাথরে হতেছে গাঁথা,
প্রেয়সীর শেষ-শয়ন বিছাতে
মাটিতে বেহেশ্‌ত্‌ তুলেছে মাথা!

২৩. উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোড্রেণ্ড্রণগুচ্ছ।

২৪. নানা বেশভূষা হীরা রূপাসোনা
এনেছি পাড়ার কবি উপাসনা।

২৫. পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,
ভীষণে মধুরে দি ঝঙ্কার।

২৬. আটপণে কিনিয়াছি আধসের চিনি।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।।

২৭. কুটিল কুন্তল কুসুম কাছনি কান্তি কুবলয় ভাসয়ে।
কুঞ্চিতাধর কুসুম কৌমুদী কুন্দকোরক হাসয়ে।।

২৮. চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।

২৯. কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি।

৩০. শিকারের তাজা রক্তে শুচি শিলা শিহরে সহসা
আগুনের লোল জিহ্বা খোঁজে গূঢ় সত্তার ধমনী।

৩১. পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে
সে তরণী পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে।

৩২. সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

৩৩. ঝুলিছে ঝালরে মুকুতা।।

৩৪. কোকিল কুহলে কুতুহলে।

৩৫. দশদিশদামিনী দহন বিথার।

৩৬. হাহাকার করে বেহায়া হওয়ার বেহালাখানি।

৩৭. ব্যাহত বিধাতা ব্যক্তির বুদ্ধিতে।

৩৮. মধুমাসে মলয় মারুত মদমন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।।

৩৯. বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য।

৪০. কপাট বিশাল বুক নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মুক্তাপাতি জিনিয়া দশন।

৪১. নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে ধরা।

৪২. কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল।
কি ছার বংশীধ্বনি, নহে তার তুল।

৪৩. বাতাসের চেয়ে স্বচ্ছ তোমার সে প্রত্যাশাকে নিয়ে
বসে থাকা শেষ হয়ে গেছে।

৪৪. ভাতিছে কেশে রত্ন রাশি; মরি।
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে?

৪৪. দিনান্তে, নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

৪৫. কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।

৪৬. উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে।

৪৭. কুঁড়ির ভিতর কাদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।

৪৮. আমি কবি ভাই কর্মের ও ঘর্মের।

৪৯. অঞ্চলের অলিতে
মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে।

৫০. চঞ্চল শোণিতে যে।
সত্তার ক্রন্দন ধ্বনিতেছে।

৫১. ওই মেঘ জমছে
চল ভাই সমঝে।

৫২. তিনি চোখের জল মোছান কিন্তু ঘোচান না।

৫৩. বাতাস বহে বেগে, ঝিলিক মারে মেঘে।

৫৪. চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।

৫৫. নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে।

৫৬. বড়ে কথা কথা শুনি, বড়ো কথা কই
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই।

৫৭. নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি।

৫৮. নাম লেখে ওষুধের
এদেশে পশুদের।

৫৯. শুদ্ধ নিয়ম-মতে মুরগিরে পালিয়া।
গঙ্গাজলের যোগে রাধে তার কালিয়া।

৬০. হেঁটেছি তোমার বাড়ীর সামনে, করেছি কতই চাতুরী
তোমাকে দেখার। কিন্তু সে আশা হেনেছে বক্ষে হাতুড়ি।

৬১. মনোহরী নিশীথিনী
ও পাড়ার পিসি যিনি দাঁতে দিয়ে মিশি তিনি
কিনে আনে দিশি চিনি।

৬২. সাতাশ গণ্ডা পায়রা নিয়ে
আমার কি হয়রাণি এ।

৬৩. টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।

৬৪. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।

৬৫. দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ

৬৬. তোমার সে-চুল
জড়ানো সূতার মততা, নিশীথের মেঘের মতন।

৬৭. উড়ে হোক ক্ষয়,
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্জয়।

৬৮. এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

৬৯. নীড় নেই কোনো পালাবার
চলো হিমাচলে চলো যাই দূরে মালাবার।

৭০. জিনিস যদি টাটকা না হয়
ভেঙে চুরে আটখানা হয়।

৭১. রজনী গন্ধা বাস বিলালো,
সজনী সন্ধ্যা আসবি নালো ?

৭২. গগনে ছড়ায়ে এলোচুল।
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

৭৩. সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা।

৭৪. রূপে গুণে রস সিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।

৭৫. কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি।

৭৬. কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে।

৭৭. কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।

৭৮. কনকলতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ কাজে।

৭৯. বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভূজে জিনিয়া করি-শুণ্ড।
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।।

৮০. না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত।

৮১. কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, দবলী চরাই বনে।

৮২. নন্দ নন্দন চন্দন গন্ধ বিনিন্দিত অঙ্গ।

৮৩. গত যামিনী জিত দামিনী কামিনী কুল লাজে।

৮৪. তুমি সুগন্ধ হেনার গন্ধ অন্ধ কুঁড়ির মাঝে
বন্ধ হইয়া ছিলে মূক্ বেদনায়।

৮৫. এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা।

৮৬. দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্রে যুগ্মনেত্রে পরশয়ে শুতি।।

৮৭. কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পাদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।।

৮৮. নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।

৮৯. নরের নশ্বর তনু, ক্রমশঃ হইলে তনু
আর ত' নূতন নাহি হয়।

৯০. ব্যবহারে সে নিতান্ত পাষণ্ডকেও হার মানায়।

৯১. ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত

শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত।

৯২. দেশ দেশ দিশি দিশি দৌড়িছে দিবা নিশি
অগণিত সিত পীত কৃষ্ণ
কত কারখানা কল-কবজার কল-কল
কলঝঙ্কৃত কালো অঙ্গ।
ইঞ্জিন-গুঞ্জন পুঞ্জিত বিদ্যুতে
চঞ্চল নয়নে ভূভঙ্গ।

৯৩. মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।

৯৪. ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে।

৯৫. আনাদরে আনা যায় কত আনারস।

৯৬. সুশাসনের দ্বারা হর্ষবর্ধন প্রজাদের হর্ষ বর্ধন করেছিলেন

৯৭. যাইতে মানস সরে, কার না মানস সবে?

৯৮. গুরু কাছে লব গুরু দুখ।।

৯৯. হে বসন্তের রাজা আমার।
নাও এসে মোর হার মানা হার!

১০০. তুমি মম চির-পূজারিণী।
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা ঋণী।

১০১. হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকুটে ভরা
এ ভুজগে?

১০২. বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি,
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে।

১০৩. উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা নিকর।

১০৪. সর্বগ্রাসী আগুন নিবাতে
হৃদয়ে শ্রাবণ আনি নিদ্রাহীন রাতে।

১০৫. ডাকে প্রভাকর-কর, ওহে প্রভাকর-কর
প্রভাকর করের কি ভাব।

১০৬. হায়েনার হাসি যখন কাঁপাচ্ছে বন,
কালো এই দুর্যোগের রাতে
দিকে দিকে মানুষের ব্যাকুল নিঃশ্বাস;
তুমি শুধু স্থির, শান্ত, অচপল চোখ,
সুধীর নিশ্চল তব তনুর সমুদ্র।

১০৭. মনে করি করী করি, কিন্তু হয় হয়, হয় না।

১০৮. কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার।

১০৯. যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।

১১০. বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।

১১১. ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।

১১২. পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা।

১১৩. পুষ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝঙ্কৃত স্বপন।

১১৪. ও ত আলো নয় ও যে অমরার দীপ্ত আশীর্বাদ,
ঝরিতেছে নিরবধি।

১১৫. নয় নয় ও তো আষাঢ় গগনে জলদের গরজন,
দুনিয়ার যত চাপা ক্রন্দন গুমরি উঠিয়ে শোন।

১১৬. মেঘ ওততা নয়, মুক্তকেশীর
এলিয়ে পড়া চুলের রাশি!
বিদ্যুৎ কোথা? চেয়ে দেখ, ও যে
পাগলী মেয়ের অট্টহাসি।

১১৭. ঝরণার ধারা নয় ওততা নয়,
চেয়ে দেখ ভাল করে,
কার মণিহার ছিড়ে গেছে তাই
মণি রাশি পড়ে ঝরে।

১১৮. শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই,
'আয়' 'আয় কঁদিতেছে তেমনি সানাই।

১১৯. কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে।।

১২০. আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।

আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে।।

১২১. বুদ্ধের মতন যার আনন্দ সে নিত্য সহচর।

১২২. কাটছে বটেপোকায় কিন্তু
আলমারি কি সিন্দুকেই।

১২৩. কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

১২৪. মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে।

১২৫. বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ।

১২৬. শশাকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশু বারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব!

১২৭. রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?

১২৮. মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?

১২৯. কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?

১৩০. স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?

১৩১. চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।

১৩২. গ্রহ দোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী?

১৩৩. ফোটে কি কমল কভু কমল সলিলে?

১৩৪. ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার?

১৩৫. বিদ্যুতে কেবা মুঠিতে ধরিতে পারে?

১৩৬. নাহি মোর অস্ত্র মোরা তোর সমজনে
ইচ্ছা? শৃগাল সহ সিংহী কি বিরাজে?

১৩৭. কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে?

১৩৮. কোনো এক সুদূর আকাশে

ছোট ছোট তারা যদি সূর্যপ্রভ হয়,
তবে ফুলিঙ্গের মতো যত তৃপ্তি এ হৃদয়ে আসে
প্রাণের অনন্তলোকে তারা কি শাশ্বত সূর্য নয়?

১৩৯. ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ।

১৪০. মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে।

১৪১. তারার মতন স্থির, হীরকের মত শুচিস্মিত

১৪২. প্রেতের মতন এক ধূসর বিষাদ এইখানে থাকে।

১৪৩. এ হৃদয় মম
তপোভঙ্গভয়ভীত তপোবন সম।

১৪৪. কণ্টক গাড়ি কমল পদ পদতল
মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি।।

১৪৫. তারে ঘিরে সামান্য এ ভাষা
উদ্বাহু বামন সম অনন্তের স্পর্শের প্রত্যাশা।।

১৪৬. সিন্দুর বিন্দু শোভিত ললাটে
গোধূলি ললাটে আঁকা তারারত্ন যথা।

১৪৭. সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে।

১৪৮. অধর্মগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহইছে শুয়ে।

১৪৯. মোটা মোটা কালো মেঘ।
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন।

১৫০. পূর্ব দিকে আরক্তিম অরুণ প্রকাশে
পশ্চিমে দ্বিজেশ যান রোহিণীর পাশে,
সারা নিশি গেল তার নক্ষত্র সভায়,
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ সরমের দায়।

১৫১. হৃদিশয্যাতল

শুভ্র দুগ্ধফেননি।

১৫২. তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল।
তার তুল্ কোন ফুল?

১৫৩. রচিয়াছ রাজা-কবি! কাহিনী প্রিয়ার
আঁখিজল জমানো বরফ—
সমতুল মর্মর—কাগজ তুহার—
দুনিয়ার মাণিক হরফ।

১৫৪. আমরা একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর (পদ্মার) উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে অথচ দূর দিয়ে।

১৫৫. হেথা সুখ গেলে—
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্য গৃহে।।

১৫৬. পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো।

১৫৭. কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে।
'ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'

১৫৮. ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে।।

১৫৯. হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান

১৬০. আসন্ন শীতের বেলা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে।

১৬১. দূর দিগন্তে শঙ্কিত গ্রাম
ঘুমায় তিমির মুড়ি।

১৬২. সৌন্দর্য-পাথারে
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী
সে বাতাসে, কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল;

১৬৩. মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা!

১৬৪. অগ্নি সদৃশ ক্রোধে সে জ্বলছে,
নবনী সদৃশ মনটা গলছে।

১৬৫. লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।

১৬৬. কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌম আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।

১৬৭. এতক্ষণ ছায়া প্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে ঘেঁষে।

১৬৮. কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা,
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা।।

১৬৯. আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া।
আকুল পাগল-পারা।

১৭০. প্রতি অঙ্গ নিরূপম লাবণ্যের সীমা।
কোটিচন্দ্র নহে এক নখের উপমা।।

১৭১. বিষে তনু নীলরুচি আত্মা তবু শুভ্র শুচি
নীলাম্বরে পূর্ণ চন্দ্রোপম।
সহস্র ফণার মাঝে তোমার পৌরুষ রাজে
মহাবীর্য্য গরুড়ের সম।

১৭২. এতক্ষণের কান্না শেষে মায়ের কোলে শিশু
হাসি দিয়ে খুললোরে মুখ খুললো—
ফুটলো হাসি সদ্য তোলা ছোট্ট সাজিভরা
শিশির ভেজা শেফালিকাতুল্য।

১৭৩. জ্বলন অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি তেজিল তার লেহ।

১৭৪. কানু হেন গুণনিদি কারে দিয়ে যাব।

১৭৫. রমণীর রূপ-মোহে নর পোড়ে হায়,
বহ্নিমুখে প্রবেশেহ পতঙ্গের ন্যায়।

১৭৬. গদ্যজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া ভার।

১৭৭. প্রেমিকের মুখে আহা আধো আধো কথা,
অর্ধস্ফুট দলন্ত্রেলা ফুলের সদৃশ।

১৭৮. শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

১৭৯. অনল সমান পোড়ে চইতের খরা
চালুসেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা।

১৮০. ভাঙ্গিল দরদ ভুজগ-ঈশ
উগরে অনল সমান বিষ।

১৮১. মায়ার আবর্ত রচে আসায় যাওয়ার চঞ্চল সংসারে
ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ায় ভাঁটায় জোয়ারে।

১৮২. নীরেন্দ্র প্রতিম নীল নির্মল আকাশ।

১৮৩. পুরাণ বসন ভাতি অবলা জনের জাতি।

১৮৪. কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।

১৮৫. রামানন্দ তাকিয়ে আছেন।
জবাকুসুম সংকাশ সূর্যোদয়ের দিকে।

১৮৬. এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।

১৮৭. পড়ে আছে প্রাণহীন পথ,—
আদিম সৃষ্টির বুকে অতিকায় সরীসৃপবৎ।

১৮৮. সারা দেহব্যাপী তড়িতের খেলা একি দেখি অচপল।

১৮৯. ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ।।

১৯০. নাহি কালদেশ তুমি অনিমেষ মূরতি
তুমি অচপল দামিনী।

১৯১. অশনি আলোকে হেরি তারে থির-বিজলী-উজল অভিরাম।

১৯২. পথে পথে ওই গিরি নুয়ে যায়, কটাক্ষে রবি অস্তমান,
খড়্গ তাহার থির-বিদ্যুৎ ধুলিধ্বজা তার মেঘ সমান।

১৯৩. বয়ন শরদসুধানিধি নিষ্কলঙ্ক।

১৯৪. অন্য কাননে যাসনে রে চোর, নিজেকে আয় করবি চুরি,
যাকে চেয়েছিস গোপনে সে তোর বুকের আকাশে থির বিজুরী।

১৯৫. অধর পরে অধর পরশ জ্বালায় শিরা মজ্জা,
অথির বুকের স্থির সাগরে হায়রে শেষের শয্যা!

১৯৬. আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম।

১৯৭. সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারার-যথা!

১৯৮. তোমার চুলের মত কালো অন্ধকার।

১৯৯. কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ।

২০০. হাতে মসী মুখে মসী মেঘে ঢাকা শিশু শশী।

২০১. পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন।

২০২. কচি কলাপাতা সন্ধ্যা।

২০৩. সুখ অতি সহজ সরল, কাননের প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু-আননের হাসির মতন।

২০৪. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়।
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।।

২০৫. চাঁদ দেখে বার বার শুধু মনে হয়
মার কোলে ছোট শিশু হাসিখুসিময়।

২০৭. তারাই আজ নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হয়ে অন্নহারা
দেশের যত নদীর ধারা, জল না ওরা অশ্রুধারা।

২০৮. সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র বিস্মৃতি কীট কাটে।

২০৯. যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি।

২১০. জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই।

১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. শ্যামাপদ চক্রবর্তী : অলঙ্কার চন্দ্রিকা
২. জীবেন্দ্র সিংহ রায় : বাঙলা অলঙ্কার
৩. সুধীন্দ্র দেবনাথ : বাংলা কবিতার অলংকার
৪. শুদ্ধসত্ত্ব বসু : অলংকার জিজ্ঞাসা

মডিউল - ৩

ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব

মডিউল : ৩ অবতরণিকা

কোনো ভাষার হাল-হকিকত বুঝতে ব্যাকরণের যে ভূমিকা, তেমনি সাহিত্যের ব্যাকরণ হল সাহিত্যতত্ত্ব। প্রাচীন ভারতে সাহিত্যের সার্বিক অভিধা ছিল কাব্য, যা শ্রাব্য ও দৃশ্য—এই দুই প্রধান রীতিতে বিভক্ত ছিল। সুতরাং বর্তমানের সাহিত্যতত্ত্ব ও সেকালের কাব্যতত্ত্বের মধ্যে পূর্বে ভেদ ছিল না। অবশ্য সবাই যে কাব্যতত্ত্ব পড়ে কাব্য রচনা করতে বসতেন এমনটা নয়, তবে সাহিত্যের অভ্যন্তরস্থ স্বরূপকে বুঝতে সাহিত্যতত্ত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক এমনটা মনে করতেন। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব মূলত দাঁড়িয়ে আছে কাব্যবিচার প্রক্রিয়ার ওপর, যা অনেকগুলি প্রস্থান (School) বা পদ্ধতিতে বিভক্ত। এই এককটি পাঠ করলে প্রাচীন ভারতে গড়ে ওঠা সাহিত্যবিচারের সেইসব প্রস্থানগুলির মূল বক্তব্য, তাদের ক্রমিক বিবর্তন, স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য, পরিসর ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যাবে। জানতে পারা যাবে কখন, কীসের ভিত্তিতে, কাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল সাহিত্যবিচারের পদ্ধতিগুলি এবং তাদের পক্ষে যুক্তি ও বিপক্ষে প্রতিযুক্তিগুলিই বা কী ছিল। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব 'অলংকারশাস্ত্র' নামেও পরিচিত। তবে তা কাব্যের বাহ্য প্রসাধন কেবল অলংকার নয়, গুণ রীতি ধ্বনি রস বক্রোক্তি ঔচিত্য ইত্যাদি সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করেছে। প্রাচীন আলংকারিকগণ সংস্কৃতেই রচনা করেছিলেন তাঁদের তত্ত্বগ্রন্থসমূহ। তাই এই আলোচনায় মাঝে মাঝে তাঁদের বক্তব্য তাঁদের ভাষাতেই উপস্থাপন করা হয়েছে এবং একটি জটিল বিষয়কে যথাসাধ্য সহজ করে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রই ভারতীয় একমাত্র সাহিত্যদর্শন যা প্রাগাধুনিক পর্বে সাহিত্যবিচারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র যে অপরিহার্য এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

কাব্যতত্ত্বের আদিকথা :

সাহিত্য ও সাহিত্যশাস্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু। সাহিত্য বলতে স্থূল অর্থে বোঝায় কোনো সৃজনশীল রচনাকে, যেমন—কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি, যেখানে মানবানুভূতির লীলাই প্রধান। এই ধরনের সাহিত্যে বাস্তব সংসারের মানব-মানবীরা উপস্থিত থাকে, কোনো কাহিনি বা আখ্যানের আশ্রয় লেখক তাঁর জীবনদর্শন তুলে ধরেন, যার রস তথা পাঠের আনন্দ উপচিত হয়ে পাঠক চিত্তকে দ্রবীভূত করে। আর সাহিত্যশাস্ত্র হল সেই রচনাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিবিদ্যা। 'শাস্ত্র' বলতে অবশ্য স্থূল অর্থে লোকে ধর্মগ্রন্থকে বুঝে থাকে। কিন্তু যেকোনো জ্ঞানচর্চার গ্রন্থই শাস্ত্র নামে অভিহিত হতে পারে। যেমন—দর্শনশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি। এভাবেই যদি অলংকারশাস্ত্রকে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ করে যায়, তাহলে এ হল এমন এক জ্ঞানশৃঙ্খলা যার সাহায্যে সাহিত্যের স্বরূপ, গুণ-দোষ, সৌন্দর্য সৃষ্টির নানাবিধ উপকরণ ও বিভিন্ন রকমের সাহিত্য বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। 'অলংকার' শব্দটির একটি অর্থ হল গহনা, যা সৌন্দর্যবৃদ্ধির উপকরণ। কিন্তু সেই অর্থকে অতিক্রম করে এখানে শব্দটি পারিভাষিক অন্য একটি অর্থ বহন করছে। কাব্যশাস্ত্রীরা কাব্যদেহকে মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

বিভিন্ন গহনায় দেহ সজ্জিত হলে যেমন তা নান্দনিক সৌন্দর্যের আকর হয়ে ওঠে, তেমনি কাব্যদেহকে প্রসাধিত করার জন্য প্রযুক্ত হয়ে থাকে উপমা, রূপক, যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, নিদর্শনা, বিরোধাভাস, ব্যজস্তুতি প্রভৃতি প্রচুর শব্দালংকার ও অর্থালংকার। আলংকারিকরা এগুলিকে কাব্যের সৌন্দর্যবোধক ধর্ম বলে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে আচার্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ'-এ বলেন—'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান। অলংকারান প্রচক্ষতে।' আচার্য বামন কিংবা ভামহের মতো আলংকারিকরা মনে করতেন যে, কাব্য-সাহিত্যে অলংকারই হল প্রধান কথা।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব নিয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বৈদিককালের একাধিক রচনায় এর বীজ ছিল। বেদের কোনো কোনো সূক্তে চমৎকার অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে। উপমার ব্যবহার দেখা যায় ঋগ্বেদে ও সাতপথ ব্রাহ্মণে। রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য় অলংকারশাস্ত্রকে 'সপ্তম বেদাঙ্গ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। অলংকারশাস্ত্রের অলৌকিক উৎপত্তির কথা জানিয়েছেন তিনি। সর্বদেবতার প্রধান শিব নাকি প্রথম এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে। পরে ব্রহ্মা মারফৎ এ তত্ত্ব জানতে পারেন আলংকারিকরা। যদি অলৌকিক উৎসের কথা ছেড়ে লৌকিক কারণের দিকে আমরা ফিরে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, ব্যাকরণশাস্ত্র থেকেই ঘটেছিল অলংকারশাস্ত্রের উদ্ভব। শব্দ যে দ্বিবিধ বৃত্তির অধিকারী, সেই 'অভিধা' ও 'লক্ষণা'র কথা প্রথম ঘোষণা করেন বৈয়াকরণরা। অনেক পরে তৈরি হয় ব্যঞ্জনার ধারণা, যাকে আশ্রয় করে ধ্বনিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বেদের মতো পুরাণেও আছে কাব্যতত্ত্বের বীজ। অগ্নিপুরাণ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সঙ্গে কাব্যজগৎ-স্রষ্টা কবিকেও এক ভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। ওই পুরাণে বলা হয়েছে—'অপারে কাব্যসংসারে কবিরেক : প্রজাপতি। /যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেহং পরিবর্ততে।।' কবির কবিত্বের দুর্লভতা প্রথম ঘোষণা করেছে অগ্নিপুরাণই।

প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের সূচনাকার কে—এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্ত করা মুশকিল। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 'নাট্যশাস্ত্র'-প্রণেতা আচার্য ভরতই আদি আলংকারিক। আচার্য ভরত কোন সময়ে অবির্ভূত হয়েছিলেন তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন তিনি প্রথম শতকের মানুষ, আবার কারো কারো মতে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর সময় থেকে সপ্তদশ শতকের পণ্ডিত জগন্নাথ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে অনেক আলংকারিকের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের মধ্যে প্রায় ১০/১৫ জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। এঁরা 'আচার্য' নামে সম্মানিত। আচার্য ভরতের পর যিনি প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যশাস্ত্রী তিনি হলেন আচার্য ভামহ। এর আবির্ভাব সম্ভবত ষষ্ঠ শতকে। ভামহের পর একে একে আগমন ঘটে আচার্য দণ্ডী, বামন, কুণ্ডক, আনন্দবর্ধন, রাজশেখর, অভিনবগুপ্ত, মম্মট ভট্ট, বিশ্বনাথ কবিরাজ, ধনঞ্জয়, রুদ্রট, রুয্যক, ভোজরাজ, হেমচন্দ্র, ক্ষেমেন্দ্র, শারদাতনয়, ভানুদত্ত ও সর্বশেষে পণ্ডিত জগন্নাথের। ভারতের নানা অঞ্চলে এঁদের জন্ম। তবে এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব অর্জন করেছিল কাশ্মীর রাজসভা। সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন আচার্য বামন, উদ্ভটাচার্য, আচার্য আনন্দবর্ধন ও আলংকারিক রুদ্রট। প্রায় দু'হাজার বছরব্যাপী ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের চর্চা, বলা বাহুল্য, এক ভাবনাবৃত্তে আবদ্ধ ছিল না। কাব্যচিন্তার জগতে অনেক পরিবর্তন, রূপান্তর ও বৈচিত্র্যের দেখা মিলেছিল। গড়ে উঠেছিল প্রায়

৬/৭টি উল্লেখযোগ্য প্রস্থান বা সাহিত্যবিচার পদ্ধতি। এগুলি যথাক্রমে অলংকার, গুণ, রীতি, বক্রোক্তি, ধ্বনি, রস ও ঔচিত্য। আধুনিককালে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাস যাঁরা নির্মাণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক সুশীল কুমার দে অন্যতম। তিনি তাঁর 'Studies in the History of Sanskrit Poetics' (1923) গ্রন্থে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের কালগত বিভাজন নির্দেশ করেছেন, যেখানে বিবর্তনের ভিত্তিতে এই দীর্ঘ সময়পর্বটি চারটি স্তরে বিভক্ত। স্তরগুলি এইরকম :

১. গঠনমূলক স্তর—ভারত থেকে ভামহ পর্যন্ত বিস্তৃত। রসশাস্ত্রের আলোচনার মূল ভিত্তিটি গঠিত হয়েছে এই স্তরে।

২. সৃজনধর্মী স্তর—ভামহ থেকে আনন্দবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত। নতুন নতুন চিন্তা ও যুক্তি দিয়ে নানাবিধ প্রস্থানের অবতারণা করা হয়েছে এই স্তরে।

৩. নির্ণায়ক স্তর— আনন্দবর্ধন থেকে মম্মটভট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। কাব্যের আত্মা নির্ণয়ের চেষ্টা এ স্তরে অনেক সংহত হয়েছে।

৪. বৈদগ্ধ্যের স্তর—মম্মটভট্ট থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে বিচারের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় পর্যালোচনায় বৈদগ্ধ্যের অবতারণা ঘটেছে।

এছাড়া অধ্যাপক দে অলংকারশাস্ত্রের তিনটি যুগ কল্পনা করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থান ধ্বনিবাদকে মাঝখানে রেখে। এগুলি হল—ধ্বনিপূর্ব যুগ, ধ্বনিযুগ ও ধ্বনিপরবর্তী যুগ। আগেই বলা হয়েছে, ব্যাকরণশাস্ত্র থেকে শব্দের অভিধা ও লক্ষণাবৃত্তি সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা গেলেও 'ব্যঞ্জনা' তথা 'ধ্বনি' সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, যা কিনা শব্দের অভ্যন্তরস্থ এক শক্তি—যার আবেদন শুধু বুদ্ধিলোকে নয়, হৃদয়লোকেও। আচার্য ভরত কাব্যের আত্মা হিসেবে রসের উল্লেখ করলেও তার প্রাণ যে ধ্বনি সে বিষয়ে কিছু বলেননি। এমনকি অগ্নিপুরাণে অলংকার, রীতি ও রসের প্রসঙ্গ পাওয়া গেলেও ধবনির বিষয়টি অনুচ্চারিত। যাইহোক, ধ্বনি-পূর্ব যুগে ভরতেরও আগে কোনো কাব্যশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা দ্বিধাগ্রস্ত। রাজশেখর তাঁর 'কাব্য মীমাংসা'য় ভরত-পূর্ববর্তী একজন আলংকারিকের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাম নন্দিকেশ্বর। ইনি নাকি ভরতের নাট্যশিক্ষক ছিলেন এবং 'অভিনয়দর্পণ' নামে গ্রন্থ লিখেছিলেন। কিন্তু সে গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তবে এটা ঘটনা হিসেবে সত্য যে, দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ থেকে বিভিন্ন স্থানে যেসব উৎকীর্ণ অনুশাসন, লিপিমালা ও রাজপ্রশস্তি লেখা হয়েছে, সেগুলিতে অলংকৃত ও ঘন সমাসবদ্ধ ভাষারীতির দেখা মিলেছে, যা স্পষ্টত অলংকারশাস্ত্রের প্রভাবের লক্ষণ। কেউ কেউ ভরত ও ভামহের মধ্যবর্তী কালে মেধাবী ও মঙ্গল আচার্য নামে দুই আলংকারিকের আবির্ভাবের কথা জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কোনো রচনা নিদর্শন আমাদের কালে এসে পৌঁছয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতটি সামনে রেখে আমরা বর্তমান মডিউলটির বিভিন্ন এককে ধ্বনিবাদ, রসবাদ, বক্রোক্তিবাদ ইত্যাদি কাব্যতত্ত্বের প্রস্থান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব। শিক্ষার্থী এই মডিউল থেকে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের একটি প্রাথমিক ধারণা লাভ করবেন।

একক ১৫ : ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের বিভিন্ন প্রস্থান

১৫.১ পাঠের উদ্দেশ্য
১৫.২ প্রস্তাবনা
১৫.৩ মূল আলোচনা
১৫.৩.১ অলংকারপ্রস্থান
১৫.৩.২ গুণপ্রস্থান
১৫.৩.৩ রীতিপ্রস্থান
১৫.৩.৪ বক্রোক্তিপ্রস্থান
১৫.৩.৫ ধ্বনিস্থান
১৫.৩.৬ রসপ্রস্থান
১৫.৩.৭ ঔচিত্যপ্রস্থান
১৫.৪ সংক্ষিপ্তসার
১৫.৫ প্রশ্নাবলী
১৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.১ পাঠের উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের মোট সাতটি প্রস্থান তথা কাব্যবিচার পদ্ধতি বা মতবাদের কথা জানতে পারা যাবে। এগুলি যথাক্রমে অলংকারবাদ, গুণবাদ, রীতিবাদ, বক্রোক্তিবাদ, ধ্বনিবাদ, রসবাদ ও ঔচিত্যবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদ বা প্রস্থানগুলি কারা, কবে, কোন প্রেক্ষিতে নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁদের মূল কথাটি কী সে সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা করা যাবে। এই কাব্যপ্রস্থানগুলি ছিল সাহিত্যকে বিচার করার এক-একটি মানদণ্ড বা প্রণালী। সেকালের সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে তো বটেই, আধুনিক সাহিত্যকে পর্যালোচনা করার জন্যও এদের কোনো কোনোটি আজও পর্যন্ত সচল, যাদের মধ্যে অলংকারবাদ, রীতিবাদ (যা বর্তমানে শৈলী বিজ্ঞানের সঙ্গে আংশিক যুক্ত), ধ্বনিবাদ ও রসবাদ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

১৫.২ প্রস্তাবনা

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রীরা তাঁদের কাব্যানুসন্ধান শুরু করেন কাব্যের আত্মার অবস্থান নিয়ে। কাব্যের কাব্যত্ব কীসের ওপর নির্ভর করে এই ছিল তাঁদের জিজ্ঞাসা। এই প্রশ্নের সূত্র ধরে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রস্থানের আবির্ভাব। প্রস্থানসমূহের আলোচনায় যাওয়ার আগে কাব্য বস্তুটি কী একটু জেনে নেওয়া যাক। এক একজন পণ্ডিত এক একভাবে কাব্যকে সংজ্ঞায়িত করেছেন তার বাহ্য ও আভ্যন্তর স্বরূপ পর্যবেক্ষণ

করে। ফলে সবসময় মতৈক্য আশা করা যায় না। বাস্তবে তা হয়ওনি। তবে সব কিছু পর্যালোচনা করে এইরকম এক ধারণায় আসা যায় যে, ছন্দের ললিত বিন্যাসে শব্দমালা গ্রন্থিত হয়ে যখন তা চারুত্বমণ্ডিত অর্থের বিস্তার ঘটায়, তখন তা কাব্য নামে পরিচিতি লাভ করে। এ হেন কাব্যের আত্মার অনুসন্ধানযাত্রায় একেবারে সূচনাকালেই আচার্য ভরত অত্যন্ত নির্ভুলভাবে পৌঁছে গিয়েছিলেন রসবাদে। তাঁর মতে—'ন হি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদর্থ প্রবর্ততে'। কিন্তু পরবর্তীকালে দেহাত্মবাদী আলংকারিকদের আবির্ভাবে রসের গুরুত্ব চাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে ভামহ, বামন, উদ্ভট, রুদ্রট প্রমুখ কাব্যশাস্ত্রীরা বাহ্য সৌন্দর্যকেই কাব্যের সার বলে গণ্য করেছিলেন। তবে মনে রাখা জরুরি যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্র রস নিয়ে চর্চা করেছে, তেমনি অলংকারেরও প্রসঙ্গ সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি অলংকারোপম কতকগুলি লক্ষণের কথাও বলেছিলেন। পরবর্তীকালে ভামহ লক্ষণগুলিকে অলংকারের মধ্যে গ্রহণ করে অলংকারকেই করে তুললেন কাব্যবিচারের মুখ্য বিষয়। আর এর কারণে রসবাদ কয়েক শতাব্দীর মতো কাব্যশাস্ত্রীদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। বড়ো হয়ে উঠল অলংকার প্রস্থান। ভামহের কাল অতিক্রম করার পর এল দণ্ডীর যুগ। তিনি গুণপ্রস্থানের জনক বলে স্বীকৃত। এর পরের ধাপে এলেন আচার্য বামন। সূচনা করলেন রীতিপ্রস্থানের। তারপর বক্রোক্তিবাদের জন্ম। এই যে অলংকার প্রস্থান থেকে বক্রোক্তিপ্রস্থান—এই তত্ত্বগুলি ছিল নিছক কাব্যদেহের বাহ্য সৌন্দর্যের বিচার প্রক্রিয়ার অঙ্গ। কিন্তু যখন ধবনিপ্রস্থান আত্মপ্রকাশ করল, প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই কাব্যের আত্মাকে স্পর্শ করার প্রকৃত পথ খুলে গেল। সবশেষে রসবাদ বহুদিন পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং বিশেষভাবে আচার্য অভিনবগুপ্তের হাতে। এর ফল কাব্যের শিল্পসৌন্দর্য থেকে রসসৌন্দর্যের দিকে যাত্রা সার্থক হয়ে উঠল।

১৫.৩ মূল আলোচনা

১৫.৩.১ অলংকারপ্রস্থান

অলংকারপ্রস্থানের জনক হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন আচার্য ভামহ। ইনি সম্ভবত ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'কাব্যালংকার'। এতে ইনি কাব্যের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছিলেন—'শব্দার্থৌ সাহিতৌ কাব্যম্'। কেননা ইনি মনে করেছিলেন কাব্যের আত্মার অবস্থিতি শব্দার্থের মধ্যে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অর্থের বোধসম্পন্ন একজন অতি সাধারণ পাঠক প্রকৃত রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। যদি কাব্যের কাব্যত্ব অর্থের ওপর নির্ভর না করে তাহলে সে কীসের জোরে কাব্য হয়ে ওঠে? এর উত্তরে একদল আলংকারিক বললেন, সাদামাঠা ভাষায় লেখা কোনো রচনা ততবেশি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে না, যতক্ষণ না তাতে অলংকার যুক্ত হয়। ফলে 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' এই কথাটা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। অলংকার প্রস্থানের মূল ভাবনাটা এটাই।

তখন প্রশ্ন হল, অলংকার বিষয়টি কী? সংস্কৃতে 'অলম্' শব্দের অর্থ হল সৌন্দর্য। সুতরাং যার দ্বারা কাব্য সুন্দর হয়ে ওঠে সেটাই অলংকার। অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' পুস্তকে তাই লিখেছেন—'কাব্যের শব্দ ও অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজ-সজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজ-সজ্জার নাম অলংকার।' যাঁরা কেবল শব্দ আর অর্থের ওপর কাব্যের অস্তিত্বের নির্ভরতার কথা বলেছেন তাঁরা

দেহাত্মবাদী নামে খ্যাত। কিন্তু শব্দ ও তার অর্থ ছাড়া আরোও কিছু আছে যা কাব্যকে কাব্যত্ব দান করে। আচার্য বামন সেই 'আরোও কিছু'-র সন্ধান করতে গিয়ে এনেছিলেন অলংকারের কথা। তবে অলংকার বলতে তিনি যে কেবল অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি ইত্যাদিকেই বোঝাননি, তাঁর অন্য একটি সূত্র সেদিকে ইঙ্গিত করছে। সেখানে তিনি বলেছেন—'সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ'। অর্থাৎ যার মধ্যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে সেটাই তার শ্রেষ্ঠ অলংকার। যে মানবদেহ নিজে সুন্দর নয়, তাতে যতই অলংকার পরানো হোক না কেন, তার অসুন্দরতা ঘুচবে না। কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গেলে কবির পক্ষে যে যে বিষয় করণীয় সেগুলি হল দোষ পরিহার করে কেবল গুণবৃদ্ধি করা এবং শব্দ ও অর্থকেন্দ্রিক নানা অলংকার যোজনা করা। এক্ষেত্রে অলংকারগুলিই হল সৌন্দর্য সৃষ্টির উপকরণ বা beautifying instrument।

অন্যদিকে আচার্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে অলংকারকে সৌন্দর্য সৃষ্টির উপাদান না বলে বলেছেন সৌন্দর্য বিধায়ক ধর্ম বা attribute। তিনি মোট ৩৬টি অর্থালংকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। মহিমভট্টের মতে, চারুত্বই হল অলংকার। আবার বক্রোক্তি প্রস্থানের জনক কুন্তক বলেন যে, বিশেষ ভঙ্গির বাঙ্ময় প্রকাশই হল প্রকৃত অলংকার। অন্যদিকে ধ্বনিবাদীরা বাহ্যিক অলংকারের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করেছেন। অলংকার যখন নিজেই ব্যঞ্জনা হয়ে ওঠে তখনই সেই যোজিত অলংকার সার্থক। আর রসবাদীদের বক্তব্য হল, অপ্রয়োজনে অলংকার প্রয়োগ করলে তা কাব্যের ধার না হয়ে ভার হয়ে ওঠে। যখন রস নিজেই তার প্রয়োজন মতো অলংকার গড়ে তোলে তখনই তা সার্থক, নতুবা তা নিষ্প্রয়োজনীয়। আচার্য ক্ষেমেন্দ্র লিখেছিলেন 'ঔচিত্যবিচারচর্চা' নামক এক গ্রন্থ। তিনি সেখানে অলংকার প্রয়োগের ঔচিত্য বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য—অলংকারের দ্বারা যেমন কাব্যের শোভা বৃদ্ধি হয়, তেমনি যথাস্থানে ও সুপরিমিতভাবে তা প্রযুক্ত না হলে অলংকার কুৎসিত হয়ে ওঠে। যেমন গলায় হারের বদলে নূপুর, কানে দুলের বদলে হাতের বালা, নাকে নাকছাবির বদলে পায়ের আঙ্গট যদি পরানো হয় তাতে বিপর্যয় জনিত যে কৌতুক ও রুচিবিকৃতির সৃষ্টি হয় কাব্যেও তদ্রুপ। কাব্যে রসসৃষ্টির আনুকূল্য বিধান করে অলংকার যোজনা করা উচিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে অলংকার প্রস্থান গোড়ার দিকে জন্ম নিলেও এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ের আলংকারিকরা তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা বিচার করেছিলেন। তবে কেউই অলংকারের আবশ্যকতা অস্বীকার করেনি।

১৫.৩.২ গুণপ্রস্থান

আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'—এই গুণের আলোচনা প্রথম পাওয়া যায়। ওই গ্রন্থের ১৭শ অধ্যায়ে দোষ সম্পর্কে আলোচনার পর দশটি কাব্যগুণের কথা বলেছেন। এগুলি যথাক্রমে শ্লেষ, সমতা, ওজঃ, প্রসাদ, ঔদার্য, মাধুর্য, সৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, কান্তি ও সমাধি। গুণ হচ্ছে কাব্যের একটি ইতিবাচক নিত্যধর্ম। রসকে পরিপুষ্ট করতে গুণের আবশ্যকতা। একই কাজে অলংকার ব্যবহৃত হলেও দুটি একবস্তু নয়। অলংকার অনেক ক্ষেত্রে রসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু গুণ এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ভরত-পরবর্তী আলংকারিক হিসেবে ভামহ কিন্তু পূর্বোক্ত দশটি গুণের অস্তিত্বকে মেনে নেননি।

তাঁর মতে ভরত-কথিত তিনটি গুণ যথার্থ। এগুলি হল—মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ।

গুণপ্রস্থানকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা দেন আচার্য দণ্ডী। ইনি সম্ভবত সপ্তম শতকের মানুষ। তিনি তাঁর 'কাব্যাদর্শ'-এ ভরত উল্লেখিত দশটি গুণের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তবে গুণকে তিনি কেবল শব্দের সীমায় আবদ্ধ রেখেছিলেন। যে দশটি কাব্যদোষ নির্দেশ করেছিলেন ভরত, দণ্ডীর মতে প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে সেগুলি দোষ নয়। কখনো কখনো কবির প্রয়োগ কৌশলে দোষও গুণমধ্যে পরিণিত হতে পারে। 'গুণা বিপর্যয়াদোষাং'—এই ভরত বাক্য দ্বারা বোঝা যায় একসময়ে গুণকে দোষের বিপরীত বলে মনে করা হত। কিন্তু দণ্ডী গুণকে সেভাবে দেখেন না। তাঁর মতে, গুণ হল কাব্যের অস্ত্যর্থক দিক, যার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ ভরত যাকে নেতিবাচকতার মধ্য দিয়ে দেখেছিলেন, দণ্ডীর দৃষ্টিতে তা হয়ে উঠল ইতিবাচক। কিন্তু প্রশ্ন হল এই গুণসমূহের আধার কোথায়? দণ্ডীর উত্তর—'মার্গে'। মার্গ বলতে তিনি পদবিন্যাস প্রণালীকেই বুঝিয়েছেন, যাকে পরবর্তীকালে আচার্য বামন বলেছেন রীতি।

দণ্ডীর পর আবির্ভূত হয়েছিলেন বামন। সময়কাল সপ্তম শতকের শেষদিক বলে অনুমিত। তিনি যদিও রীতিবাদী নামে খ্যাত, কিন্তু সেই রীতির মূলে যে গুণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাকে সেকথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য—'রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। 'বিশেষেব গুণাত্মা।' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল রীতি। বিশিষ্ট পদরচনাকেই রীতি বলা হচ্ছে। আর সেই পদরচনার বিশিষ্টতা নির্ভর করে গুণের ওপর। এই যুক্তির তাৎপর্য হল গুণই রীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে যেহেতু গুণাত্মক পদরচনাই হল রীতি। বামন দশটি শব্দগুণের পাশাপাশি দশটি অর্থগুণও নির্দেশ করেছেন এবং গুণগুলিকে চিত্রের রেখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা কোনো চিত্রের সৌন্দর্য নির্ভর করে রেখা (ড্রয়িং)-র ওপর, আর সেই সৌন্দর্যের বৃদ্ধি ঘটায় রঙ। বামনের মতে রঙ হল কাব্যের অলংকার। তবে গুণ যতটা নিত্য, অলংকার তা নয়। আনন্দবর্ধনও গুণ এবং অলংকারকে পৃথক বলে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, এ দুইই সাহিত্যের সৌন্দর্যবর্ধক, কিন্তু গুণ যেখানে সমগ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অলংকার সেখানে সমগ্রের পরিবর্তে অংশ বিশেষের সঙ্গে যুক্ত। তিনি এক-এক রসে এক-এক প্রকার গুণের সংযুক্তির কথা বলেছেন, অর্থাৎ গুণগুলি রসের পরিস্ফুটক। যেমন রৌদ্ররস প্রকাশে ওজঃগুণ, শৃঙ্গার ও করুণরস পরিস্ফুটনে মাধুর্যগুণ এবং সব ধরনের রসসৃষ্টিতে প্রসাদগুণের ব্যবহার প্রশস্ত বলে মনে করেন।

গুণপ্রস্থান নিয়ে পরবর্তী আলংকারিকদের মধ্যে অভিনব ভাবনার পরিচয় রেখেছেন ভোজ, ক্ষেমেন্দ্র ও মম্মট ভট্ট। 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ'-এ ভোজরাজ গুণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, দশটি শব্দগুণ ও দশটি অর্থগুণ নয়, কাব্যে প্রযুক্ত হতে পারে ২৪টি শব্দগুণ ও ২৪টি অর্থগুণ। ক্ষেমেন্দ্র আবার শব্দ ও অর্থ ব্যতীত রসগুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বেশির ভাগ আলংকারিক মুখ্য গুণত্রয় হিসেবে মেনে নিয়েছেন ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্যকে। মম্মটভট্ট এই তিনটিকে স্বীকৃতিদানের পাশাপাশি এদের সঙ্গে রসের সংযুক্তি প্রসঙ্গ এনে বলেছেন, গুণ হল কাব্যের সেই উপাদান যা রসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে থেকে রসের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। বিশ্বনাথ কবিরাজও মনে করেন গুণ কাব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির কারণ। বক্রোক্তিবাদী আলংকারিক রজোনক কুন্তক গুণের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দুইই স্বীকার করেছেন এবং সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গুণের দুই প্রকার শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তাঁর মতে গুণ দুই প্রকার—

সাধারণ ও অসাধারণ। মধ্যম মার্গ অর্থাৎ সাধারণ কাব্যে তিন ধরনের সাধারণ গুণ থাকে। এগুলি হল সৌভাগ্য, লাবণ্য এবং ঔচিত্য। আর কাব্য লিখিত হয় বিচিত্র ও সুকুমার মার্গের দ্বারা সেখানে থাকে মাধুর্য, প্রসাদ ও আভিজাত্য। এইভাবে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আলংকারিকদের ভাবনায় গুণপ্রস্থান ব্যাখ্যাত ও পুষ্ট হয়েছে।

১৫.৩.৩ রীতিপ্রস্থান

আচার্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ'-এ যে মার্গের কথা বলেছিলেন, আচার্য বামন তাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন 'রীতি' নামে। তাই রীতিবাদ বা রীতিপ্রস্থানের জনক হিসেবে দেখা হয় আচার্য বামনকে। তাঁর গ্রন্থের নাম 'কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি'। ইনি অষ্টম শতকে আবির্ভূত হন বলে অনুমিত। বামন তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠসূত্রে লেখেন—'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল রীতি। রীতি কী— এর স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে পরের সূত্রে লিখেছিলেন—'বিশিষ্টা পদরচনা রীতি'। অর্থাৎ রীতি আর কিছুই নয় বিশেষভাবে পদরচনার ভঙ্গি। আর এই বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে গুণের ওপর নির্ভর করে। এজন্য অষ্টম সূত্রে বললেন—'বিশেষো গুণাত্মা'। এর থেকে এটাই দাঁড়াল যে, বামন-কথিত রীতি গুণের ওপর নির্ভরশীল। সেজন্য কেউ কেউ মনে করেন গুণ সম্পর্কিত অতিরিক্ত চিন্তাই রীতিবাদের জন্ম দিয়েছিল। তবে গুণপ্রস্থানই রীতিপ্রস্থানের শেষ কথা নয়। দেখা যাচ্ছে যে, গুণপ্রস্থানের তুলনায় রীতিপ্রস্থান অনেকটাই উন্নততর। কারণ গুণ অনুভবগম্য, তাই গুণকে সরাসরি কাব্যে দেখা যায় না। কিন্তু রীতি যেহেতু পদরচনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, তাই কাব্যে স্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য গুণের তুলনায় রীতির গুরুত্ব অনেক বেশি। রীতির কারণে বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্যে পরিণত হয়।

দণ্ডী দশটি শব্দগুণের আশ্রয়ে দুইটি মার্গ সৃষ্টির কথা বলেছিলেন। মার্গ দুটি হল বৈদর্ভী ও গৌড়ী। কিন্তু বামন দশটি শব্দগুণের সঙ্গে আরো দশটি অর্থগুণ নির্দেশ করেন। এদের সমন্বয়ে দুটি নয়, বামনের মতে, তিনটি রীতি গড়ে উঠেছিল। এরা হল—বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী। কোন কোন গুণ দ্বারা কোন কোন রীতি নির্মিত বামন তাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন— গৌড়ী রীতি গঠনে আছে ওজঃ ও কান্তি গুণ, পাঞ্চালী রীতিতে কাব্য রচনা করতে গেলে লাগে মাধুর্য ও সৌকুমার্য গুণ, আর বৈদর্ভী রীতি গড়ে উঠেছে দশটি রীতির সমবায়ে যেটি বামনের ভাষায় 'বৈদর্ভী সমগ্রগুণাঃ'। এর ফলে তিন রীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল বৈদর্ভী, যে রীতিতে কাব্য রচনা করে মহাকবি কালিদাস জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন।

বামন-পরবর্তী যুগে রীতিবাদ নিয়ে অন্যান্য আলংকারিকরাও ভেবেছেন। যেমন রুদ্রট তাঁর 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে রীতিকে গুণভিত্তিক না বলে বলেছেন এটি সমাসভিত্তিক। এছাড়া উপরোক্ত তিনটি রীতি ছাড়া তিনি এক চতুর্থ রীতির প্রচারক, সেটি হল লাট্টীয় যা গুজরাট অঞ্চলে প্রচলিত। দ্বাদশ শতকীয় আলংকারিক ভোজরাজ বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটীর সঙ্গে আরো দুটি রীতি যোগ করেছেন। এগুলি হল আবন্তী ও মাগধী রীতি। রীতিগুলির নামসূত্রেই বোঝা যাচ্ছে প্রতিটি রীতি কোনো না কোনো অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছিল। অর্থাৎ এরা ছিল প্রাদেশিক পদবিন্যাস কৌশল। এর সঙ্গে ব্যক্তি কবির ব্যক্তিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। আচার্য কুন্তক যখন রীতিবাদ সম্পর্কে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করলেন, তখন তিনি

বক্রোক্তিবাদের সাযুজ্যে রীতিকে পর্যালোচনা করলেন। তাঁর মতে, রীতি তখনই কাব্যের আত্মা যখন তা কবিস্বভাবকে যুক্ত করে। আর কবিস্বভাবই কাব্যের প্রস্থানভেদ ঘটায়---'কবিস্বভাবভেদ নিবন্ধনত্বেনকাব্যপ্রস্থানভেদঃ।' আসলে কুন্তক যেভাবে রীতির আলোচনা এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সেটা পশ্চিমি ভাবনার ব্যক্তি-রীতি বা স্টাইল বলে গণ্য হতে পারে। কবিস্বভাবভেদে এমন রীতির সংখ্যা মোট তিনটি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে রীতি প্রস্থনাকে মেনে নিয়েও চতুর্থদশ শতকের আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, রীতিসংগঠন কাব্যের দেহ হিসেবে গণ্য হতে পারে, তাকে কাব্যের আত্মা বলে বিবেচনা করা মূর্খতা।

১৫.৩.৪ বক্রোক্তিপ্রস্থান

দশম শতকের আলংকারিক আচার্য রাজানক কুন্তক বক্রোক্তিপ্রস্থানের জনক হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর গ্রন্থের নাম 'বক্রোক্তিজীবিত'। 'জীবিত' শব্দের এখানে অর্থ ধরা হয়েছে প্রাণ। অর্থাৎ কাব্যের প্রাণ বা সারবস্তু হিসেবে কুন্তক নির্দেশ করেছেন বক্রোক্তিকে। 'বক্রোক্তি' কথাটির সাধারণ অর্থ হল বাঁকা কথা। এই তাৎপর্যে বক্রোক্তি একটি শব্দালংকারারেরও নাম, যেখানে বক্তা যে অর্থে বলেন, শ্রোতা অন্য অর্থে তাকে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু বক্রোক্তিকে তার এই সংকীর্ণ কক্ষ থেকে মুক্ত করে একটি ব্যাপক অর্থে কাব্যের আত্মারূপে প্রতিষ্ঠা দিলেন কুন্তক। বক্রোক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বললেন—'বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি', অর্থাৎ বক্রোক্তি হল বিদগ্ধ ব্যক্তির ভঙ্গিময় ভণিতি-বৈচিত্র্য। তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যায় বিচিত্র অভিধার কথা তুলেছেন, যা আসলে পরিচিত কথনভঙ্গি থেকে পৃথক। বিদেশি মতে স্টাইল হল সেটাই যা প্রচলিত বাগবিন্যাস থেকে বিচ্যুত (deviated from norms)। কুন্তক তাঁর গ্রন্থের দশম বৃত্তিতে বক্রোক্তির পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করে বলেছেন, বৈদগ্ধ্য অর্থাৎ বিদগ্ধের ভাব যা কবিকর্মকৌশল বলে গণ্য তার ভঙ্গিটি কাব্যের নির্মাণকুশলতার সঙ্গে অন্বিত। তার দ্বারা যে রমনীয় ভণিতি বা উক্তি বা কথন (texture) তাকেই বিচিত্র অভিধাযুক্ত বক্রোক্তি বলে তিনি গণ্য করেছেন।

আসলে বক্রোক্তির মধ্যে আছে কাব্যের ভাষামার্গ ও প্রাণধর্ম—দুই-ই। কবি সৃষ্টির এক বিশেষ মুহূর্তে প্রতিভার বোধ দীপ্তি, কল্পনা, প্রেরণা ও ঐশ্বর্যের সারাৎসার দিয়ে কাব্যকে গড়ে তোলেন, যা হয় সাধারণ কথাবস্তু থেকে ভিন্ন। এই অভিনবত্বই পাঠককে লোকোত্তর আনন্দে আবিষ্ট করে। সুতরাং একথা বলা যায় যে অতি পরিচিত সাধারণ কথনভঙ্গি থেকে যা পৃথক এবং কবির নিজস্ব বাণীনির্মিত সেটাই হল বক্রোক্তি।

বক্রোক্তি নির্ভর করে কাব্যবাণীর বক্রতার ওপর। কুন্তক এক্ষেত্রে মোট ছয় ধরনের বক্রতার কথা বলেছেন। এগুলি হল— বর্ণবিন্যাস বক্রতা, পদপূর্বার্ধ বক্রতা, পদপরার্ধবক্রতা, বাক্যবক্রতা, প্রকরণ বক্রতা ও প্রবন্ধ বক্রতা। কবিরা এই বক্রতাগুলি ব্যবহার করেন সহৃদয় পাঠকের অন্তরে, রসজনিত আনন্দ সৃষ্টির জন্য। এই আনন্দ তাঁর ভাষায় 'অসামান্য' ও 'লোকাতিক্রান্ত'। কাব্যে বক্রতা সৃষ্টির জন্য শব্দের বিন্যাসবক্রতার ওপর জোর দিয়েছেন কুন্তক, যেটা হবে 'অন্যূনানতিরিক্তত্বমনোহারিণী' ও 'পরস্পরস্পদ্ধিত্বরমনীয়া'। অন্যান্য প্রস্থানের ক্ষেত্রে যেমন বিবিধ আলংকারিক তাঁদের মতামত দিয়েছেন

বক্রোক্তিপ্রস্থানে অন্যদের কোনো অভিমত জানা যায় না। তবে কুন্তকের কয়েক শতক পূর্বে আবির্ভূত ভামহ বলেছিলেন শব্দ ও অর্থের মিলনে যে কাব্য গড়ে ওঠে, তাদের এই মিলনটি হবে বক্র। সেখানে 'বক্র' কথাটির অর্থ ধরেছিলেন, কানে শুনে শব্দার্থে যা বোঝা যায়, তার থেকে 'আরো কিছু' বেশি। তাঁর মতে, এই কারণে প্রতিটি অর্থালংকারই বক্রোক্তি, যেহেতু সব গভীরে যেতে সাহায্য করে এবং বক্রোক্তি বিষয়ে তিনি যে মতবাদের সৃষ্টি করলেন তা পাশ্চাত্যের শৈলীবিকাশের খুব কাছাকাছি এক ধারণা বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১৫.৩.৫ ধ্বনিস্থান

'ধ্বনি' ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজিতে যাকে sound বলে, এ ধ্বনি সে ধ্বনি নয়। প্রাচ্য আলংকারিকরা এই পরিভাষার মাধ্যমে অনুভূতিগম্য এক চেতনার কথা বুঝিয়েছেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে 'ধ্বনি' বিষয়টি প্রথম আলোচিত। সেখানে ধ্বনি বলতে কানে শোনা যায় এমন শব্দকেই বলা হয়েছে ধ্বনি, যার লিখিত প্রতীক হল বর্ণ। কিন্তু কাব্যের ধ্বনি শব্দরাশি-অতিক্রান্ত এমন এক অতিরিক্ত অর্থের দ্যোতনা যাকে ধ্বনিবাদী আলংকারিকরা বলেছেন ব্যঞ্জনা। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, বৈয়াকরণরা শব্দের দ্বিবিধ শক্তি বা বৃত্তির কথা বলেছেন। এরা যথাক্রমে অভিধা ও লক্ষণা। অবশ্য গভীরে তলিয়ে বুঝলে লক্ষণা শব্দের শক্তি নয়, আসলে সেটা বাক্যেরই শক্তি। যেমন—'আকাশ' শব্দের একটি সাধারণ অর্থ আছে, যা থেকে পৃথিবীর উপরিভাগের মহাশূন্যকে বোঝায়। কিন্তু যখন বলা হয় 'খবরটি শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল', তখন আকাশ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় আকস্মিক বিপদপাত। অভিধা ও লক্ষণা ছাড়া আলংকারিকরা শব্দের আর একটি শক্তির কথা বলেছেন, সেটা তাৎপর্য শক্তি। এই শক্তির দ্বারা বাক্য একটি অখণ্ড অর্থ প্রকাশ করে। এর পরের ধাপে আসে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাশক্তির কথা, যা শব্দের নির্দিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করে বিষয়ান্তরের দিকে পাঠককে ঠেলে দেয়। এই শক্তির দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বলে ব্যঙ্গার্থ। ধ্বনিবাদী আলংকারিকরা শব্দের এই অতিরিক্ত দ্যোতনাকে কাব্যের আত্মা বলে গ্রহণ করেছেন, বলেছেন—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনি'।

ধ্বনিপ্রস্থানের প্রবক্তা হলেন আচার্য আনন্দবর্ধন। ইনি আবির্ভূত হন নবম শতকের মধ্যভাগে। তাঁর গ্রন্থের নাম 'ধ্বন্যালোক'। এ গ্রন্থে ধ্বনিবাদকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে ধ্বনিবাদের মূল কারিকা বা সূত্রগলি আনন্দবর্ধনের লেখা কি না এ নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' একটি বৃত্তিগ্রন্থ, যেখানে ধ্বনিবাদকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যাইহোক, আনন্দবর্ধনের প্রধান কৃতিত্বই এই যে, তিনি এই প্রস্থানটিকে প্রতিষ্ঠিত করে আলংকারিকদের দৃষ্টি কাব্যশরীর থেকে কাব্যের অদৃশ্য আত্মার দিকে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, অলংকার-গুণ-রীতি ইত্যাদি যথাযথভাবে কাব্যে থাকলেই কোনো রচনা যথার্থ ও উপাদেয় কাব্য হয়ে ওঠে না। তার জন্য? বিশেষ এক বস্তু। তিনি মানবদেহের তুলনা টেনে বলেছেন, রমণীদেহের লাবণ্য যেমন অবয়ব সংস্থানের অতিরিক্ত অন্য বস্তু, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গি— এ সবেরই অতিরিক্ত আরো কিছু। বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলতে গিয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত দুটি উদাহরণ পাশাপাশি

হাজির করেছেন। একটিতে সাদামাঠাভাবে বলা হয়েছে বিবাহ প্রসঙ্গে বরের কথায় কুমারীরা লজ্জাবশ৭ত হলেও পুলকোদ্গমে তাদের অন্তরের স্পৃহা সূচিত হয়। কিন্তু এই কথাটিই যখন কালিদাস কুমারসম্ভবে বললেন তখন সেটা আর কেবল সংবাদ হয়েই রইল না, হয়ে উঠল কাব্য—

'এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী।।'

কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে ধ্বনিপ্রস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রস্থানের ভাবুকরা তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের দৃষ্টিকে কাব্যের অন্তর্লোকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাব্য যে শব্দ ও তার অর্থ, অলংকার ও প্রয়োগরীতির তুলনায় স্বতন্ত্র অনুভূতিগম্য এক বস্তু, যা বুদ্ধি ও রসবোধকে সমানভাবে ধারণ করে থাকে, সেই ধারণাই প্রদান করে এই মতবাদ। ধ্বনিবাদকে মাঝখানে রেখে দুটি যুগের পরিকল্পনা করেছেন কোনো কোনো অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসকার। এ থেকে বোঝা যায় এর গুরুত্ব।

১৫.৩.৬ রসপ্রস্থান

কাব্যরসের অস্তিত্বের কথা প্রথম ঘোষণা করেন আচার্য ভরত। তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন— 'রসঃ ইতি কঃ পদার্থঃ?' উত্তর দিয়েছিলেন নিজেই— 'আস্বাদ্যত্বাৎ', অর্থাৎ যা আস্বাদ্যমান তা হল রস। 'রস্' ধাতুর অর্থ আস্বাদন করা। যদি শব্দটির লৌকিক অর্থ অন্বেষণ করা যায় তাহলে রস বলতে বোঝায় কোনো বস্তুর নির্যাস। সুতরাং হল সাহিত্যের সারবস্তু বা নির্যাস। সাধারণ বস্তুর স্বাদ গৃহীত হয় জিহ্বা দ্বারা, আর সাহিত্যবস্তুর স্বাদ গৃহীত হয় অন্তরেন্দ্রিয় তথা মন দ্বারা। সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত হল সাহিত্যরসের আস্বাদক। এই রসের আস্বাদকে কাব্যশাস্ত্রীরা তুলনা করেছেন ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে। অর্থাৎ এটি অনির্বচনীয় ও এর আনন্দ লোকোত্তর।

রসপ্রস্থানের জনক হিসেবে আচার্য ভরতকেই মান্যতা দেওয়া হয়। কারণ সাহিত্যবস্তুর ক্ষেত্রে রসের চেয়ে সত্য আর কিছু হতে পারে না। তিনি রসের চতুর্বিধ উপাদান বিষয়ে তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র'-এ আলোচনা করেছেন। এই উপাদানগুলি হল স্থায়ীভাবে, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। স্থায়ী ভাবগুলিই মূল, বাকি তিনটি রস পরিপুষ্টিতে সাহায্য করে। ভাব থেকেই হয় রসের উদয়। ভরত লিখেছেন—'ন ভাবহীনহস্তি রসঃ ন রসঃ ভাববর্জিত।' কেমন করে ভাব থেকে রস নিষ্পন্ন হয় এ বিষয়ে পরবর্তীকালের একাধিক আলংকারিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অভিনব গুপ্ত, ভট্ট লোল্লট, ভট্ট নায়ক, ভট্ট শম্বুক, মম্মট ভট্ট, ভোজরাজ, বিশ্বনাথ কবিরাজ, পণ্ডিত জগন্নাথ অন্যতম। এদের মধ্যে প্রথম চারজন রসনিষ্পত্তি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদও গড়ে তুলেছেন।

রসবাদ ভারতীয় অলংকারতত্ত্বের চূড়ান্ত সীমা। কাব্যে অন্যান্য উপকরণ থাকলেও যদি না রসের উপস্থিতি ঘটে, তাহলে তা কখনই রসিকজনের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। রস বস্তুটি আদৌ লৌকিক বস্তু নয়। ভাবটি বাহ্যজগতের হলেও তা থেকে জাত রস মানসিক বিষয় হওয়ার কারণে অলৌকিক। অভিনবগুপ্তের মতে, রস আর কিছুই নয়, নিজের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার। মানবচিত্তে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে অসংখ্য ভাবের উত্থান-পতন। সেগুলির মধ্যে মাত্র নয়টি

সর্বদেশে সর্বকালে অভিন্ন বলে বিবেচিত। এগুলিকে বলে স্থায়ী ভাব। এরা যথাক্রমে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। এরা যখন বিভাব অনুভব ও সঞ্চারীভাবের দ্বারা পুষ্টি পায় তখন যথাক্রমে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত রসে পর্যবসিত হয়। বিভাব হল সেটাই যা স্থায়ীভাব জাগাতে সাহায্য করে ও ভাব জাগ্রত হওয়ার পর তার অবলম্বন হয়ে ওঠে। যেমন, কবি যখন বলেন 'কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে', তখন কালো জল হয় ভাব জাগ্রত হওয়ার কারণ বা উদ্দীপনা। তাই এটি উদ্দীপন বিভাব। আর 'কালা' বা কৃষ্ণ হয়ে ওঠে জাগ্রত ভাবের অবলম্বন বা অবলম্বন বিভাব। তবে এই বিষয়গুলি লৌকিক জগতের হলেও যখন কাব্য কিংবা নাটকে সন্নিবেশিত হয় তখনই তা বিভাবে পরিণত হয়। মনের মধ্যে জেগে ওঠা ভাব যখন বিভিন্ন বাহ্যলক্ষণ, যেমন হাত-পা নাড়া, চোখ-মুখের নানা বিকৃতি, গার স্বরের উত্থান-পতন ইত্যাদি আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করে তখনই তা অনুভাব বলে কথিত হয়। তবে সেখানেও তাকে কাব্যে কিংবা নাটকে নিবেশিত হতে হবে। এছাড়া রসের শেষ উপাদান হিসেবে রসপ্রস্থানবাদীরা উল্লেখ করেছেন ব্যাভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের নাম। যেসব ভাব স্থির বা স্থায়ী নয়, কিন্তু স্থায়ীভাবকে রসপুষ্টি দানের জন্য আবির্ভূত হয়, কিন্তু নিজে কোনো রসে পরিণত হয় না, তাদেরকে সঞ্চারী বা ব্যাভিচরী বলে গণ্য করা হয়। এদেরকে তাই বলা হয়েছে স্থায়ীভাবের সহচর বা অনুচর। মম্মটভট্ট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ'-এ এমনভাবের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন ৩৩টি, যাদের মধ্যে নির্বেদ গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, আলস্য, দৈন্য, মোহ, ব্রীড়া, চাপল্য, আবেগ, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রসই যে কাব্যের আত্মা— এই আলংকারিক মত শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৫.৩.৭ ঔচিত্যপ্রস্থান

'ঔচিত্য' শব্দটির মূলে রয়েছে 'উচিত' কথাটি, যার অর্থ ন্যায্য বা যথার্থ বা সঠিক। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ এর আর একটি অর্থ নির্দেশ করেছেন, সেটি হল সামঞ্জস্য। প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে ঔচিত্য শব্দটি মূলত সামঞ্জস্য অর্থেই ব্যবহৃত। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সামঞ্জস্য কীসের সামঞ্জস্য? আলংকারিক ক্ষেমেন্দ্র তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, এই সামঞ্জস্য কাব্যের রসের সঙ্গে কাব্যে নিবেশিত পদ, বাক্য, অর্থ, গুণ, অলংকার, রীতি, কাল, লিঙ্গ, কারক, বচন ইত্যাদির। আচার্য ক্ষেমেন্দ্রর আবির্ভাব ঘটে একাদশ শতকের শেষদিকে কাশ্মীরে। তাঁকে ঔচিত্যপ্রস্থানের প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি যে-গ্রন্থে এই মতের প্রতিষ্ঠা দেন তার নাম 'ঔচিত্যবিচারচর্চা'। মনে রাখতে হবে যে, তাঁর আগে ঔচিত্য বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলেন ধ্বনিকার।

আসলে কাব্যের ঔচিত্য বিষয়টি এসেছে কাব্যদোষের সূত্রে। কোনো কিছুর গুণ যেমন তার উৎকর্ষের দ্যোতক, তেমনি দোষ তার অপকৃষ্টতার ঘোষক। কাব্যদোষ নিয়ে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এ। তিনি গূঢ়ার্থ, অর্থান্তর অর্থ, অর্থহীন, ভিন্নার্থ, একার্থ, বিষম, বিসন্ধি ইত্যাদি দোষের কথা বলেছিলেন, যেগুলি কাব্যে থাকলে রচনা সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে, অর্থাৎ তার রসের ঔচিত্যভঙ্গ হয়। ভামহ ভরতের উল্লেখিত ১০টি দোষের সঙ্গে আরও অতিরিক্ত ১০টি দোষকে তালিকাবদ্ধ করেন।

এছাড়া দোষবিচারে অগ্রসর হয়েছিলেন আচার্য বামন, রুদ্রট, রাজানক কুন্তক, আনন্দবর্ধণ ও মম্মটভট্ট। ক্ষেমেন্দ্র এই পরিপ্রেক্ষিতেই বললেন দোষ পরিহার করে ঔচিত্য বজায় রেখে কাব্য রচনা করা বিধেয়। কারণ—'ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্'। অবশ্য সেকালে ক্ষেমেন্দ্র যে যে বিষয়গুলির মানদণ্ডে ঔচিত্য বিচার করেছেন তা একালের পক্ষে আর প্রযোজ্য নয়। তবে ক্ষেমেন্দ্রর এই কথাটা খুবই প্রণিধানযোগ্য যে, রসও ঔচিত্যের অধীন। রসের সার নিহিত হয়ে আছে ঔচিত্যের ভিতর। ঔচিত্য বা সামঞ্জস্য রক্ষা না করে দেহে অলংকার পরিধান করলে তা যেমন হাস্যকর হয়ে ওঠে, তেমনি ঔচিত্য অনুযায়ী কাব্যের বহিরঙ্গ উপাদান যেমন শব্দ, অর্থ, অলংকার, গুণ, রীতি ও অন্তরঙ্গ উপাদান ধ্বনি, রস ইত্যাদি প্রযুক্ত হলে তা পাঠকের হৃদয়ে প্রীতি উৎপাদন করে না। ক্ষেমেন্দ্রর মতে, এই ঔচিত্য দু'ধরনের হয়ে থাকে। এদের একটি গুণৌচিত্য ও অন্যটি অলংকারৌচিত্য। বাক্য যখন রসের উপযোগী হয়ে কাব্যে প্রযুক্ত হয় তখন সেটি হয় গুণৌচিত্য, আর যখন অর্থের উপযোগী পদবিন্যাস রচিত হয় তখন সেটি হয় অলংকারৌচিত্য। 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের রচয়িতা মহিমভট্টও ঔচিত্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, কিন্তু তাদের নাম অন্য। যথাযোগ্য রসের আনুকূল্য না করে যদি ভাব, বিভাব, অনুভাব ইত্যাদি যোজিত হয় তাহলে সেটি হয় অর্থবিষয়ক অনৌচিত্য। আর যদি শব্দ ও পদবিন্যাসে ত্রুটি থাকে, তখন যে অনৌচিত্য ঘটে সেটি শব্দবিষয়ক অনৌচিত্য। আনন্দবর্ধন ঔচিত্যকে বলেছেন কবির অন্তরের অঙ্কুশ বা চাবুক, যা তাঁর রচনায় সামঞ্জস্যবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। এইভাবে সুন্দর ও রসসমৃদ্ধ কাব্যরচনায় ঔচিত্য হয়ে ওঠে কবির অন্যতম হাতিয়ার। এই প্রস্থানটি ধ্বনি বা রসপ্রস্থানের মতো হয়তো জনপ্রিয় নয়, কিন্তু এর গুরুত্ব আজও অনস্বীকার্য।

১৫.৪ সংক্ষিপ্তসার

প্রাচীন ভারতে কাব্যগ্রন্থ যেমন রচিত হয়েছিল তেমনি তাদের বিচার করার জন্য কাব্যতত্ত্বও গড়ে উঠেছিল। এই কাব্যতত্ত্ব কখনই একই মানদণ্ডে নির্মিত হয়নি। এক এক দল এক একটি দিক থেকে কাব্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উপাদান বিচার করেছে। এর ফলে সূচনাকাল থেকে পরবর্তী অনেকগুলি দশক ধরে একাদিক্রমে সাত-সাতটি প্রস্থান গড়ে উঠেছে। আচার্য ভরত থেকেই মোটামুটিভাবে কাব্যতত্ত্বের লিখিত নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে অনেকগুলি প্রস্থানের বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি মূলত রসবাদের প্রবক্তা, তবে গুণ, অলংকার, মার্গ সম্পর্কে ধারণা রাখতেন। তাঁর লেখায় ঔচিত্যবাদের পূর্বসূত্র পাওয়া যায়। কেবল ধ্বনিবাদ ও বক্রোক্তিবাদ সম্পর্কে কোনো আভাস মেলে না।

ভরত-পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আলংকারিক ছিলেন ভামহ। তিনি শব্দের সঙ্গে অর্থের সহিতত্বকেই কাব্য বলে গণ্য করেছিলেন। এজন্য তাঁকে কেউ দেহাত্মবাদী আলংকারিক বলে মনে করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি কাব্যে অলংকারের গুরুত্বের কথা প্রথম ঘোষণা করেন, যার ফলে তাঁর গ্রন্থের নাম দেন 'কাব্যালঙ্কার'। অলংকারপ্রস্থানের মূল বক্তব্য—'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ'। অর্থাৎ বাক্য যখন অলংকৃত হয়ে ওঠে তখন তা কাব্য বলে গ্রাহ্য হয়। যদিও পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, এখন অনেক কাব্য আছে যা সেই অর্থে বহিরঙ্গে প্রসাধনহীন, তবুও তা চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। এর কারণ সেসব রচনায় আছে গুণের উপস্থিতি।

গুণ হল কাব্যের ইতিবাচক একটি ধর্ম, যা দোষের বিপরীত। আচার্য ভরত দশটি গুণের কথা প্রথম বলেন। কিন্তু দণ্ডীর হাতে গুণপ্রস্থান প্রতিষ্ঠা পায়। বেশিরভাগ আলংকারিক তিনটি গুণকে বেশি মান্যতা দিয়েছেন। এগুলি হল ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্য। বামন গুণের ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করলেন রীতিপ্রস্থান। রীতি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন বিশেষ কৌশলে পদ রচনা। দণ্ডী যাকে মার্গ বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর 'কাব্যাদর্শ'-এ,বামনের হাতে পড়ে সেটাই হয়েছে 'রীতি'। বামন মূলত তিনটি রীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাঁর 'কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি'-তে। এগুলির নাম বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ও গৌড়ী। দশটি গুণের আধার হিসেবে দেখা হয় বৈদর্ভীকে, তাই রীতিসমূহের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ। পরবর্তীকালে আরও তিনটি রীতিকে সনাক্ত করেন রুদ্রট ও ভোজরাজ। এগুলি যথাক্রমে লাটী, আবন্তী ও মাগধী। কিন্তু রচনার সৌকর্য যে অঞ্চলবিশেষের লিখন রীতির ওপর নির্ভর করে না বরং কবিস্বভাবের ওপর নির্ভরশীল—একথা জানালেন বক্রোক্তিবাদী আলংকারিক কুন্তক। বক্রোক্তি বলতে বোঝায় বিদগ্ধ ব্যক্তির ভঙ্গিময় ভণিতি-বৈচিত্র্য, যা কবিকর্মকৌশলের অঙ্গ। কবিস্বভাবকে গুরুত্ব দেবার ফলে বক্রোক্তিপ্রস্থান পাশ্চাত্যের শৈলীচিন্তার কাছাকাছি পৌঁছেছে। কুন্তকের মতে তিন প্রকারের কবিস্বভাব গড়ে উঠতে পারে— সুকুমার, বিচিত্র ও মধ্যম। ইনি কাব্যের বক্রতাকে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। এই বক্রতাগুলির জন্যই কাব্যপাঠকের রসজ্ঞ হৃদয়ে রসজনিত আনন্দ অনুভূত হয়।

অলংকারপ্রস্থান থেকে বক্রোক্তিপ্রস্থান পর্যন্ত আলংকারিকদের অন্বেষণে মূলত কাব্যের বহিরঙ্গের দিকগুলি উঠে এসেছিল। ধ্বনিপ্রস্থান প্রথম নজর দিলে কাব্যের অন্দর মহলে। প্রতিটি শব্দের নির্দিষ্ট যে অর্থ আছে তাকে অতিক্রম করে যখন নতুন কোনো তাৎপর্যের দিকে সে অগ্রসর হয়, তখনই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার আবির্ভাব ঘটে। ধ্বনির সূত্রগুলি সম্ভবত অজ্ঞাতনামা কোনো ব্যক্তির রচনা, আর সেই সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করে ধ্বনিবাদকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন আনন্দবর্ধন। তিনি তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে ধ্বনির বৃত্তিভেদ ও শ্রেণিভেদ করেছেন ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্বনি হিসেবে রসধ্বনিকে নির্দেশ করেছেন। ধ্বনির মতো রসও অনুভবভেদ্য একটি বিষয়। রসের কথা প্রথম যে আলংকারিক উপস্থাপন করেন তিনি ভরত। তিনি রসের আবশ্যিক উপাদান হিসেবে স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের কথা বলেন। এগুলির সমবায়ে সৃষ্টি হয় রস। এখন রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া নিয়ে এক এক পণ্ডিত এক এক ধরনের অভিমত দিয়েছেন। এ থেকে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদের জন্ম হয়েছে। রস যে সহৃদয় সামাজিকের স্বসংবিতের আনন্দময় বর্ণনা— অভিনবগুপ্তের এই মতই চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবশেষে আবির্ভূত হয়েছে ঔচিত্যপ্রস্থান। এর প্রচারক আচার্য ক্ষেমেন্দ্র। রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে গুণ, অলংকার, রীতি বা অন্যান্য বিষয় সংযোজিত হলে তবেই কাব্য যথার্থ রসালো হয়ে ওঠে। আসলে কাব্যদোষের সূত্র ধরে ঔচিত্যের ধারণাটি আত্মপ্রদান করে এবং বিভিন্ন আলংকারিক তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ঔচিত্যের শ্রেণিনির্দেশ করে এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছেন।

১৫.৫ প্রশ্নাবলী

(ক) অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রীদের মূল অনুসন্ধান কী নিয়ে?

২. রসবাদের জনক কে? তাঁর গ্রন্থের নাম কী?

৩. রীতিপ্রস্থানের প্রবক্তার নাম কী?

৪. রসবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কারা ভূমিকা নিয়েছিলেন?

৫. আচার্য ক্ষেমেন্দ্রর বইটির নাম কী?

৬. আচার্য বামনের মতে রীতি কয়প্রকার ও কী কী?

৭. মুখ্য তিন রীতির বাইরে আর কী কী রীতি স্বীকৃতি পেয়েছিল?

৮. বক্রোক্তি প্রস্থানের প্রবক্তা কে? তাঁর গ্রন্থের নাম কী?

৯. রস কত প্রকার ও কী কী?

১০. নয়টি ভাবের নাম লেখো।

১১. ঔচিত্য কত ধরনের? তাদর নামোল্লেখ করুন।

১২. মহিমভট্টের গ্রন্থের নাম কী?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. কাব্যের সংজ্ঞা দাও।

২. 'সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ।'—মতটি কার? তিনি কেন একথা বললেন?

৩. গুণ ও অলংকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪. গুণপ্রস্থান বিষয়ে ভোজ, ক্ষেমেন্দ্র ও মম্মটভট্টের ভাবনার পরিচয় দিন।

৫. আচার্য আনন্দবর্ধন অনুসারে ধ্বনির সংজ্ঞা দিন।

৬. অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৭. রসের প্রকৃতি নির্দেশ করুন।

৮. রসের উপাদানগুলি কী কী? তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(গ) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক :

১. অলংকারবাদীদের মতানুসারে অলংকারপ্রস্থান ব্যাখ্যা করুন।

২. গুণপ্রস্থানের মূল বক্তব্য বুঝিয়ে দিন।

৩. 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'—এই বচনের সূত্রে রীতিবাদ উপস্থাপন করুন।

৪. আচার্য কুন্তক যেভাবে বক্রেক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা বিচারসহ করুন।

৫. ধ্বনিপ্রস্থানের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় করুন।

৬. রসপ্রস্থানের সম্যক পরিচয় দিন।

৭. ঔচিত্যপ্রস্থান আচার্য ক্ষেমেন্দ্র অনুসারে ব্যাখ্যা করুন।

৮. সংক্ষেপে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের বিভিন্ন প্রস্থানের পরিচয় দিন।

১৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। কাব্যতত্ত্ব বিচার— দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

২। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব— অবন্তীকুমার সান্যাল।

৩। Studies in the History of Sanskrit Poetics— Susil Kumar De.

৪। History of Sanskrit Poetics— Pandurary Vaman Kane.

একক ১৬ : অলংকারবাদ

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ অলংকারবাদের গোড়ার কথা তথা প্রস্তাবনা

১৬.৩ নানা আলংকারিকের চোখে অলংকারবাদ

১৬.৪ অনুসিদ্ধান্ত

১৬.৫ সারসংক্ষেপ

১৬.৬ প্রশ্নাবলী

১৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে কাব্যে প্রযুক্ত অলংকারের সংজ্ঞা, স্বরূপ, তার বিবর্তনের ইতিহাস ও বিভিন্ন প্রস্থানবাদীরা অলংকারকে কীভাবে বিচার করেছেন তা বুঝতে পারা যাবে এবং পরিশেষে কেন, এই মতবাদটি গুরুত্ব হারাল তাও বোঝা যাবে।

১৬.২ অলংকারবাদের গোড়ার কথা তথা প্রস্তাবনা

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্থান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এই অলংকারবাদ। এই প্রস্থানের বীজ কিন্তু লুকিয়ে ছিল 'নাট্যশাস্ত্র'-র মধ্যেই। প্রথমে কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন যে, কাব্যের আত্মা অবস্থান করে শব্দার্থের ভিতরে। যেমনটা ভেবেছিলেন 'কাব্যালংকার' গ্রন্থের লেখক ভামহ। যে কারণে তিনি কাব্যের সংজ্ঞা দিতে য়ে বলেছিলেন—'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'। অর্থাৎ শব্দ আর তার অর্থ মিলেই কাব্য নির্মিত হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল নিছক অর্থবোধসম্পন্ন সাধারণ পাঠক প্রকৃত কাব্যাস্বাদন থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। আমরা প্রতিনিয়ত যেসব কেজো কথাবার্তা বলি তাতে শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ই ঘটে, কিন্তু আমাদের কাছে তো কাব্য হয়ে ওঠে না, কিংবা নিয়ে আসে না এমন কোনো নান্দনিক আবেদন, যার দরুন তা আমাদের মনে দাগ কাটতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে, শব্দ আর অর্থ থাকলেই তা কাব্য হয়ে ওঠে না, বরং কাব্য রূপে পরিগণিত হতে গেলে এদের সঙ্গে অন্য কোনো আবশ্যিক উপাদান থাকা জরুরি। সেই উপকরণকে অনুসন্ধান করে বের করলেন একদল কাব্যতত্ত্ববিদ, যার তাঁরা নাম দিলেন অলংকার। বস্তুত কাব্যালংকার হল এমন একটি প্রসাধন দ্রব্য (beautifying element), যা ধারণে মানবদেহের মতো কাব্যদেহও সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। এই মতবাদীরা তাই বললেন—'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ।' অর্থাৎ অলংকার সংযুক্তির ফলেই সাধারণ শব্দ ও অর্থ কাব্য হয়ে ওঠে। এ থেকে সৃষ্টি হল এক প্রস্থানের, যার নাম অলংকার প্রস্থান।

এখন প্রশ্ন হল 'অলংকার' কথাটা কোথা থেকে এসেছে? যদি এর ব্যুৎপত্তির সন্ধান নেওয়া যায় তাহলে আমরা পাব এই বিন্যাসটি : অলম্ + √কৃ + অ (খঞ্)—ভা। এখানে অলম্ শব্দের অর্থ হল খণ্ডন বা ভূষণ—সাদা বাংলায় গহনা। সুতরাং দেহসজ্জোপকরণই হল অলংকার। অগ্নিপুরাণ এই অর্থেই অলংকারের গুরুত্ব নির্ধারণ করতে চেয়েছে। পুরাণকার বলছেন— 'অর্থালংকাররহিতা বিধবেব সরস্বতী।' অর্থাৎ যে কাব্যে অর্থালংকার নেই সে বিধবার মতো প্রসাধনহীন, তাই অনাকর্ষণীয়। সুতরাং একথা থেকে অনুমান করা যায়, কাব্যকে গ্রহণীয়, আকর্ষক, সৌন্দর্যবিশিষ্ট করে তুলতে গেলে চাই অলংকার। আচার্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ'-এ তাই তো বলেছেন—'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে।' অর্থাৎ অলংকার হল কাব্যের শোভা বৃদ্ধির একটি ধর্ম। শব্দার্থময় যে কাব্যশরীর গঠন করেন কবিরা তাকে সুন্দর করে তোলেন নানাবিধ অলংকারে সাজিয়ে। এই অলংকার দুভাবে সাজাতে পারে কাব্যকে। কাব্য যেহেতু শব্দনির্মিত, সুতরাং কাব্যের বাহ্য শরীর হিসেবে অসংখ্য শব্দই সাদা চোখে দৃশ্যমান। এই দৃশ্যমান শব্দের অন্দরে নিহিত থাকে অর্থ, যা তার প্রাণশক্তির ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং সেই অভ্যন্তরস্থ শক্তিকেও সাজানোর কথা ভেবেছেন আলংকারিকরা। এতে শব্দালংকারের পাশাপাশি আবির্ভূত হয়েছে অর্থালংকারও। এই দুই ধরনের অলংকারই কাব্যের প্রসাধনী রূপে বিবেচিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে একেবারেই অবান্তর হবে না রবীন্দ্রনাথের অভিমত। সাহিত্যে অলংকারের প্রয়োগকে কী চোখে দেখতেন তিনি তা ধরা আছে তাঁর লেখার একাধিক স্থানে। এখানে বাছাই দুটি অংশের উল্লেখ করা যেতে পারে। এর প্রথমটির উৎস তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ, যেখানে তিনি অলংকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন : 'অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা— তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়; বাঁধা চেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষার অলংকার, কণ্ঠের সুরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে। সেই বাণীর সংকেত ঝঙ্কারে বাজতে থাকে 'অলম্'—অর্থাৎ 'ব্যস, আর কাজ নেই।' এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।' আর দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি রাখা যেতে পারে অলংকারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে, অন্তত যেভাবে রবীন্দ্রনাথ নিজে বুঝতেন। 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের একস্থানে তিনি লিখছেন : ''যা যুক্তিগম্য তাকে প্রমাণ করতে হয়, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করতে চাই। যা প্রমাণযোগ্য তাকে প্রমাণ করা সহজ, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করা সহজ নয়। 'খুশি হয়েছি' এই কথাটা বোঝাতে লাগে সুর, লাগে ভাবভঙ্গি। এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর করে মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসর ঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। কথার শিল্প তার ছন্দে, ধ্বনির সংগীতে, বাণীর বিন্যাসে ও বাছাই কাজে।" এই দুই রবীন্দ্র-বাণী থেকে কী বোঝা গেল? বোঝা গেল যে, পাঠকের মধ্যে সৌন্দর্যের বোধ, রসের বোধ জাগিয়ে তুলতে গেলে অলংকার হল অন্যতম কৌশল। সাহিত্য মানুষের আনন্দময় সত্তারই প্রকাশ। সে হল কথার শিল্প। সেই শিল্পের মধ্যে নান্দনিকতা ফুটিয়ে তুলতে গেলে চাই অলংকার।

১৬.৩ নানা আলংকারিকের চোখে অলংকারবাদ

যদিও আচার্য ভামহকেই অলংকারপ্রস্থানের মুখ্য প্রবক্তার মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে, তবুও তাঁর চার-পাঁচ শতক আগে অলংকার-ভাবনার সূচনা করেছিলেন আচার্য ভরত। 'নাট্যশাস্ত্র'-এর সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন কাব্যলক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি অলংকারের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলন লক্ষণগুলিকে। কেননা তিনি মনে করতেন, কাব্যদেহের বাইরের বস্তু হচ্ছে অলংকার, আর লক্ষণটি হচ্ছে অন্তরের। অলংকার ও লক্ষণ দুই-ই কাব্যের শোভা বৃদ্ধিতে ভূমিকা নেয় বটে, তবে লক্ষণ যতটা স্বতন্ত্র ও অপৃথকসিদ্ধ অলংকার তেমন নয়। তবুও তাঁর লেখায় স্বীকৃতি পেয়েছিল অলংকারের গুণবত্তা এবং তাঁর সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত চারটি অলংকারের কথা উল্লেখ করেছিলেন এভাবে—

উপমা দীপকং চৈব রূপকং যমকং তথা।
কাব্যসৈতে হ্যলঙ্কারশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।।

অর্থাৎ কাব্যে চার প্রকারের অলংকার প্রযুক্ত হয়। এগুলি হল— উপমা, দীপক, রূপক ও যমক। এদের মধ্যে উপমাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। উপমা কথাটির সাধারণ অর্থ হল তুলনা। দুই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে ভেদ না দেখিয়ে তাদের কোনো সাধারণ ধর্মের ওপর নির্ভর করে এই তুলনা টানা হয়। যে কারণে গার্গ্য উপমার সংজ্ঞা দিতে বলেছিলেন—'যৎ অতৎ তৎ সদৃশম্ ইতি'। অর্থাৎ যে বস্তু সে বস্তুটি নয়, কিন্তু অনেকটা তার মতো। যেমন—মুখ ও চাঁদ আলাদা বস্তু। সৌন্দর্য নামক সাধারণ ধর্মের সূত্রে তুলনা করে বলা হয় চাঁদের মতো মুখ। সেকালে উপমাকে পাঁচভাগে ভাগ করা হত। এগুলি যথাক্রমে প্রসন্ন, নিন্দা, কল্পিত, সদৃশী ও ঈষৎসদৃশী। বর্তমানে উপমা চারভাগে বিভক্ত— পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা প্রতিবস্তূপমা।

আচার্য-ভরতের পর উল্লেখযোগ্য আলংকারিক হলেন আচার্য ভামহ। কাব্য বলতে ইনি বুঝতেন শব্দ ও অর্থের যোগ্য সমন্বয়। কিন্তু সেই কাব্যদেহ সুন্দর হয়ে ওঠে অলংকারের ছোঁয়ায়। ইনি যে মুখ্যত অলংকারবাদী সেটা তাঁর গ্রন্থের নামেই পরিস্ফুট। তাঁর বইয়ের নাম 'কাব্যালঙ্কার', যেখানে মুখ্য স্থান জুড়ে আছে অলংকার। ইনি কাব্যের দেহ গঠিত হয় যে শব্দ দিয়ে তাকে সাজানোর জন্য যেমন শব্দালংকার নিয়ে আলোচনা করেছেন, তেমনি সেই শরীর মধ্যস্থ প্রাণ হিসেবে অর্থকে অলংকৃত করার পদ্ধতি বিষয়ে অর্থালংকার নিয়েও আলোচনা করেছেন। কাব্যদেহ ও নারীদেহ তাঁর দৃষ্টিতে যেন সমতুল। নারীদেহের লাবণ্য তার সহজাত, কিন্তু সেই দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আরও বেশি মোহময়, আকর্ষণীয়, পরিপূর্ণ ও ঐশ্বর্যশালী করে তোলে স্বর্ণকার-নির্মিত অলংকার। ঠিক তেমনি শব্দ ও অর্থ, যা কিনা কাব্যের দেহ ও প্রাণ, তাদেরকে চমৎকারভাবে সজ্জিত করে পূর্বে উল্লেখিত দুই অলংকার। এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে ভামহ লিখেছেন—'ন কান্তমণি নির্ভূষং বিভাতি বণিতাননম্।' এর অর্থ হল— স্বামীর কাছে পত্নী প্রিয়, কিন্তু সেই স্বামীও বণিতার মুখের দিকে তেমন দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, যদি পত্নী ভূষণহীন থাকে। তবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি হল—'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ।' অর্থাৎ অলংকার মানেই বক্রোক্তি। অবশ্য এই বক্রোক্তি বলতে তিনি শব্দালংকারের বিশিষ্ট ভাগ বক্রোক্তির কথা বলেননি, বলেছিলেন বাঁকা বা তির্যক উক্তির কথা। কেননা প্রত্যেকটি অলংকারই, সে শব্দালংকারই হোক কিংবা অর্থালংকার, কিছু না

কিছু নতুন ভাবের আভাস দেয়, যুক্ত করে অতিরিক্ত অর্থদ্যোতনা। এই বক্রোক্তি না থাকলে কাব্যের কাব্যত্ব বজায় থাকে না এবং বিভিন্ন অলংকারে এই বক্রোক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্রতার সন্ধান দেয়।

এবার আচার্য দণ্ডীর কথায় আসা যাক। ইনি গুণবাদী হিসেবে খ্যাত, যে গুণের কথা আচার্য ভরত অনেক আগেই উল্লেখ করে গেছেন এবং শ্লেষ, সমতা, মাধুর্য, ওজঃ, ঔদার্য, সৌকুমার্য, প্রসাদ ইত্যাদি দশটি ভাগে বিভক্ত। দণ্ডীর গ্রন্থের নাম 'কাব্যাদর্শ'। বইটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি অলংকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইনিও ভামহের মতোই মনে করতেন, সব অলংকারের মধ্যে একটা-না-একটা অতিশয়োক্তির ভাব থাকে। এঁর দৃষ্টিতে অলংকার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। সেগুলি হল— যথাক্রমে বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তি। যেহেতু সব অলংকারেই বক্তব্যকে একটু বাড়িয়ে বলতে হয়, তাই অতিশয়োক্তিও একধরনের বক্রোক্তি ছাড়া কিছুই নয়। কাব্যের সৌন্দর্যবিধায়ক ধর্ম আবশ্যিকভাবে নিহিত থাকে অলংকারের মধ্যে। তবে উৎকৃষ্ট কাব্য অলংকারের দ্বারা সমৃদ্ধ হলেও দণ্ডী অলংকারের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন গুণ এবং মার্গকে। গুণ বলতে দণ্ডী বুঝতেন ভাষার কাব্যিক উৎকর্ষকে, আর মার্গ পরে আচার্য বামনের হাতে পড়ে হয়েছে রীতি— যা আঞ্চলিক ভাষাদর্শের চিহ্ন বহন করে। দণ্ডী অলংকারের মধ্যে উপমাকে স্বীকার করেছেন এবং তার দুটি শ্রেণি নির্দেশ করেছেন। এর প্রথমটি হল ধর্মোপমা ও দ্বিতীয়টি হল বস্তূপমা। এছাড়া শব্দালংকার ও অর্থালংকারের মধ্যে স্বীকার করেছেন দ্বিতীয়টির উৎকর্ষ।

দণ্ডীর পর অলংকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মত ব্যক্ত করেছিলেন 'কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি'-র লেখক আচার্য বামন। ইনি মূলত রীতিবাদী, অলংকারবাদী নন। অথচ অলংকার বিষয়ে এঁর মন্তব্য সবারই খুব স্মৃতিধার্য হয়ে আছে। 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ'—এটা বামনেরই উক্তি, যা এই প্রস্থানের শিরোভূষণ বলে বিবেচিত। অলংকার পরিহিত হলেই সাধারণ বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে— একথা বুঝিয়ে দেয় অলংকারবাদীরা আর সব ছেড়ে অলংকারকে কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন। ভামহ যেখানে স্বাভাবিক লাবণ্যকে বর্ধিত করার জন্য অলংকারের আবশ্যকতার কথা বলেন, বামন সেখানে কাব্যের অঙ্গীভূত লাবণ্যকেই বলেন অলংকার। এই লাবণ্যই কাব্যের প্রকৃত সৌন্দর্য। যদি কোনো কারণে লাবণ্যের অভাব ঘটে, তাহলে কোনো অলংকারই কাব্যদেহের শোভাবর্ধন করতে পারে না। এইজন্য অলংকার বিষয়ে বামনের চূড়ান্ত মত হল—'সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ।' অর্থাৎ সৌন্দর্যই অলংকার। যদি শরীরে স্বাভাবসৌন্দর্য না থাকে, তাহলে সে দেহে প্রচুর পরিমাণ অলংকার যোজনা করলেই কি তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে? যদি তা হত তাহলে তো কোনো লোলচর্মা বৃদ্ধাকে অলংকারে সুসজ্জিত করে তুললেই তিনি কোনো লাবণ্যযুক্তা যৌবনবতী নারীর সঙ্গে একাসনে বসতে পারতেন। তা যে হয় না তার কারণ এই লাবণ্যের অভাব। পরবর্তীকালে 'ধ্বন্যালোক'এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন আচার্য আনন্দবর্ধন। বলেছেন—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্তুস্তি বাণীষু মহাকবিনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যম্ ইবাঙ্গনাসু।।

এর অর্থ : মহাকবিদের বাণীতে এমন কিছু বাচ্যাতিরিক্ত বস্তু থাকে যার দরুন তা সহনীয়তা লাভ করে। এই বস্তুটি নারীদেহের অবয়ব-অতিরিক্ত লাবণ্যের মতো, যা দেহসংস্থানকে অতিক্রম করে অনির্বচনীয় রূপে বিরাজ করে। বামন যেহেতু রীতিবাদী ছিলেন, তাই তিনি মনে করতেন এই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য বা লাবণ্য

কাব্যদেহে সঞ্চারিত হয়ে থাকে রীতির সাহায্যে। এই কারণে তিনি রীতিকে বলেছিলেন কাব্যের আত্মা। রীতির নিচে তিনি ঠাঁই দিয়েছিলেন গুণকে, যা নাকি কাব্যশোভাবর্দ্ধক। গুণের পর তাঁর কাছে স্বীকৃতি পেয়েছিল অলংকার। তিনি মনে করতেন অলংকারের কাজ হল গুণের শোভাবৃদ্ধি করা। তাই কাব্যবিচারে বামনের দৃষ্টিতে গুণগুলিই নিত্যধর্ম, আর অলংকারগুলি অনিত্য।

রীতিবাদের পর জন্ম নেয় বক্রোক্তিবাদ। এর জনক আচার্য কুন্তক। কুন্তকের গ্রন্থের নাম 'বক্রোক্তিজীবিত'। কুন্তক মনে করতেন কাব্যের প্রাণ লুকিয়ে আছে বক্রোক্তির মধ্যে। অবশ্য বক্রোক্তি বলতে শব্দালংকার হিসেবে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ বক্তা এক অর্থে বলবে ও তাকে শ্রোতা অন্য অর্থে গ্রহণ করবে, সেটাকে বোঝাননি কুন্তক। তাঁর মতে বক্রোক্তি হল 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি', অর্থাৎ রসিকোচিতভাবে বলবার ভঙ্গি। এই ভঙ্গির সঙ্গে যদি অলংকার যুক্ত হয়, তবেই তা সার্থক, নচেৎ সে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, কিংবা বাহ্যবস্তু। সুতরাং অলংকারকে যথার্থ অলংকার হয়ে উঠতে গেলে কাব্যিক বক্রতার সঙ্গে তাকে সংযুক্ত হতেই হবে। সেজন্য কুন্তক সংকীর্ণ অর্থে অলংকারকে গ্রহণই করেননি। তাঁর অভিমতটি ছিল এইরকম :

বৈচিত্রম্ অলংকার : ইতি অলঙ্কারস্য সামান্য লক্ষণম্।
বৈচিত্রং চ ভঙ্গিবিশেষঃ প্রতীতিসাক্ষিকঃ।।

অর্থাৎ বৈচিত্র্য অলংকারের সাধারণ লক্ষণ, আর ভঙ্গিবিশেষের বৈচিত্র অনুভববেদ্য। সুতরাং আগে যেটা ছিল কাব্যশরীরের ভূষণ, কুন্তকের দৃষ্টিতে সেটাই পরিণিত হল রসিকোচিত ভঙ্গিতে বলা কোনো উক্তি। তিনি একই সঙ্গে এটাও বলেছেন যে, শব্দ ও অর্থের মিলনে যেহেতু কাব্য জন্ম নেয়, সুতরাং তাই এ দুটো অলংকার্য। এ বিষয়ে তাঁর নিদান :

উভাবেতাবলঙ্কার্যৌ ভয়োঃ পুনরলঙ্কৃতি।
বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে।।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে বক্রোক্তিবাদের পর আবির্ভূত হয় ধ্বনিবাদ। এই প্রস্থানের প্রবর্তক হিসেবে ধরা হয় আচার্য আনন্দবর্ধনকে। ইনি ধ্বনিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে লিখেছিলেন 'ধ্বন্যালোক' নামে এক বিখ্যাত গ্রন্থ। সেখানে তিনি কাব্যের আত্মা হিসেবে ধ্বনিকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। এঁর বিখ্যাত উক্তি—'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য'। এখন প্রশ্ন হল ধ্বনি কী? তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আনন্দবর্ধন লিখছেন :

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থম্ উপসর্জনীকৃত-স্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃকথিতঃ।।

অর্থাৎ যেখানে কাব্যের অর্থ বা শব্দ নিজেকে অপ্রধান করে প্রতীয়মান অর্থকে ব্যঞ্জিত করে, সেখানে সে ব্যঙ্গার্থরূপ কাব্যবিশেষকে পণ্ডিতরা ধ্বনি বলে অভিহিত করেছেন। বোঝা যাচ্ছে যে, এই ধ্বনি হল বাচ্যের বা শব্দের সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত এক ব্যঞ্জনা, যা কেবল বুদ্ধির দ্বারাই অধিগম্য। আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোক'-এ অলংকারকে সেভাবেই দেখেছেন। অলংকার যদি কেবল কাব্যের বহিরঙ্গের শোভাবর্ধক হয়ে থাকে তাহলে তার কোনো গৌরব নেই। এমনকি এ ধরনের অলংকার কাব্যে কাঙ্ক্ষিতও নয়। তাহলে প্রত্যাশিত কী? না, যে অলংকার কাব্যের বহিরঙ্গের শোভাকর ধর্ম না হয়ে অন্তরের লাবণ্য বৃদ্ধি করবে, সেটাই কাব্যের পক্ষে উপযুক্ত। তখন সে আর শুধু অলংকার থাকে না, হয়ে ওঠে অলংকারধ্বনি। সোজা

কথায়, অলংকার কেবল বাহ্যভূষণ না হয়ে যখন অর্থবহ ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত হয়, তখনই সে পরিণত হয় অলংকারধ্বনিতে। আনন্দবর্ধন এই ধ্বনিকে সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির একটি বিশেষ বিভাগ রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ধ্বনিবাদীদের আগে এমন মর্যাদায় অলংকারকে আর কেউ অভিষিক্ত করেননি। এইজন্য অলংকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোহলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ।।

অস্যার্থ ঃ রস কর্তৃক আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হলে যার সৃষ্টি সম্ভব, রসের সঙ্গে অভিন্ন প্রযত্নে যা সম্পন্ন হয়, তাই ধ্বনিপ্রস্থানে অলংকার বলে স্বীকৃত। 'রস' শব্দের দ্বারা আনন্দবর্ধন এখানে রসধ্বনির কথাই বলেছেন, যা তাঁর মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্বনি। এই রসধ্বনি সৃষ্টির প্রয়োজনে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আসবে অলংকার, নচেৎ তা হবে মূল্যহীন ও কাব্যদেহের পক্ষে ভারস্বরূপ।

ভামহের মতো বিশুদ্ধ অলংকারবাদী ছিলেন রুদ্রট ও রুয্যক। এঁরা অলংকারকেই কাব্যের সর্বস্ব বলে মনে করতেন। অলংকার ব্যতীত কাব্য যে আদৌ কাব্যপদবাচ্য নয়, এমন অভিমতই প্রকাশ করেছেন এরা। রুদ্রট তাঁর গ্রন্থের নাম দেন 'কাব্যালংকার', যেখানে সমস্ত অলংকারকে তিনি চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল— বাস্তব, ঔপম্য, অশিয় ও অর্থশ্লেষ। তবে অর্থশ্লেষের পাশাপাশি শব্দশ্লেষও তাঁর পরিগণনায় ছিল। একইভাবে বক্রোক্তির মধ্যে বিভাজন করেছিলেন দুইভাগে—শ্লেষ বক্রোক্তি ও কাকু বক্রোক্তি। মনে রাখতে হবে, রুদ্রট যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, ততদিনে গুণবাদ ও রীতিবাদ তো বটেই বক্রোক্তি ও ধ্বনিবাদও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রুদ্রট এসবই পরিহার করে অলংকারকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং তাঁর সমকালে প্রচলিত কিছু অলংকারকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। রুদ্রটের পর আরো বিস্তৃতভাবে অলংকার নিয়ে আলোচনা করেন রুয্যক। এঁর গ্রন্থের নাম 'অলংকারসর্বস্ব'। শব্দালংকার ছাড়া ৭৫টি অর্থালংকার নিয়ে রুয্যক আলোচনা করে অলংকারবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

অলংকারপ্রস্থান বিষয়ে আরও চারজন বিশিষ্ট আলংকারিকের বক্তব্য জানা প্রয়োজন। এরা হলেন 'কাব্যপ্রকাশ'-কার মম্মটভট্ট, 'অভিনব-ভারতী'-র লেখক অভিনবগুপ্ত, 'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং 'ঔচিত্যবিচারচর্চা'-র গ্রন্থকার ক্ষেমেন্দ্র। কাব্যের বহিরঙ্গ প্রসাধনের জন্য অলংকার আবশ্যিক—একথা স্বীকার করেন মম্মটভট্ট। তবে সেই অলংকার যে সবসময় স্ফুটাবস্থায় থাকতে হবে, এমনটা নয়। অস্ফুটভাবে থাকলেও কাব্যত্ব কখনো ক্ষুণ্ণ করেন না। তাঁর মতে, কাব্যের আত্মা হল রস। রসের সঙ্গে যে অলংকার আনুকূল্য রক্ষা করে যোজিত হয়, সেই অলংকারই সার্থক। একটা উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যটি বোঝানো যেতে পারে। সজীব দেহে অলংকার পরলে তা দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু দেহটি প্রাণহীন হলে বহুগুণ অলংকার যোজনাতেও তার কোনো সৌন্দর্যবৃদ্ধি ঘটে না। অর্থাৎ রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই অলংকার প্রযুক্ত হওয়া উচিত, নচেৎ অলংকার সর্বথা বর্জনীয়। রসপ্রস্থানের সমর্থক বিশ্বনাথ কবিরাজও। তিনি কাব্যে অলংকারের অস্তিত্ব ও প্রয়োগের গুরুত্ব অস্বীকার করেন না, কিন্তু তা প্রযুক্ত হওয়া উচিত রসের পুষ্টিবিধানের জন্যই। যেমন রাজপুরুষগণ যেসব অলংকার ধারণ করেন সেটা তাঁদের বীরত্ব, আভিজাত্য ও শৌর্য প্রকাশক। অন্য কোনো ব্যক্তিকে এমন অলংকার পরালেই সে রাজপুরুষ

হয়ে যাবে না। সে রাজপুরুষ হয়ে যাবে না। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায়, অলংকার রসের তুলনায় গৌণ এবং রস অনুযায়ী অলংকার প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এই ঔচিত্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন ঔচিত্যবাদী আচার্য ক্ষেমেন্দ্র। কাব্যের সৌন্দর্যবৃদ্ধির প্রয়োজনে কোথাও কোনোরকম ঔচিত্যের হাসি না ঘটিয়ে যে অলংকার যেখানে প্রযোজ্য তাকে তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং যে অলংকার রসের প্রতিবন্ধক, তিনি তা বর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন।

১৬.৪ অনুসিদ্ধান্ত

দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে সৃজনধর্মী স্তরের সূচনাভাগে অলংকার প্রস্থানের আবির্ভাব ঘটেছিল। সাধারণ বাচনিকতা থেকে কাব্যিক ভাষা যে স্বতন্ত্র এটা উপলব্ধি করেছিলেন কাব্যশাস্ত্রীরা এবং এই স্বাতন্ত্র্য গড়ে দেয় যে উপাদান অর্থাৎ অলংকার, তাকে তাঁরা কাব্যের সৌন্দর্য বিধায়ক ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তবে কেউ কেউ এই উপাদানটিকে বলেছেন অনিত্য, আর শব্দ ও অর্থের দশটি গুণকে বলেছেন নিত্য। যখন পরবর্তীকালে রসের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, তখন অলংকারের প্রয়োগ রসনির্ভর বলে নির্দেশ করা হল। তবে কাব্য রচনায় অলংকারের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব দু'একজন ব্যতীত প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ'—বচনটি যদিও বামনের, কিন্তু এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, রুদ্রট, রুয্যক প্রমুখ আলংকারিকরা। মহাকবি কালিদাসের যে কবিখ্যাতি সে তো উপমা নামক অলংকারের চাকচিক্য ও প্রভূত ব্যবহারের কারণে। এই উপমা হল সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের আদিভিত্তি। যাঁরা বলেন 'উপমা কালিদাসস্য', তাঁরা আসলে অলংকারবাদের দিক থেকে কালিদাসের বিচার করে কবিশ্রেষ্ঠর শিরোপা দেন—যদিও রসের ক্ষেত্রেও তিনি কেবল রাজা নন, রাজাধিরাজ। অলংকারবাদ গোড়ায় প্রাধান্য বিস্তার করলেও পরে অন্যান্য প্রস্থানের আবির্ভাবে এর গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং রসবাদের সার্বিক প্রতিষ্ঠার পর অলংকার যতক্ষণ রসের অনুকূল ততক্ষণ তার প্রয়োজনয়তা স্বীকৃতি পায়। এর বিরুদ্ধ মতবাদীরা এটাও দেখেছেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে যাতে কোনো অলংকার সন্নিবেশিত নেই, অথচ তা রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। এ থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন অলংকৃত না হলেও কোনো রচনা কাব্যরূপে গ্রাহ্য হতে পারে। সুতরাং 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ'—এই বচন অযথার্থ। বরং তার পরিবর্তে মেনে নেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত যে, রসকে পুষ্ট ও শোভনীয় করার জন্যই অলংকার। যদি তা না করতে পারে তাহলে বাইরে থেকে আরোপিত গহনা কাব্যের আত্মার পক্ষে ভাবস্বরূপ—যা পরিত্যক্ত হলেই তার পক্ষে মঙ্গল।

১৬.৫ সারসংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থান হল অলংকারবাদ। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল, অলংকার ব্যতীত কোনো রচনা সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না। মানবদেহে অলংকার তথা ভূষণ যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমনি কাব্যশরীরের চাকচিক্য বৃদ্ধিতে সহায়ক অলংকার। শব্দ ও অর্থ মিলেই

যেহেতু সাহিত্য, তাই অলংকার মূলত দুই প্রকারের— শব্দালংকার ও অর্থালংকার। শব্দালংকারের মধ্যে পড়ে অনুপ্রাস্, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদি অলংকারগুলি যা মূলত শব্দের ওপর নির্ভরশীল। এদেরও আবার কিছু কিছু করে উপবিভাগও আছে। অন্যদিকে অর্থালংকার মূলত তিনভাগে বিভক্ত। এগুলি যথাক্রমে— সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক ও গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক নামে কথিত। এছাড়া ন্যায়মূলক ও সংকর অলংকারের কথাও কেউ কেউ বলেছেন। সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে রয়েছে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, ভ্রান্তিমান, সন্দেহ, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, প্রতিবস্তূপমা, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, দীপক ইত্যাদি অলংকার। বিরোধমূলক অলংকারগুলি হল বিরোধাভাস, বিষম, অসঙ্গতি, বিভাবনা, অন্যোন্য, বিশেষোক্তি ও বিচিত্র। এছাড়া অপ্রস্তুত প্রশংসা, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি, আক্ষেপ, ব্যাজোক্তি ইত্যাদি অলংকার গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক শ্রেণির মধ্যে পড়ে। অলংকারবাদী কাব্যশাস্ত্রীরা মনে করেন এইসব অলংকার সমূহ প্রযুক্ত হয় বলেই সাহিত্য রসিক পাঠকের কাছে এত উপাদেয় হয়ে ওঠে। যেন— কবি কালিদাস ছিলেন বিবিধ উপমা অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজাধিরাজ। সাধারণ কাব্য অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে অলংকার পরিয়ে দিলে। সেজন্য ভামহ অলংকারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তবে তাঁর মতে অলঙ্কার মাত্রেই বক্রোক্তি। তবে এখানে বক্রোক্তি বলতে বুঝিয়েছেন অতিরিক্ত অর্থদ্যোতনা। দণ্ডী গুণবাদী হয়েও অলংকারের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, তবে তাঁর মতে গুণই নিত্য, অলংকার অনিত্য। অন্যদিকে বামন কোনো বাহ্য আরোপিত বিষয়কে অলংকার বলে মেনে নিতে চাননি। তাঁর বক্তব্য—নারীদেহের সহজাত লাবণ্যের মতো সাহিত্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্যই হল অলংকার। বক্রোক্তিবাদী কুন্তক কোনো বিষয়কে রসিকোচিতভাবে বলবার ভঙ্গিকে মনে করেন অলংকার, যা বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সহায়ক। ধ্বনিবাদীদের মতে, অলংকার তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন তা বহিরঙ্গের শোভাকর ধর্ম না হয়ে দেখা দেয় অন্তরের লাবণ্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে। আর রসবাদীরা রসের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়ে উৎপন্ন অলংকারকেই কেবল স্বীকৃতি জানিয়েছেন, অন্যথায় এটি কাব্যদেহের পক্ষে ভারস্বরূপ বলে গণ্য করেছেন। প্রায় একই অভিমত দেন মম্মট ভট্ট, আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ, অভিনব গুপ্ত প্রমুখ কাব্যতাত্ত্বিকরা। তাছাড়া অলংকারকে যে সব সময় স্ফুটাকারে অঙ্গাভরণ রূপে শোভা পেতে হবে এমনটা নয়, তা কখনো কখনো অস্ফুটভাবে মিশে থাকতে পারে কাব্যদেহে। শেষ পর্যন্ত এটাই স্বীকৃতি পেয়েছে যে, রসই হল কাব্যের আত্মা, যেখানে ধ্বনি তার প্রাণ। এই দুইয়ের আনুকূল্য বিধান করে এমন অলংকারই কাব্যের ক্ষেত্রে স্বীকার্য, বাকি তার পক্ষে অনর্থক ভাবস্বরূপ। এভাবে অলংকারবাদ একদা উঠে এলেও পরে রীতিবাদ, ধ্বনিবাদ, রসবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটায় 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারবাৎ' মতটি অবসিত হয়ে যায়।

১৬.৬ প্রশ্নাবলি

(ক) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. 'অলংকার' শব্দটির ব্যুৎপত্তি লেখো।

২. অলংকারবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কাকে বিবেচনা করা হয়?

৩. আচার্য ভরত কোন কোন অলংকারের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন?

৪. গার্গ্য উপমার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি কী?

৫. আচার্য ভামহ, দণ্ডী ও বামনের গ্রন্থের নাম লিখুন।

৬. ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে প্রথম আলংকারিক হিসাবে কাকে দেখা হয়?

৭. উপমা কয়ভাগে বিভক্ত? সেগুলি কী কী?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'—মতটি কার? মতটি ব্যাখ্যা করুন।

২. অলংকারপ্রস্থান কীভাবে আবির্ভূত হল?

৩. অলংকার বিষয়ে দণ্ডীর বক্তব্য কী?

৪. রবীন্দ্রনাথ অলংকারকে কী দৃষ্টিতে দেখেছে?

৫. ভামহের অভিমত অনুসারে অলংকারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৬. আচার্য দণ্ডী অলংকারকে কীভাবে দেখেছেন?

৭. অলংকার বিষয়ে কুন্তকের অভিমত কী?

৮. ধ্বনিবাদী ও রসবাদীদের দৃষ্টিতে অলংকারের উপযোগিতা নির্দেশ করুন।

(গ) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক :

১. বিভিন্ন আলংকারিক অলংকারবাদকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় লিখুন।

২. 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ'—এই উক্তির সূত্রে অলংকারবাদ কতখানি গ্রহণযোগ্য তার আনুপূর্বিক বিচার করুন।

৩. অলংকারপ্রস্থান সম্পর্কে কাব্যশাস্ত্রীদের অনুচিন্তনের পরিচয় দিন।

১৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। সাহিত্য-বিবেক— বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

২। কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা— করুণাসিন্ধু দাস

৩। কাব্যতত্ত্ব বিচার— দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৪। প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা— বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

একক ১৭ : রীতিবাদ

১৭.১ উদ্দেশ্য

১৭.২ প্রস্তাবনা

১৭.৩ মূল আলোচনা

১৭.৪ বামন-পরবর্তী রীতিবাদ-চর্চা

১৭.৫ সংক্ষিপ্তসার

১৭.৬ প্রশ্নাবলী

১৭.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট প্রস্থান রীতিবাদের উৎপত্তি, তার স্বরূপ, বিভিন্ন কাব্যশাস্ত্রী কীভাবে প্রস্থানটিকে দেখেছেন এবং এই মতবাদের সীমাবদ্ধতা কী ছিল তা জানতে পারা যাবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রচনাপদ্ধতিকে অবলম্বন করে আলংকারিকরা রীতির যেসব শ্রেণিবিভাগ নির্দেশ করেছিলেন সেগুলি সম্পর্কেও অল্পবিস্তর ধারণা পাওয়া যাবে। এছাড়া প্রাচ্য রীতিবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য স্টাইলিস্টিক্স্-এর পারস্পরিক সম্বন্ধও কিছুটা বুঝতে পারা যাবে।

১৭.২ প্রস্তাবনা

ভারতীয় আলংকারিকরা কাব্যের আত্মার সন্ধানে নেমে শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সহিতত্ব অর্থাৎ সংযোগের মধ্যে কাব্যের প্রাণবস্তুকে খুঁজতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ মত একান্তভাবেই দেহাত্মবাদীদের, যাঁরা দেহকেই আত্মা বলে মনে করেছিলেন। সুতরাং সে মত পরিত্যক্ত হতে সময় লাগেনি। দ্বিতীয় প্রস্থান হিসেবে উঠে এল অলংকারপ্রস্থান, যার মূল কথা শব্দ ও অর্থ অলংকৃত হলেই কাব্য হিসেবে মান্যতা পায়। কিন্তু এ মতবাদের মধ্যেও ছিল যথেষ্ট দোষ-ত্রুটি। কারণ এটা দেখা গেছে যে, অনেক সময় অনলংকৃত রচনাও ভীষণ আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ কাব্য হয়ে উঠতে গেলে অলংকারের প্রয়োগ অনিবার্য নয়। এরপর আচার্য দণ্ডীর হাত ধরে গুণপ্রস্থানের আবির্ভাব, যেখানে বলা হয়েছে গুণই হল কাব্যশোভাকর। এটি সমগ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং গুণের ওপর নির্ভর করে মার্গ। ভরতের মতে এই গুণের পরিমান মোট দশটি। কিন্তু আচার্য বামন দশটি শব্দগুণের পাশাপাশি দশটি অর্থগুণও নির্দেশ করে এটি যে কাব্যের ইতিবাচক একটি ধর্ম সে সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। গুণময় রীতিকেই ইনি কাব্যাত্মা বলে দাবি করেন, যা থেকে সূচনা ঘটে রীতিবাদের।

১৭.৩ মূল আলোচনা

রীতিপ্রস্থানের জনক হলেন আচার্য বামন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি'। গুণ সম্পর্কিত অতিরিক্ত চিন্তাই রীতিবাদের জন্ম দিয়েছিল। রীতিবাদের মূল কথা হল—'রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতি। বিশেষো গুণাত্মা।' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল রীতি, যে রীতি দাঁড়িয়ে আছে বিশেষ ধরনের পদরচনার কৌশলের ওপর এবং এই বিশেষত্ব গড়ে ওঠে গুণের সাহায্যে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে জেনে রাখা ভালো যে, বামন ছিলেন সপ্তম শতকের শেষভাগে কাশ্মীরে আবির্ভূত এক আলংকারিক এবং ইনি রাজা জয়াপীরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই প্রথম সূত্রাকারে অলংকারশাস্ত্র রচনা করেছিলেন এবং নিজেই সেই সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা বৃত্তি রচনা করে সূত্রের অর্থ পরিস্ফুট করেছিলেন।

আচার্য বামন তাঁর মত গঠনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলংকারিক দণ্ডীর পদাঙ্ক কিছুটা অনুসরণ করেন। তিনি ভামহের দেহাত্মবাদের তুলনায় দণ্ডী-প্রবর্তিত মার্গকে বেশি গুরুত্ব দেন। ভামহের বক্তব্য ছিল, নিছক বার্তাজ্ঞাপক সাধারণ ভাষা কাব্যের ভাষা হতে পারে না। কিন্তু সাধারণ উক্তিই যদি বক্রতামণ্ডিত হয়, অর্থাৎ একটু বঙ্কিম ভঙ্গি অবলম্বন করে, তাহলে তা কাব্যধর্মে উত্তীর্ণ হতে পারে। ভামহের মতে, সব অলংকারের মূল হচ্ছে অতিশয়োক্তি। তাঁর ভাষায়—'সৈষা সা এষা অতিশয়োক্তি।' এই অতিশয়োক্তি হল কাব্য রচনার পথ বা মার্গ। আর বামন এটাকেই বলেছেন রীতি।

'রীতি' শব্দটি এসেছে সংস্কৃতে √রী ধাতু থেকে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'ক্তি' প্রত্যয়। 'রী' ধাতুর অর্থ দুই প্রকার—(১) স্রবণ বা তরল পদার্থের গড়িয়ে যাওয়া, যেমন—প্রস্রবণ ও (২) রেষণ বা নেকড়ের আওয়াজ করা। আলংকারিকরা প্রথম অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন এবং এর একটি পারিভাষিক অর্থ দান করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, রীতিকে আত্মা বলার যুক্তি কী? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় সৌন্দর্য সম্পর্কে আচার্য বামনের ধারণাকে ব্যাখ্যা করে। তিনি বাহ্য কোনো শব্দালংকার বা অর্থালংকারকে গুরুত্ব দেননি, বরং তাঁর মতে সৌন্দর্যই অলংকার। এই সৌন্দর্য কাব্যের স্বভাব-সৌন্দর্য বা লাবণ্য, জোর করে প্রসাধন চড়িয়ে আনা ব্যাপার নয়। এই সৌন্দর্য থাকলেই কাব্য রসিকজনের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। এখন এই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য কবির দিক থেকে কী করণীয়? বামন এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন— এর জন্য কবিকে গ্রাম্যতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি দোষসমূহ বর্জন করতে হবে এবং তার পরিবর্তে মাধুর্য, ঔদার্য, সৌকুমার্য, ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি গুণ যুক্ত করতে হবে। কারণ কাব্যের নিত্যধর্ম হল গুণ। এক্ষেত্রে চিত্রশিল্পের উপমা দিয়ে তিনি বলেছেন, ছবিতে রং আর রেখার যে ভূমিকা, কাব্যে অলংকার ও গুণের সেই একই ভূমিকা। রেখা চিত্তের সৌন্দর্য গড়ে তোলে, আর রং সেই সৌন্দর্যকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। এই বক্তব্যটি স্মরণে রাখলে গুণই হয়ে ওঠে বামনের কাব্যাদর্শে প্রধান অলংকার। বিশেষ বিশেষ গুণের সংযোগে বিশেষ বিশেষ রীতি গড়ে ওঠে। এই কারণে রীতিবাদীদেরকে কেউ কেউ গুণবাদী বলেও অভিহিত করেছেন।

কাব্যদোষের বিপরীতে কাব্যগুণের কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন আচার্য ভরত। তিনি দশটি কাব্যগুণ নির্ধারণ করেন। এগুলি হল— শ্লেষ, সমতা, প্রসাদ, ওজঃ, মাধুর্য, সৌকুমার্য, উদারতা, অর্থব্যক্তি, কান্তি

ও সমাধি। ভরত এগুলিকে কাব্যলক্ষণ হিসেবে এবং নিছক শব্দগুণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু রীতিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কেবল এদেরকে শব্দগুণেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না, তাদেরকে অর্থগুণেও প্রসারিত করে দিলেন। তখন বিষয়টা দাঁড়াল এরকম :

গুণের নাম	**শব্দের সূত্রে**	**অর্থের সূত্রে**
১. শ্লেষ	শব্দের মসৃণতা	একটি শব্দের একাধিক অর্থ
২. সমতা	শব্দবিন্যাসভঙ্গির একরূপতা	ভাবগত সামঞ্জস্য
৩. প্রসাদ	শিথিল রচনা	অর্থগত সারল্য
৪. ওজঃ	পদ রচনার গাঢ়ত্ব	গাম্ভীর্য
৫. মাধুর্য	পৃথক পৃথক পদবিন্যাস	উক্তিগত বৈচিত্র্য
৬. সৌকুমার্য	শাব্দিক কোমলতা	ভাবের প্রিয়তা
৭. উদারতা	শব্দের নৃত্য	গ্রাম্যতার অনুপস্থিতি
৮. অর্থব্যক্তি	সহজ অর্থপ্রতীতি	বর্ণনীয় বিষয়ের স্ফুটতা
৯. কান্তি	শব্দের দীপ্তি	রসের দীপ্তি
১০. সমাধি	শব্দচ্ছটার উত্থান-পতন	সহজলভ্য অর্থ

আলংকারিক বামন এই গুণগুলির নানাবিধ সংযোজন-বিয়োজন দ্বারা মোট তিন প্রকার রীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছিলেন। এগুলি যথাক্রমে পাঞ্চালী, গৌড়ী ও বৈদর্ভী। লক্ষ করলে দেখা যাবে, তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে ভিত্তি করে এই তিন রীতির উত্থান। পাঞ্চালীতে আছে মাধুর্য ও সৌকুমার্য গুণ, গৌড়ীতে পাওয়া যায় ওজঃ ও কান্তিগুণ এবং বৈদর্ভী সকল গুণের অধিকারী। গৌড়ী রীতিতে অতিরিক্তভাব আছে অক্ষরের আড়ম্বর এবং দীর্ঘপদী সমাসের বাহুল্য। অবশ্য বামনের আগে দণ্ডীর লেখায় গৌড়ী ও বৈদর্ভী মার্গের কথা জানতে পারা যায়, এমনকি এগুলি ভামহেরও দৃষ্টি এড়ায়নি, তবে ভামহ এগুলিকে মার্গ বা রীতি না বলে অলংকার হিসেবে গণ্য করেছিলেন। বৈদর্ভী, গৌড়ী ইত্যাদি নামেও তাঁর আপত্তি ছিল। কেননা তিনি মনে করতেন গতানুগতিকতা থেকে পৃথক করার জন্যই এইসব নানান আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। যেখানে যার উদ্ভব সেইভাবে তার বংশ পরিচয়। পরবর্তীকালে আচার্য কুন্তক এসে ভামহের এই ধারণাকে আশ্রয় করে রীতিবাদের আঞ্চলিকতা চূর্ণ করে প্রতিষ্ঠিত করেন ব্যক্তিভেদের স্বকীয় রীতি, যার তিনি নাম দিয়েছিলেন বক্রোক্তি।

১৭.৪ বামন-পরবর্তী রীতিবাদ-চর্চা

রীতিবাদ কিন্তু আচার্য বামনেই পরিসমাপ্তি লাভ করেনি। বামনের পর রাজশেখর, মম্মটভট্ট, ভোজরাজ, রুদ্রট, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখ আলংকারিকরা এই প্রস্থানটি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করেছেন এবং রীতির সংখ্যা ৩টি থেকে বেড়ে হয়েছে ৬টি। যেমন নবম শতকের আলংকারিক রুদ্রট তাঁর ‘কাব্যালঙ্কার’ গ্রন্থে

রীতিবাদ প্রসঙ্গে বামনকে স্বীকার করলেও তাঁর কাছে রীতি কিন্তু গুণভিত্তিক নয়, তা সমাসভিত্তিক। এছাড়া উপরিউক্ত তিন রীতি ব্যতীত তিনি গুজরাট অঞ্চলে প্রচলিত 'লাটী' নামক আরও একটি সাহিত্যরীতির প্রচারক। তাঁর মতে, দু-তিনটি পদের সমাহারে পাঞ্চালী, পাঁচ-সাতটি পদের সংযুক্তিতে লাটী, তার চেয়েও বেশি সমাহারে গৌড়ী এবং বৈদর্ভী রীতি একেবারেই সমাসহীন হয়ে থাকে। বাণভট্ট গৌড়ী রীতির লেখক, যাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে প্রচুর সমাসবদ্ধ পদ ও অক্ষরের আড়ম্বর। অন্যদিকে বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন কালিদাস।

দ্বাদশ শতকের আলংকারিক ভোজরাজ তাঁর 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' গ্রন্থে আরও দুটি আঞ্চলিক রীতির কথা বলেছেন। এদের একটি হল অবন্তী অঞ্চলের আবন্তী রীতি ও অন্যটি হল মগধ অঞ্চলের মাগধী রীতি। যদিও চতুর্দশ শতকের আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ'-এ বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী—এই চারটি রীতিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। একই সঙ্গে ইনি বিষয়ভেদে রীতি প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, অঞ্চলভেদে ততটা নয়। সেজন্য তিনি নাটকে অভিনয়ের স্বার্থে, এমনকি রৌদ্র রসের ক্ষেত্রেও, সমাসবহুল সংলাপ পরিহারের কথা বলেছেন। তাই রীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ জানিয়েছেন যে, রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাসের পরিপোষক পদবিন্যাসই হল রীতি। তবে ইনি রীতিকে কাব্যের আত্মা বলে মানতে রাজি হননি। কারণ রীতিকে আত্মা বলে মেনে নিলে বাগর্থবিন্যাস কৌশলের বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। অথচ ভারতীয় কাব্য মীমাংসা রীতিতে এসে থেমে যায়নি, সে আরো সূক্ষ্মতর ধ্বনি ও সূক্ষ্মতম রসে গিয়ে পৌঁছেছে। সুতরাং একসময়ে বক্রোক্তিবাদ, ধ্বনিবাদ ও রসবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে বামন-প্রবর্তিত রীতিবাদ সাহিত্যতত্ত্বের অঙ্গন থেকে হারিয়ে গেছে।

তবে রীতিপ্রস্থান বিষয়ে নবম শতকের শেষপাদের আলংকারিক কুন্তকের মতটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, রীতি অনেকটা আধুনিক স্টাইলের সমার্থক হয়ে উঠেছে। 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে 'বক্রোক্তিই কাব্যের আত্মা'—এই মতকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি রীতিকে বক্রোক্তিবাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একইসঙ্গে কুন্তক রীতির আঞ্চলিক তথা ভৌগোলিক ভেদ অস্বীকার করেছেন এবং তার পরিবর্তে জোর দিয়েছেন কবিবিশেষের স্বভাবভেদে প্রকাশকলার তারতম্যের ওপর। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তি—'কবিস্বভাবভেদনিবন্ধনত্বেনকাব্য প্রস্থানভেদঃ।' অর্থাৎ কবিপ্রকৃতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যপ্রকৃতিরও বদল ঘটে। এর দরুন রীতিতে জোর পড়ল কবিব্যক্তিত্ব ও তার প্রকাশ-স্বাতন্ত্র্যের ওপর। এই প্রকাশ তাঁর মতে তিন ধরনের হতে পারে। এগুলির তিনি নাম দিয়েছেন—সুকুমার, বিচিত্র ও মধ্যম। কবিস্বভাবভেদে যদি প্রস্থান-বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে তাহলে রীতিও তো হবে অসংখ্য, অর্থাৎ যত কবি তত রীতি। কিন্তু সেক্ষেত্রে মাত্র তিনটিকে স্বীকার করার কারণ কী? আসলে কুন্তক কিছুটা স্থূলভাবে কবিস্বভাবের তিনটি প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে বক্রোক্তিবাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন এবং এই বক্রোক্তিবাদই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করেছে রীতিবাদকে। এতে সাহিত্যের বাঙ্ময় প্রকাশে দেশভেদ বর্জিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হল স্রষ্টার স্বতন্ত্র প্রাকরণিক বিশেষত্ব। তাই কুন্তকের আগে যে রীতি ছিল ভাষার অঞ্চলগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে অন্বিত একটি বিষয়, কুন্তকে এসে সে দাঁড়াল সাহিত্যভাষার নির্বাহনগত অবয়বে। রীতি পরিণত হল ব্যক্তিগত শৈলীতে, যার সঙ্গে ইউরোপীয় শৈলীবিজ্ঞানের দূরান্বয়গত সম্পর্ক আছে। স্টাইল সম্পর্কে একজন লিখেছিলেন, 'It

is that element of literary composition in which ... the writier unconciously expresses his own temperament or cirumstances'. এখানে 'own temperament' কথাটির মধ্যে কুন্তক-কথিত 'কবিস্বভাব' যেন উঁকি দিচ্ছে, যা কোনো রচনায় অসচেতনভাবে প্রতিফলিত হয়। পাশ্চাত্যে স্টাইলের প্রথম চিন্তক ছিলেন অ্যারিস্টটল। তিনিও কাব্যভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন—'A poetic coinage is a word which has not been in use among a people, but has been invented by the poet himself.' লঞ্জাইনাসও মনে করতেন রচনাশৈলী কবিব্যক্তিত্বেই অন্তর্গত, যা বিষয়ভাবনা সঙ্গে আবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত।

১৭.৫ সংক্ষিপ্তসার

সাহিত্যের সৃজন ক্রিয়ায় 'রীতি' একটি অপরিহার্য অঙ্গ। রসবাদ ও ধ্বনিবাদ যে অর্থে কাব্যের অন্তর্লীন কথন, রীতিবাদ সে অর্থে কাব্যের বহিরঙ্গ যত্ন প্রকরণ। রীতিবাদের জনক হিসেবে ধরা হয় আচার্য বামনকে, যদিও দণ্ডীর ভাবনাতে রীতিপ্রস্থানের বীজ ছিল মার্গের ধারণায়। রীতিবাদের উদ্ভবের আগে গুণকে কাব্যের লক্ষণ বলে অনেকে মনে করেছিলেন। গুণের প্রসঙ্গ প্রথম পাওয়া যায় আচার্য ভরতের লেখায়, যার পরিমাণ দশটি বলে তিনি নির্দেশ করেছিলেন। দণ্ডীও মানতেন গুণগুলির গুরুত্ব। তিনি বিভিন্ন গুণের সমবায়ে মার্গ গঠিত হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর মতে মার্গের সংখ্যা দুই—গৌড়ী ও বৈদর্ভী।

পরের যুগে আবির্ভূত হলেন বামন। তিনি দশটি শব্দগুণের পাশাপাশি স্বীকৃতি দলেন দশটি অর্থগুণকে এবং গুণাত্মক পদরচনাকেই বললেন রীতি। সাধারণভাবে আমরা রচনার শৈলী বা স্টাইল বলতে যা বুঝে থাকি, রীতি কথাটি তার প্রায় সমার্থক। কিন্তু বামন একে দাঁড় করাতে চাইলেন অঞ্চল বিশেষের ভাষারীতির পর। তিনি মূলত তিনটি অঞ্চলকে গুরুত্ব দিলেন এবং তদনুযায়ী বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতির কথা বললেন। পরবর্তীকালে রুদ্রট 'লাটী' নামে একটি রীতি ও ভোজরাজ 'আবন্তী' ও 'মাগধী' নামে আর দুইটি রীতি এই তালিকায় সংযুক্ত করেন। মোট ছয়টি রীতির মধ্যে বৈদর্ভীই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই রীতিতেই দশটি গুণ একত্রে অবস্থান করে।

রীতিবাদের মুখ্য সমালোচক আচার্য কুন্তক। তাঁর মতে, শব্দ ও অর্থের নিপুণ সংযোজনার চাতুর্যর ওপর রীতি নির্ভর করে না। রীতি হল কাব্যের অন্তরঙ্গ একটি বিষয়। এতে ধরা পড়ে ব্যক্তিকবির অন্তর-স্বভাব। এই স্বভাব তিন ধরনের হতে পারে। যখন সৌকুমার্য যুক্ত হয়, তখন রচনামার্গ হয়ে ওঠে সুকুমার। আবার কবিদের বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেলে সেটি হয় বিচিত্রমার্গ আর যখন এই দুইয়ের মিশ্রণ ঘটে তখন সৃষ্টি হয় মধ্যম মার্গ। কুন্তক পরিকল্পিত মার্গগুলির পিছনে রয়েছে কবির স্বভাব, তাঁর অর্জিত জ্ঞান ও অভ্যাস। কুন্তক রীতিবাদকে যেখানে দাঁড় করিয়েছেন তা ইউরোপীয় ভাবনার স্টাইলের বেশ ঘনিষ্ঠ। অন্যদিকে মম্মটভট্ট রীতিকে স্থান দিয়েছেন অলংকারের মধ্যে। আর বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে, রীতি যেহেতু শব্দ সংঘঠন-নির্ভর, তাই তাকে কখনই কাব্যের আত্মার মর্যাদা দেওয়া যায় না।

১৭.৬ প্রশ্নাবলি

(ক) অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. গুণ প্রস্থানের জনক কে? তাঁর গ্রন্থের নাম কী?

২. রীতি কয়প্রকার ও কী কী?

৩. লাটী রীতির প্রবক্তা কে?

৪. ভোজরাজ কোন কোন নতুন রীতির কথা বলেছেন? তাঁর গ্রন্থের নাম কী?

৫. গৌড়ী রীতির বিখ্যাত লেখক কে?

৬. রীতি সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের অভিমত কী ছিল?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী দেহাত্মবাদ কী?

২. আচার্য ভরত কতগুলি গুণের কথা বলেছেন? গুণগুলি কী কী?

৩. আচার্য বামনের ব্যক্তি ও কাল পরিচয় দিন।

৪. রীতির সংজ্ঞা দাও। রীতি কি গুণের ওপর নির্ভরশীল?

৫. শব্দের সূত্রে ও অর্থের সূত্রে মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ কী কী গুণের অধিকারী হয়ে থাকে?

৬. রীতি বিষয়ে কুন্তকের বক্তব্য কী ছিল?

৭. রীতিবাদের মুখ্য সমালোচক কে ছিলেন? তিনি কী সমালোচনা করেছিলেন?

(গ) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক :

১. আচার্য বামন রীতিবাদকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা ব্যাখ্যা করুন।

২. বামন-পরবর্তী যুগে রীতিবাদের চর্চা কীভাবে অগ্রসর হয়েছে তার বিবরণ দিন।

৩. রীতিপ্রস্থান বিষয়ে তোমার সামগ্রিক অভিমত ব্যক্ত করুন।

১৭.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা — বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

২। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব—অবন্তীকুমার সান্যাল।

৩। কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা—করুণাসিন্ধু দাস।

৪। সাহিত্যতত্ত্বের রূপরেখা— বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

একক ১৮ : বক্রোক্তিবাদ

১৮.১ উদ্দেশ্য

১৮.২ প্রস্তাবনা

১৮.৩ মূল আলোচনা

১৭.৪ বামন-পরবর্তী রীতিবাদ-চর্চা

১৮.৫ সংক্ষিপ্তসার

১৮.৬ প্রশ্নাবলী

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থান বক্রোক্তিবাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে। বক্রোক্তি কথাটি সাধারণ অর্থ, পরিভাষিক অর্থ, এর স্বরূপ সম্পর্কে যেমন ধারণা পাওয়া যাবে তেমনি এর উৎপত্তি কীভাবে হল, এ মতের প্রবর্তক কে সে বিষয়ে জানা যাবে। এছাড়া বক্রোক্তি সৃষ্টিতে যে যে ধরনের বক্রতার কথা অলংকার শাস্ত্রে বলা হয়েছে, তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যাবে।

১৮.২ প্রস্তাবনা

'বক্রোক্তি' শব্দটির সাধারণ অর্থ 'বাঁকা উক্তি'। সংস্কৃত ও বাংলা অলংকারের তালিকায় বক্রোক্তি একটি শব্দালংকার রূপে স্বীকৃত। কিন্তু ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে আচার্য কুন্তক যে বক্রোক্তিবাদ গড়ে তুলেছেন, তার সঙ্গে এই শব্দালংকারের কোনো সম্বন্ধ নেই। আচার্য ভামহ অলংকারবাদী ছিলেন এবং তিনি মনে করতেন অলংকার প্রয়োগের কারণে কাব্য প্রকৃত কাব্যত্ব লাভ করে। আর এই অলংকারগুলির মূল উপজীব্য হল বক্রোক্তি। সুতরাং ভামহর কাব্যদর্শনে বক্রোক্তিই শেষ কথা। বক্রোক্তি-বিহীন সাধারণ বর্ণনাকে তিনি সেজন্য কাব্য বলে মানতে চাননি। ভামহর পর আবির্ভূত হন দণ্ডী। তিনি তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, কাব্যে স্বভাবোক্তি ছাড়া যে কাব্যিক বর্ণনা আছে সেটাই হল বক্রোক্তি, যা কিনা সমস্ত অলংকারের মূল। অন্যদিকে আচার্য বামন একে দেখলেন লক্ষণার দ্বারা রচিত ভিত্তি অলংকার রূপে, যেখানে সাদৃশ্যই হল প্রধান বিশেষত্ব। অবশ্য বামনের এই ধারণাকে পরবর্তীকালে কেউই মানেননি। কারণ যে-কোনো লক্ষণার মধ্যেই বক্রতা থাকে, শুধু সাদৃশ্যে তাকে কল্পনা করা ঠিক নয়।

১৮.৩ মূল আলোচনা

একটি বিশিষ্ট কাব্যপ্রস্থান হিসেবে বক্রোক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আচার্য কুন্তক। এঁর আবির্ভাব কাশ্মীরে, সম্ভবত দশম শতকের গোড়ায়। যে গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি এই মতবাদটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তার নাম 'বক্রোক্তিজীবিত', যেখানে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা বক্রোক্তিই হল কাব্যের 'জীবিত' বা প্রাণ। অবশ্য কুন্তকের আগে ভামহ বক্রোক্তি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান কথা বলেছিলেন, যার দ্বারা কিয়দংশে প্রভাবিত হন কুন্তক। সুতরাং এই প্রস্থানটি সম্পর্কে বিশদে জানতে গেলে বক্রোক্তি ধারণার ক্রমবিবর্তনের ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে।

তির্যক বচন হিসেবে বক্রোক্তি শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন প্রথম দিকের আলংকারিকরা, যেখানে বক্তা যে অর্থে বলেন শ্রোতা সে-অর্থে গ্রহণ করেন না। এই সূত্রে শব্দালংকারের অন্তর্ভুক্ত, বক্রোক্তি দুই প্রকার— যথাক্রমে শ্লেষ বক্রোক্তি ও কাকু বক্রোক্তি।

শ্লেষ বক্রোক্তির উদাহরণ—'বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত, কেন মহাশয়?
সুরে না সেবিলে বল কেবা মুক্ত হয়?

এখানে 'সুরাসক্ত' এই সন্ধিবদ্ধ পদটিই দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি করেছে। প্রথম ব্যক্তি সুরা+আসক্ত অর্থে ধরে বিপ্রকে মদ্যপায়ী বলে ভর্ৎসনা করতে চান। তার প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি সুর + আসক্ত অর্থ ধরে নিজেকে ঈশ্বরানুরাগী সেবক বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কাকু বক্রোক্তিতে থাকে কণ্ঠাবরের বিশেষ ভূমিকা সেখানে আপাত প্রশ্নের মধ্যে নিহিত থাকে উত্তর। যেমন—'কে না তার স্বদেশকে ভালোবাসে?' এর একমাত্র উত্তরটি সদর্থক, অর্থাৎ সবাই তার স্বদেশকে ভালোবাসে। শব্দালংকারের এই সংকীর্ণ সীমা থেকে কুন্তক বক্রোক্তিকে মুক্তি দিয়ে নতুন তাৎপর্যে অন্বিত করলেন। কিন্তু সেটা সূচনাতেই হয়নি। তার যে পরম্পরা রয়েছে সেটি এখন লক্ষণীয়।

কাব্যের বাণী এবং দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য আছে এ সত্য প্রথম থেকেই অবগত ছিলেন ভারতীয় আলংকারিকরা। যে কারণে কাব্যভাষাকে নিত্যনৈমিত্তিক ভাষার থেকে পৃথক করার প্রয়োজনে আয়োজন করা হয় অলংকারের, এর ফলে সৃষ্টি হয় অলংকারবাদের। কাব্যের ভাষা সৌন্দর্যময় এক নতুন সৃষ্টি এবং এই সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপসারণ খুবই কার্যকর এক পদ্ধতি। তাঁরা এই নতুন ধরনের কাব্যভাষাকে বলেছেন বক্রোক্তি বা বঙ্কিম বাণী।

ভামহ যদিও শব্দ ও অর্থের মিলনকেই কাব্য বলে নির্দেশ করেছেন, তবুও এই মিলনের ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত ছিল, এটা যেমন-তেমনভাবে হলে হবে না, তাকে প্রকৃতিতে হতে হবে 'বক্র'। একথার অর্থ হল, কানে শুনে একটি শব্দের যে-অর্থ পাওয়া যায়, তার থেকে আরও বেশি কিছু বোঝানো। অর্থাৎ এটি হয়ে উঠবে শব্দার্থের অতিরিক্ত এক চমৎকার ধ্বনিস্পন্দময় সৌন্দর্য।

আচার্য দণ্ডীর মতে, বক্রোক্তি হল কাব্যের একটি বিশিষ্ট ভাগ, যেখানে থাকে বস্তুর অলংকৃত ও তির্যক বর্ণনা, যাকে টিলিয়ার্ড বলেন 'Oblique Poetry'। তবে দ্ব্যর্থক শ্লেষ অলংকার বক্রোক্তিতে বেশি মানায়।

এখন দণ্ডীর সঙ্গে কুন্তকের তফাৎ হচ্ছে এই যে, দণ্ডী যেখানে বক্রোক্তিকে শ্লেষ অলংকার বলে স্বীকৃতি জানান, সেখানে কুন্তক তাকে কোনো অলংকার বলে মানতেই চান না। বরং তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বক্রোক্তি কোনো অলংকার নয়, সে সব অলংকারের মূল।

দণ্ডীর পর এলেন বামন। ইনি ভামহকে অনুসরণ করে বক্রোক্তিকে গণ্য করলেন একটি পৃথক অলংকার বলে। তিনি বললেন— 'সাদৃশ্যাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃ।' অর্থাৎ যা সাদৃশ্যমূলক লক্ষণা সেটাই হল বক্রোক্তি। সাদৃশ্যমূলক লক্ষণার তখন আবির্ভাব হয় যখন একের ধর্ম অন্যের ওপর আরোপ করা হয়। অর্থালংকারের মধ্যে সমাসোক্তি বলতে আমরা যা বুঝি সেই অলংকারের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে এই সাদৃশ্যমূলক লক্ষণার।

এবার আসা যাক বক্রোক্তি প্রস্থানের প্রবক্তা কুন্তকের নিজস্ব ভাবনায়। কুন্তক গোড়াতেই বক্রোক্তিকে রীতি থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন। যে রীতি ছিল বামনের দৃষ্টিতে ভাষার সমাজগত ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে অন্বিত, কুন্তক তাকে করে তুললেন সাহিত্যের ভাষার ব্যক্তিভেদের তারতম্যের আসঞ্জন। ব্যক্তিভেদে যখন ভাষার রীতিভেদ গড়ে ওঠে, তখন কবির বিশেষ বাগভঙ্গিমা প্রতিভাকৌশল কাব্যভাষায় ছাপ ফেলে যায়। ভাষায় কবিব্যক্তিত্বের এই ছাপ সহ যে বিশেষ প্রকাশরূপ তৈরি করে ওঠে, কুন্তক তাকেই বলেছেন বক্রোক্তি। এই প্রসঙ্গে তিনি বক্রোক্তির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটা একটু লক্ষ করা যাক—'বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গিভণিতিরুচ্যতে'। অর্থাৎ বক্রোক্তি হল বিদগ্ধ ব্যক্তির ভঙ্গিময় ভণিতি-বৈচিত্র্য। এখন প্রশ্ন হল 'ভঙ্গিময়' ভণিতি-বৈচিত্র্য' বলতে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছেন? তার উত্তর দিয়েছেন তিনি দশম বৃত্তিতে। লিখেছেন—'বক্রোক্তিঃ প্রসিদ্ধাভিধানব্যতিরেকিনী বিচিত্রৈর্বাভিধা। কীদৃশী বৈদগ্ধভঙ্গীভণিতিঃ। বৈদগ্ধ্যং বিচিত্র ভাবঃ কবিকর্মকৌশলং তস্য ভঙ্গী বিচ্ছিত্তিঃ তয়া ভণিতি।' অর্থাৎ পরিচিত কথনভঙ্গি থেকে যা পৃথক সেই বক্রোক্তি হল এক বিচিত্র অভিধার ব্যাপার। বৈদগ্ধ্য বলতে বোঝায় বিদগ্ধের ভাব, যা কবিকর্মকৌশল বা কবির নির্মাণকুশলতা—তার ভঙ্গি বা শোভা। তার দ্বারা রমণীয় যে ভণিতি বা উক্তি বা কথন তাকেই বিচিত্র অভিধারূপা বক্রোক্তি বলে।

কুন্তকের কথার মর্মার্থ বিশ্লেষণ করলে এইরকম এক ধারণায় পৌঁছানো যায় যে, কাব্যে শব্দ ও অর্থের পৃথক অলংকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না। কেননা কবির বাক্‌সিদ্ধির অনন্য প্রতিভায় এরা সংস্কার্থ প্রাপ্ত হয় কাব্যের আন্তরধর্মে। বক্রতা বৈচিত্র্যের সন্নিবেশনে শব্দার্থের প্রকাশই এদের লক্ষ্য। আর এই কারণেই বোধহয় ভামহের স্বভাবোক্তি অলংকার কুন্তকের কাছে মূল্যহীন। কুন্তকের বক্রতাবন্ধের আন্তরধর্মে অলংকার গড়ে ওঠে বলে সার্থক কবিকর্মের অপার লীলারহস্যে অলংকার সৃজিত হয়ে ওঠে। এইজন্যেই সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যালোক' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, অলংকারের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই, তা বিভিন্ন কবির হাতে সৃষ্ট অনেকান্ত লীলার মতো অনেকান্ত লীলাকমল, বহুধা কবি ব্যাপারের মতো অগনণীয়।

আসলে কুন্তক বক্রোক্তি বলতে কাব্যের ভাষা ও বিষয়বস্তু দুটিকেই বুঝিয়েছেন। নানারকম বক্রতাবন্ধে

গড়ে ওঠে কবির কবিতা। কবি এক বিশেষ মুহূর্তে প্রতিভার বোধ, দীপ্তি, কল্পনা, প্রেরণা ও ভাষার ঐশ্বর্য দিয়ে নির্মাণ করেন কাব্য, যা সাধারণ কথাবস্তুর তুলনায় ভিন্ন এক উচ্চতর স্তরের কথাবয়ন— যা পাঠককে লোকোত্তর আনন্দে আবিষ্ট করে। এজন্য কুন্তক কাব্যের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন—

‘শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনী।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণী।।’

এর অর্থ হল— মিলিত শব্দার্থ কাব্যরসিকদের আহ্লাদজনক বক্রতাময় কবিব্যাপারপূর্ণ রচনায় বিন্যস্ত হলেই তবে তা কাব্য হয়ে থাকে। এখানে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, কুন্তক-পূর্ব আলংকারিকরা কাব্যের বহিরঙ্গ প্রসাধনকলার ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু কাব্য যে অলৌকিক ও অনির্বচনীয় আনন্দের আকর, সেকথাটা কেউ বলেননি। শব্দ ও অর্থের মিলিত রূপকে ভামহ সাহিত্য বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু সেটি স্বীকার করে নিয়ে একটি অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত করে দিলেন। শর্তটি হল, যতক্ষণ না তা অলৌকিক আনন্দ সৃষ্টি করতে পারছে, ততক্ষণ সে রচনা কাব্যপদবাচ্য হবে না। এখন প্রশ্ন হল, এই অলৌকিকতা বিধানের জন্য কবিকে কী করতে হবে? কুন্তক ও প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন বিন্যাসভঙ্গির ওপরে। কেমন হবে সেই বিন্যাসভঙ্গি? কুন্তকের জবাব— সেটি হবে ‘অন্যূনানতিরিক্তত্ব-মনোহারিণী, পরস্পরস্পর্দ্ধিত্ব রমণীয়ো’। শব্দ ও অর্থের অবস্থান হবে সাম্যঞ্জভগ, অর্থাৎ এই দুইয়ের মিলন্তের ভিতর থাকবে সেই বিশেষত্ব যেখানে বাচ্য বা বাচক কেউ কারো থেকে বড়ো কিংবা ছোটো হবে না। কাব্য রচনাকালে কবি যে বিন্যাসভঙ্গি অবলম্বন করেন কুন্তকের ভাষায় সেটাই হল ‘বক্রতা’, যার ছয়প্রকার শ্রেণি তিনি নির্দেশ করেছেন। বক্রতাপ্রস্থানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সেগুলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১৮.৪ কুন্তকের দৃষ্টিতে বক্রতা

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে দেখে গেল, অতি পরিচিত সাধারণ কথনভঙ্গি থেকে যা পৃথক এবং কবির নিজস্ব বাণীনির্মিতি, সেটাই হল বক্রোক্তি। পাশ্চাত্যের শৈলীবিজ্ঞানীদের ভাবনার সঙ্গে এর একটা অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য আছে। প্রাগের ভাষাতাত্ত্বিকরা যেমন Poetic language-এ নানা ধরনের ‘element’-এর সন্ধান পেয়েছেন, তেমনি কাব্যবাণীর বিশিষ্টতার অন্বেষণ করতে গিয়ে কুন্তক খুঁজে পেয়েছেন মোট ছয় ধরনের বক্রতা। এগুলি হল— বর্ণবিন্যাস বক্রতা, পদপূর্বার্ধ বক্রতা, পদপরার্ধ বক্রতা, বাক্যবক্রতা, প্রকরণবক্রতা ও প্রবন্ধবক্রতা।

(১) বর্ণবিন্যাস বক্রতা—এই বক্রতা নির্ভর করে বর্ণের বিচিত্র বিন্যাসের ওপর। একই বর্ণের কৌশলী ব্যবহার এ ধরনের বক্রতা সৃষ্টি করে। অনুপ্রাস বা যমক অলংকার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবিরা এটি ফুটিয়ে তোলেন। যেমন— চল চপলার চকির চমকে করিছে চরণ বিচরণ।

(২) পদপূর্বার্ধা বক্রতা— সমার্থক শব্দ, রূঢ়ি শব্দ, লিঙ্গ, ক্রিয়া, বিশেষণ ইত্যাদির বিশিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা যে কাব্যিক চমৎকারিত্ব ফুটে ওঠে সেটি পদপূর্বার্ধ বক্রতা। যেমন—ধোঁয়া+কুয়াশায়=ধোঁয়াশা।

(৩) পদপরার্ধ বক্রতা— পদের উত্তরাংশ অর্থাৎ প্রত্যয় এবং সমাসের স্থলে উত্তরপদ দিয়ে কাব্যভাষায় বৈচিত্র্য গড়ে উঠলে তাকে বলে পদপরার্ধে বক্রতা। যেমন—ম্যামথ-মলিন।

(৪) বাক্যবক্রতা— কাব্যবস্তুর উদার, প্রাণবন্ত, সুন্দর বর্ণনার দ্বারা কবি যে রমণীয়তা সৃষ্টি করেন। এই সূত্রে কুন্তক কবিপ্রতিভার অনন্ত বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। কবিপ্রতিভা যেমন অনন্ত, তেমনি বাক্যসৃষ্টির বৈচিত্র্যও অনন্ত।

(৫) প্রকরণ বক্রতা— মূল কাব্যবস্তুর আনুকূল্য করে যদি অতিরিক্ত কোনো বিষয়বস্তু তির্যকভাবে উপস্থাপিত হয়, তখন সৃষ্টি হয় প্রকরণ বক্রতার। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসে মোবারক-জেবউন্নিসার বা ঔরংজেব-নির্মল কুমারীর উপ-কাহিনি।

(৬) প্রবন্ধবক্রতা—এটি হল সমগ্র রচনার মধ্যে ফুটে ওঠা সাহিত্যসৌন্দর্য। এই বক্রতায় দেখা যায়, সমগ্র রচনাটি জুড়ে বিষয়বস্তু ক্রমশ পরিস্ফুট হতে হতে শেষে রম্য রসোত্তীর্ণতায় পৌঁছাতে। এই প্রবন্ধবক্রতার ধারণাতেই কুন্তকের সর্বাধিক বিশিষ্টতা, মৌলিকতা ও আধুনিক মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা রীতিবাদ, গুণবাদ, অলংকারবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রস্থান যেখানে একটি বিচ্ছিন্ন অংশের বিচারে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে, সেখানে কুন্তকই প্রথম বললেন, কাব্য বা সাহিত্য কোনো বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, তা একটি সামগ্রিক সংহত সৃষ্টি। তাকে বিচারও করতে হবে সেইভাবে। তবেই তার অন্তর্নিহিত প্রকৃত সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য বোঝা যাবে।

১৮.৫ সংক্ষিপ্তসার

বক্রোক্তিকে প্রথম দিকে অলংকারবাদীরা একটি শব্দালংকার হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু পরে তার এই সংকীর্ণ পরিসর থেকে সরিয়ে এনে একটি বিশিষ্ট কাব্যতাত্ত্বিক প্রস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিলেন আচার্য কুন্তক। ‘বক্রোক্তিজীবিত’ নামক গ্রন্থে বক্রোক্তির স্বরূপ ও তার ছয় প্রকার বক্রতা সম্পর্কে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বক্রোক্তিই হল কাব্যের প্রাণ।

বক্রোক্তি বিষয়ে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন ভামহ। তাঁর মতে, কাব্যের প্রাণ স্বরূপ বলে বিবেচিত হয় অলংকার, আর অলংকারের উপজীব্য হল বক্রোক্তি। সাদামাঠা কথাকে একটু তির্যকভাবে বলাই অলংকারের কাজ। সুতরাং অলংকারমাত্রেই বক্রোক্তি। ভামহের ভাষায়,—‘সৈধা সর্বৈব বক্রোক্তি’। এখানে বক্রোক্তি বলতে তিনি মূলত ‘twisted statement’কে বুঝিয়েছেন। আচার্য দণ্ডীও মনে করতেন বক্রোক্তি হল সব অলংকারের মূল এবং এটি শ্লেষের ওপর নির্ভরশীল। ভামহ ও দণ্ডী যতটা ব্যাপ্তার্থে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন, আচার্য বামন কিন্তু সেটা স্বীকার করলেন না। তিনি বিষয়টিকে সাদৃশ্যমূলক লক্ষণার স্তরেই রেখে দিলেন। বামনের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে আলংকারিক রুদ্রট বক্রোক্তির তাৎপর্যকে আরও

করলেন সংকুচিত। তাঁর কাছে বক্রোক্তি কথার অর্থ দাঁড়াল কবিদের বাক্‌ছলনাশ্রিত একটি শব্দালংকার, যার দুটি ভাগ—শ্লেষ ও কাকু।

সুতরাং দেখা গেল, বক্রোক্তির আলোচনা দুটি ধারায় প্রথম দিকে এগিয়েছে। একটি ধারাতে বক্রোক্তির মাধ্যমে অলংকারের অলঙ্কারত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে, অন্য ধারাতে একটি বিশেষ শব্দালংকারকে বক্রোক্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু বক্রোক্তি বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আচার্য কুন্তক। তিনি যদিও ভামহকে ভিত্তি ধরে এগিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন বক্রোক্তি হল কাব্যের সেই ধর্ম যা লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহারকে অতিক্রম করে যায়। ইনি বক্রোক্তি যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা থেকে এমনটা মনে হয় যে, বিচক্ষণ বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বাক্‌ভঙ্গিই হল বক্রোক্তি। কোনো সাধারণ বক্তব্য যখন বাচনকৌশলে রমণীয় হয়ে ওঠে তখন সেই বলার ভঙ্গিটিই হয় বক্রোক্তি। সাধারণ কথন থেকে কবির বাণী যে স্বতন্ত্র নির্মিতি হয়ে ওঠে, তার পিছনে থাকে বক্রতামণ্ডিত সৃজন-কৌশল। কুন্তক এই উপাদানগুলিকে বলেন বক্রতা, যার পরিমাণ ছয়টি। এগুলি হল পদপূর্বার্ধ বক্রতা, পদপরার্ধ বক্রতা, বর্ণবিন্যাসবক্রতা, বাক্য বক্রতা, প্রবন্ধ বক্রতা ও প্রকরণ বক্রতা। কুন্তকের বক্রোক্তি প্রস্থানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের স্টাইলিস্টিকসের কিছু আপাত ও অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য আছে।

১৮.৬ প্রশ্নাবলি

(ক) অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. বক্রোক্তি কথাটির সাধারণ অর্থ কী?

২. আচার্য কুন্তকের গ্রন্থের নাম কী?

৩. সাদশ্যমূলক লক্ষণাই হল বক্রোক্তি। — কথাটি কার?

৪. অলংকার মাত্রেই বক্রোক্তি। — এ অভিমত কে পোষণ করেন?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. বক্রোক্তি বিষয়ে আচার্য ভামহের অভিমত কী ছিল?

২. শ্লেষ বক্রোক্তি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৩. আচার্য দণ্ডী বক্রোক্তিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেন?

৪. বক্রোক্তি ভাবনায় কুন্তকের অভিনবত্ব কোনখানে?

৫. বর্ণবিন্যাসবক্রতা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৬. পদপূর্বার্ধ বক্রতায়— কী কী বিষয় গুরুত্ব পায়?

৭. প্রবন্ধবক্রতা কী বুঝিয়ে লিখুন।

৮. বক্রোক্তি প্রস্থানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শৈলীবিজ্ঞানের সম্পর্ক কী?

(গ) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক :

১. বক্রোক্তিপ্রস্থান বিষয়ে আচার্য কুন্তকের নিজস্ব ভাবনার পরিচয় দিন।

২. কুন্তকের দৃষ্টিতে ছয় প্রকার বক্রতা ব্যাখ্যা করুন।

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

২। সাহিত্য-বিবেক—বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩। কাব্যতত্ত্ব বিচার—দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৪। কাব্যবিচার—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

একক ১৯ : ধ্বনিবাদ

১৯.১ উদ্দেশ্য

১৯.২ প্রস্তাবনা

১৯.৩ মূল আলোচনা

১৯.৪ ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

১৯.৫ সংক্ষিপ্তসার

১৯.৬ প্রশ্নাবলি

১৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৯.১ উদ্দেশ্য

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থান হল ধ্বনিবাদ। এই এককে ধ্বনির সংজ্ঞা, স্বরূপ, ধ্বনির বৃত্তি বা শক্তিভেদ, ধ্বনির শ্রেণিভেদ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রসের সঙ্গে ধ্বনির সম্পর্কও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এই এককটি পাঠ করলে ধ্বনিবাদের উৎপত্তি থেকে তার বিবর্তন, বিভিন্ন অলংকারিকের দৃষ্টিতে ধ্বনির স্বরূপ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

১৯.২ প্রস্তাবনা

কাব্য কাব্যত্ব লাভ করে কোনো বিশেষ গুণে বা ধর্মে— এই জিজ্ঞাসা নিয়েই ভারতীয় আলংকারিকরা যাত্রা শুরু করেছিলেন কাব্যাত্মা অন্বেষণের। প্রথমেই উঠে এসেছিল শব্দ, তার অর্থ, আর তাদের সহিতত্বের কথা। কিন্তু সেখানেই জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হয়নি বলে একদল আলংকারিক অলংকারের মধ্যে আত্মার উপস্থিতির কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল সে সিদ্ধান্তও ভ্রান্তিময়, তখন বামনের মতো আলংকারিক রীতিকেই কাব্যের আত্মা বলে রায় দেন। সেটাও ছিল ভুল একটা নির্ণয়। সুতরাং জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি এখানেও হয়নি। এল পরে বক্রোক্তিবাদীরা। বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বাক্‌ভঙ্গিকেই গণ্য করলেন কাব্যের রমণীয় হয়ে ওঠার রহস্য হিসেবে। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল সে সিদ্ধান্তও সঠিক নয়। এরপর আবির্ভূত হলেন ধ্বনিবাদীরা। তাঁরা দেখলেন, কেবল অলংকার, যোজনা করলে, কিংবা চমৎকার রীতি অনুসরণ করলে অথবা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বাকপ্রতিমা প্রয়োগ করলে কাব্য রমণীয় হয়ে ওঠে না, এদের অতিরিক্ত আরও এমন কোনো উপাদান চাই, যা সাধারণ বাক্যকেই আস্বাদ্যমান কাব্য করে তোলে। 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে ধ্বনিপ্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আনন্দবর্ধন তাই লিখলেন—

'প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব বস্তুস্তি বাণীষু মহাকবিনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু।"

এর অর্থ হল—রমণীদেহের লাবণ্য যেমন তার শরীর সংস্থানের অতিরিক্ত অন্য বস্তু, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে, যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গি ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের অতিরিক্ত আরও কিছু। এই অতিরিক্ত আরও কিছু-কেই ধ্বনিবাদীরা চিহ্নিত করেছেন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা নামে।

১৯.৩ মূল আলোচনা

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ হল 'ধ্বনি'। ইংরেজিতে যাকে sound বলে, এ ধ্বনি সে ধ্বনি নয়। এ ধ্বনির ইংরেজি পরিভাষা হল 'suggestion' বা 'ব্যঞ্জনা'। যাইহোক, প্রাচ্য আলংকারিকরা 'ধ্বনি' শব্দটির মাধ্যমে অনুভূতিগম্য এক চেতনার কথা বুঝিয়েছেন। অবশ্য 'ধ্বনি' বিষয়টি নিয়ে প্রথম চর্চা করেন বৈয়াকরণরা। তাঁদের মতে, কানে শোনা যায় এমন শব্দই হল ধ্বনি, যার লিখিত প্রতীক হল বর্ণ। কিন্তু অলংকারশাস্ত্রের ধ্বনি বলতে বোঝায় কাব্যের এমন একটি অর্থ যা কাব্যের শব্দরাশিকে অতিক্রম করে অতিরিক্ত কোনো ব্যঞ্জনার আভাস আনে। ব্যাকরণবিদরা শব্দের দুটি বৃত্তি বা শক্তির কথা বলেছেন। এদের প্রথমটি হল 'অভিধা' ও দ্বিতীয়টি 'লক্ষণা'। যে শক্তির সাহায্যে শব্দ সরাসরি তার প্রত্যক্ষ অর্থকে বুঝিয়ে থাকে, তাকে বলে অভিধা। এটাই শব্দের মুখ্য শক্তি। এই শক্তির দ্বারা শব্দ থেকে যে-অর্থ আমরা পাই সেটি ব্যাঙ্গার্থ নামে পরিচিত। যেমন—জল, মাটি, আকাশ, বই, খাতা, গাছ, ফুল, পাখি, মানুষ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে-অর্থ ধরা পড়ে সেটি বাচ্যার্থ। আর যে-শক্তির সাহায্যে এই অর্থ নিষ্পাশিত হয়, সেটি অভিধাশক্তি। আর যখন অভিধা দ্বারা প্রকৃত অর্থে বোধ জন্মায় না, বরং অন্য কোনো শক্তির সহায়তায় শব্দটির ভেতরের অর্থ প্রকাশ পায়, তখন সেই শক্তিকে বলে লক্ষণাশক্তি। এই শক্তির দ্বারা শব্দ থেকে যে-অর্থ পাওয়া যায় সেটি লক্ষ্যার্থ নামে পরিচিত। যেমন—'রবীন্দ্রনাথকে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতিকে। তবে লক্ষণা মুখ্যত শব্দের শক্তি নয়, এটা আসলে বাক্যেরই শক্তি। সেজন্য কেউ কেউ লক্ষ্যার্থকে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী অলংকার বলে মনে করেন।

অভিধা ও লক্ষণা ছাড়া আলংকারিকরা শব্দের আর একটি শব্দের কথা বলেছেন। সেটি হল তাৎপর্য শক্তি। বহু পদ মিলে হয় বাক্য। বাক্যে পদগুলি সন্নিবিষ্ট হয় একটি একমুখী অন্বয়বোধের দ্বারা। বাক্য যে-শক্তি দ্বারা একটি অখণ্ড অর্থ প্রকাশ করে তার নাম তাৎপর্য শক্তি। যেমন—'ঘুম ঘুম নিশ্চিন্ত / নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন তো।' এ কবিতাংশ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ঘুমের ঘোরে' কবিতার, যেখানে কবি পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন সর্বরোগহর ঘুমিওপ্যাথি দিয়ে। আয়েসি মানুষের নিদ্রালুতাকে ব্যঙ্গ করে কবি আসলে অসল ব্যক্তিদের আলসেমিকে বিদ্রূপ বিদ্ধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এতেও ধ্বনিবাদীরা সন্তুষ্ট হননি। তাই 'ধ্বন্যালোক'-এ আনন্দবর্ধন লিখেছেন—

'শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেনৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্।।'

অর্থাৎ, কাব্যের যা সার অর্থ কেবল শব্দার্থের জ্ঞানে তার জ্ঞান হয় না, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞেরাই সে কাব্যার্থ অর্থ জানতে পারে।

ধ্বনিবাদীদের যাত্রারম্ভ হয়েছে এরপর থেকে। তাঁদের বক্তব্য, শব্দের পূর্বোক্ত তিন শক্তি (অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য) ও তাদের থেকে নিষ্পন্ন অর্থ দ্বারা কখনোই কাব্যসৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারা যায় না। যদিও প্রয়োজন লক্ষণা তাৎপর্য বাক্যনির্ভর, তবুও স্থূল অর্থে তা বাচ্যার্থকেই প্রকাশ করে। লক্ষণা বাচ্যার্থেরই একটুখানি সম্প্রসারিত রূপ দেয় মাত্র। আর তাৎপর্যে থাকে প্রসঙ্গত অর্থ। তাই ধ্বনিবাদীদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল, বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যণার্থের জ্ঞান যার আছে তারই যে কাব্যরসজ্ঞান ঘটবে এমনটা নয়। উপরোক্ত তিন শক্তির দ্বারা কাব্যের কাব্যত্ব উপলব্ধি করা যায় না। সেটি পেতে গেলে চাই চতুর্থ এক শক্তির সহায়তা। সে শক্তির নাম ব্যঞ্জনাশক্তি এবং সে শক্তির দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বলে ব্যাঙ্গার্থ। আলংকারিকদের মতে, এই ব্যঞ্জনাশক্তিরই অপর নাম হল 'ধ্বনি', এই ধ্বনিই দেয় শব্দ ও অর্থের অতিরিক্ত অভিব্যঞ্জিত অর্থ বা চেতনার অনুভূতি। আনন্দবর্ধন ধ্বনির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

'যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ—
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ।।'

এর অর্থ হল— যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই ধ্বনি বলেছেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ধ্বনিতে শব্দের বাচ্যার্থ কি একেবারেই বর্জিত। আনন্দবর্ধন কিন্তু সেকথা বলেননি। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। কাব্যের অর্থ দুইভাবে নিষ্পন্ন হয়— প্রথমত, অভিধার পথ ধরে ও দ্বিতীয়ত ব্যঞ্জনার হাত ধরে। অভিধা শক্তি দ্বারা শব্দের মুখ্য অর্থ ও ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা প্রতীয়মান অর্থ সাধিত হয়ে থাকে। এই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিকেই ধ্বনিবাদীরা বলেছেন কাব্যের আত্মা—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনি'। অনেক সময় কবিদের ব্যবহৃত অলংকার দেখলে মনে হয়, সেটি বোধহয় ধ্বনি। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বিষয়টি ছিল এই যে, বিবাহ প্রসঙ্গে ভাবী স্বামীর কথায় কুমারীরা যে লজ্জাবনত হয় সেটা আসলে তাদের একপ্রকারের পুলক, যা অন্তরের স্পৃহাকে সূচিত করে। শ্লোকটি এই—

'কৃতে বরকথালাপে কুমার্যঃ পুলকোদ্গমৈ।
সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ।।'

কিন্তু এরই পাশে যদি রাখা যায় কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্'-এর এই চরণ—

'এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রানি গণয়ামাস পাবর্তী।।'

তখনই বুঝতে পারা যায়, কোনটি যথার্থ কাব্য এবং কোনটি নয়। প্রথমটিতে কেবল একটি সংবাদ ছিল, দ্বিতীয়টিতে তা বিশেষায়িত হয়েছে নির্দিষ্ট একটি চরিত্রে। এখানে বিবাহোৎসুকা পাবর্তীর লীলাকমলের পত্র গণনায় যে পূর্বরাগের লজ্জা ব্যঞ্জিত হয়েছে, তা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে চলে গেল বহুদূরে। ধ্বনির স্বরূপ বোঝাতে অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের পরে' কবিতার এই চার চরণ উদ্ধৃত করেছেন—

'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিঃশ্বাসী
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়।'

এখানে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সূত্রে মানবমনের চিরন্তন বিরহখানি বাক্যকে ছাড়িয়ে চলে যায় বহু দূরে পাঠকের হৃদয়ের ভিতরে। আর তখনই সে কাব্যের শিরোপা লাভ করে।

বস্তুত ধ্বনিবাদ ভরতীয় অলংকারশাস্ত্রের এক অসামান্য আবিষ্কার। এর আগে যেসব প্রস্থানের জন্ম হয়েছে, যেমন দেহাত্মবাদ, অলংকারবাদ, গুণবাদ, রীতিবাদ, বক্রোক্তিবাদ—সেখানে কাব্যশাস্ত্রীদের দৃষ্টি প্রধানত ছিল কাব্যশরীরের ওপর। আনন্দবর্ধনই প্রথম সেই দৃষ্টি আত্মার সন্ধান করলেন যার শব্দ ও তার নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে সীমিত রইল না, তা নিয়ে এল অর্থান্তরের ব্যঞ্জনা। নিরপেক্ষভাবে দেখলে, কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে ধ্বনিবাদের গুরুত্ব অসীম। ধ্বনিবাদেই প্রথম কাব্যের অন্তর্লোকে তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি পড়েছিল। কাব্য যে শব্দ ও তার অর্থ, অলংকার ও প্রয়োগরীতির তুলনায় স্বতন্ত্র এক অনুভূতিগম্য বস্তু, যা বুদ্ধি ও রসবাদের সঙ্গেও ঐক্য রচনা করেছে রসকে ধ্বনির সর্বোচ্চ একটি বিভাগ রূপে গণ্য করে। এই জন্যই অতুলচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন, 'কাব্যের আত্মা ধ্বনি বলে যাঁরা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা রস বলে তাঁরা উপসংহার করেছেন।' ধ্বনিবাদের আগের যুগ ও তার পরের যুগে যে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়, তার কারণ মধ্যবর্তী স্তরে মনন প্রধান তত্ত্ব হিসেবে ধ্বনিবাদের আবিষ্কার। যদিও এই আবিষ্কারকে মনোরথের মতো কোনো কোনো কটু সমালোচক তীব্র ব্যঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে ধ্বনিবাদের সত্য অস্বীকৃত হয় না। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে ধ্বনিবাদ তাই একটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১৯.৪ ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

বিবিধ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আচার্য আনন্দবর্ধন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ধারায় ধ্বনিবাদকে যেমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, তেমনি উদাহরণসহ ধ্বনির বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর কাছে ধ্বনি হল বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের অতিরিক্ত একটি ব্যঞ্জনা এবং সকল কাব্যে অর্থব্যঞ্জনার ধরণ বা প্রকৃতি কখনই অভিন্ন নয়। কোথাও ব্যঞ্জনার স্থলে প্রাধান্য লাভ করে অভিধা, আবার কোথাও লক্ষণাকে আশ্রয় করে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। তবে ব্যঞ্জনাকেও প্রাথমিকভাবে বাচ্যার্থ অবলম্বন করতে হয়। আলোকার্থী যেমন অগ্নিশিখার প্রতি যত্নবান হন, তেমনি ব্যঞ্জনাকে নির্ভর করতে হয় বাচ্যার্থের ওপর। অভিধা থেকে ব্যঞ্জনায় যাওয়ার পথটি কোথাও অনুধাবনীয়, আবার কোথাও তা অনুভব অতিক্রম। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হতে পারে যেমন বস্তুকে অবলম্বন করে, তেমনি অলংকার, ভাব কিংবা রসকে ঘিরে। তাই ধ্বনির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে শ্রেণিভেদ যা নিচের ছকটিকে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে।

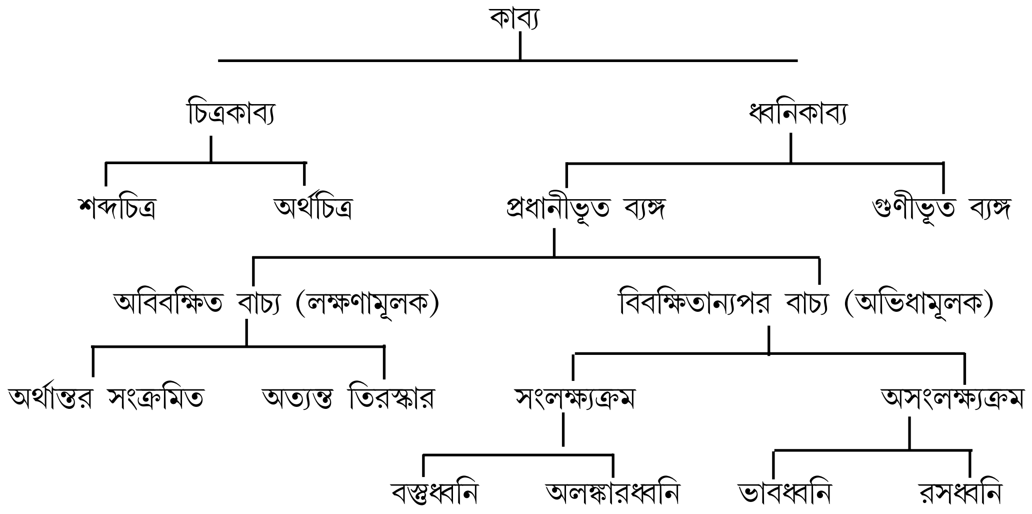

কাব্য হল কবির কল্পনাসৃষ্ট এমন এক ভাষাময় রূপনির্মাণ যা পাঠকের আনন্দবিধান করে। কিন্তু কোনো কোনো কবি আছেন যাঁরা নিতান্ত বস্তুবিমুখ। চিত্রধর্মী কাব্য লেখেন তাঁরা। শুধু ছবি আঁকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেন। পাঠক তা থেকে রসের খুব একটা সন্ধান পান না। এই জাতীয় কাব্যকে চিত্রকাব্য বলে। চিত্রকাব্যে পাঠকের মন ভোলাতে কবির অবলম্বন হয়ে ওঠে অলংকার। এই অলংকার কাব্যে দুভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। যখন অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক ইত্যাদির মতো শব্দালংকার ব্যবহার করে কবি রচনাকে বাহ্যিকভাবে আকর্ষণীয় করে তোলেন, তখন কাব্য পরিণত হয় শব্দচিত্রে। যেমন—'হেরিয়ে গগন তারা মনে হল প্রাণের তারা / শুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তারা।' এখানে 'তারা' শব্দটি চারবার ব্যবহৃত, তিনটি পৃথক অর্থে। অন্যদিকে অর্থচিত্রে থাকে অর্থালংকারের প্রাধান্য। প্রধানত এ ধরনের কবিতা নীতিমুখ্য হয়ে থাকে। যেমন—'জাল বলে পঞ্চ আমি উঠাব না আর। /জেলে বলে, মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।।'

যে কাব্য ধ্বনিমুক্ত বা ব্যঞ্জনাময় তা ধ্বনিকাব্য হিসেবে বিবেচিত। তবে ব্যঙ্গ বা ব্যঞ্জনা যেখানে চাপা থাকে ব্যাচ্যার্থের পক্ষপুটে, তখন সেটি হয় গুণীভূত ব্যঙ্গ। ব্যঙ্গ অর্থ এখানে বাক্যকে অতিক্রম করে যেতে পারে না বরং বাচ্যের বাচ্যত্ব বজায় রেখে তাকে সুন্দরতর করে তোলে। উদাহরণ—

> 'দুই ধারে একটি প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?
> অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়ে আমারি মনের ভুল?'

গুণীভূত ব্যঙ্গের বিপরীত হল প্রধানীভূত ব্যঙ্গ। অর্থাৎ যেখানে অভিধাকে অতিক্রম করে প্রাধান্য পায় ব্যঞ্জিত অর্থ। এর দুইভাগের মধ্যে প্রথমটি হল অবিবক্ষিত বাচ্য। 'বিবক্ষা' শব্দের অর্থ হল বলার ইচ্ছা। সুতরাং অবিবক্ষিত বাচ্যে কবির বক্তব্যটি বাচ্যার্থে পাঠক গ্রহণ করুক এটা কবির ইচ্ছা নয়। এই অবিবক্ষিত ধ্বনি দুই ধরনের—(১) অর্থান্তর সংক্রমিত ও (২) অত্যন্ত তিরস্কৃত। এর প্রথটিতে যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থ বজায় রেখে অন্য অর্থকে বোঝায়। যেমন—'তোমাকে একটা কথা বলি, তোমার সেখানে না যাওয়াই উচিত।' এখানে 'বলি' শব্দের বাচ্যার্থ 'বলা' এবং একই সঙ্গে অন্য অর্থ 'পরামর্শ দেওয়া'। কিন্তু ধ্বনিটি

তখনই অত্যন্ত তিরস্কৃত হবে যখন বাচ্যার্থ নিজের অর্থ পরিত্যাগ করে নতুন অর্থের প্রতি ধাবিত হবে। যেমন 'অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে / চিরদিন, ভোরে লয়ে প্রলয় তিমিরে / চলিয়াছি।' এই কাব্যাংশে চাক্ষুষভাবে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে একপাশে সারিয়ে রেখে প্রধান হয়ে উঠছে তাঁর স্নেহান্ধতা, যে অন্ধ স্নেহ পুত্র দুর্যোধনের অন্যায় দেখেও দেখছে না।

অন্যদিকে বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য বনিতে বাচ্যার্থ আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই ব্যঞ্জক হয়ে দেখিয়ে দেয় লোকাতীত অর্থকে। এরও দুটি শ্রেণিবিভাগ রয়েছে— (ক) সংলক্ষ্যক্রম ও (খ) অসংলক্ষ্যক্রম। যেখানে বাচ্যার্থ থেকে কীভাবে ব্যঞ্জনা দ্যোতিত হচ্ছে তার পূর্বাপর সম্বন্ধটি লক্ষ করা যায়, তখন সেটি হয় সংলক্ষ্যক্রম। তবে এখানে পাঠকের কাছে আগে পৌঁছায় বাচ্যার্থ, পরে ব্যঙ্গ্যার্থ। একটি উদাহরণ—

'যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতল পানে।
যথা তথা বসে থাকি বাঁশিটি শুনি গো যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে।।

এখানে বাহ্যত কৃষ্ণের প্রতি রাধা বিরাগ দেখালেও প্রকৃত তাৎপর্যে প্রিয়তমের প্রতি রাধার প্রবল অনুরাগই ব্যঞ্জিত হচ্ছে। অন্যদিকে যখন বাচ্যার্থ থেকে ব্যাঙ্গ্যার্থে যাত্রার ক্রমটি থাকা সত্ত্বেও যদি তাকে লক্ষ করা না যায়, তখন অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির আবির্ভাব ঘটে। যেমন—

'... স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া; বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবচার; সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে।

এই অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল রসধ্বনি, যেখানে বাচ্যার্থ থেকে সরাসরি যে ব্যঙ্গ্যার্থ আক্ষিপ্ত হয় তা সাক্ষাৎভাবে রসকে উদ্বোধিত করে তোলে। এই ধ্বনির উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতাটি। এ কবিতার সূচনায় রয়েছে দূর দিগন্তে চলাকার নিরুদ্দেশ উড়ে চলা। কবি সেই চিত্র রচনার মধ্য দিয়ে পাঠকহৃদয়ে বিস্ময়মোহিত অদ্ভূত রসের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু তাকে অতিক্রম করে এ কবিতায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এক মহাবৈশ্বিক বেগচঞ্চলতার প্রাণময় বিকাশ।

১৯.৫ সংক্ষিপ্তসার

'ধ্বনি' অলংকারশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। কাব্যের ধ্বনি বলতে বোঝায় কাব্যের একটি অর্থ যা কাব্যের শব্দরাশি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বোঝায় না, বোঝায় ইঙ্গিতে আভাসে ব্যঞ্জনায়, কাব্যের বাচ্যার্থের অনুরণনক্রমে। ধ্বনিবাদীদের মতে, ধ্বনি যা ব্যঞ্জনাই হল কাব্যের আত্মা। আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে ধ্বনিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আনন্দবর্ধন সম্ভবত নবম শতকের শেষে আবির্ভূত হন। ধ্বনিবাদ

সম্পর্কে আনন্দবর্ধন যে তত্ত্ব প্রচার করেন সম্ভবত তার আগে ধ্বনির কারিকা বা সূত্র কোনো অজ্ঞাতনামা লেখক দ্বারা নির্মিত হয়েছিল— এমন কথা কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন। পণ্ডিত জগন্নাথের মতে, ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি প্রকারান্তরে ধ্বনিকারের আগেও ছিল। যাইহোক, ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে ধ্বনিপ্রস্থান এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, ধ্বনি-পূর্ব ও ধ্বনি-পরবর্তী যুগ কল্পনা করেছেন কাব্যতত্ত্বের কোনো কোনো ইতিহাসকার। এতেই এ মতবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

ধ্বনির স্বরূপকে বুঝতে গেলে প্রয়োজন শব্দের বৃত্তি বা শক্তি সম্পর্কিত ধারণার জ্ঞান। অভিধা ও লক্ষণা নামে দুই শক্তির কথা স্বীকার করেছেন বৈয়াকরণরা। এর প্রথমটির দ্বারা শব্দের বাচ্যার্থে পৌঁছানো যায়,—যা কিনা শব্দের মুখ্যশক্তি। শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থ ধরা পড়ে সেটাই বাচ্যার্থ। আর যখন অভিধানে অতিক্রম করে অন্য শক্তির সাহায্যে অর্থোদ্ধার করতে হয়, তখন সেটি হয় লক্ষণাশক্তি। এ শক্তির দ্বারা শব্দের লক্ষ্যার্থে পৌঁছানো যায়। লক্ষণা দুই প্রকার— রূঢ়ি লক্ষণা ও প্রয়োজন লক্ষণা। অভিধা ও লক্ষণা ছাড়া শব্দের আর একটি শক্তি আছে, যার নাম তাৎপর্য শক্তি। এই শক্তির দ্বারা পদবদ্ধ একটি সম্পূর্ণ বাক্যের অখণ্ড অর্থ দ্যোতিত হয়। কিন্তু ধ্বনিবাদীরা দেখলেন যে, শব্দের ওই তিন শক্তির দ্বারা কাব্যরসের প্রকৃত উপলব্ধি সম্ভব নয়। কাব্যের কাব্যত্ব যথার্থ তাৎপর্যে উপলব্ধি করতে গেলে শব্দের আর একটি শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন ধ্বনি। এটি শব্দ বা তার অর্থকে অতিক্রম করে বিষয়ান্তরের সূচনা করে। এই শক্তির দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বলে ব্যঞ্জার্থ। ধ্বনিবাদীরা ব্যঞ্জনার তারতম্য অনুসারে ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করেছেন। প্রধানীভূত ব্যঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন অবিবক্ষিত ও বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি নামে। দ্বিতীয় প্রকারের ধ্বনির চাররকম ভেদ দেখিয়েছেন তাঁরা। এগুলি যথাক্রমে বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি, ভাবধ্বনি ও রসধ্বনি। আনন্দবর্ধন, অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখ আলংকারিক এই রসধ্বনিকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। আর তাই তখনই কাব্যের আত্মার সন্ধানে ধ্বনিবাদীরাও কেবল ধ্বনিতেই থেমে থাকেন না, পৌঁছে যান রসে—রসবাদে।

১৯.৬ প্রশ্নাবলী

(ক) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. অভিধা কী? লক্ষণা কী?

২. 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনি'—কথাটি কাদের?

৩. বাচ্যার্থ কী? লক্ষ্যার্থ কী?

৪. চিত্রকাব্য কয় প্রকার ও কী কী?

৫. অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনি উদাহরণ দিন।

৬. আনন্দবর্ধনের গ্রন্থটির নাম কী? তিনি কোন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. ধ্বনি বলতে আলংকারিকরা কী বুঝিয়েছেন?

২. অভিধা ও লক্ষণার তুলনায় ব্যঞ্জনা কোথায় পৃথক?

৩. শব্দের তাৎপর্য শক্তি কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

৪. আচার্য আনন্দবর্ধন প্রদত্ত ধ্বনির সংজ্ঞা লিখুন।

৫. ধ্বনিপ্রস্থানের সঙ্গে রসপ্রস্থানের ঐক্য কীভাবে রচিত হয়েছে?

৬. ধ্ববনিকাব্য কাকে বলে?

৭. গুণীভূত ব্যঙ্গ্য কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

(গ) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক :

১. 'ধ্বনিবাদ ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের এক অসামান্য আবিষ্কার।' — কথাটিকে ব্যাখ্যা করুন।

২. ছক সহ ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করে প্রত্যেকটি বিভাগ সম্পর্কে লিখুন।

৩. সকল ধ্বনির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল রসধ্বনি। — মন্তব্যটি বিচার করুন।

৪. আচার্য আনন্দবর্ধন অনুসারে ধ্বনিপ্রস্থান বিষয়ে বিস্তৃত লিখুন।

১৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। কাব্যালোক—সুধীরকুমার দাশগুপ্ত।

২। কাব্যতত্ত্ব বিচার—দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৩। সাহিত্যতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—হীরেন চট্টোপাধ্যায়।

৪। সাহিত্য মীমাংসা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

একক ২০ : রসবাদ

২০.১ উদ্দেশ্য

২০.২ প্রস্তাবনা

২০.৩ মূল আলোচনা

২০.৪ রসের উপাদান

২০.৫ রসসৃষ্টির কৌশল

২০.৬ সংক্ষিপ্তসার

২০.৭ প্রশ্নাবলী

২০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২০.১ উদ্দেশ্য

কাব্যের আত্মার সন্ধানে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রীরা দেহাত্মবাদ থেকে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল রসবাদে। এই এককে সেই রসবাদ সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যাবে। রস বিস্তুটি কী, অর্থাৎ তার সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য, রসের উপাদান, রসের উৎপত্তি কৌশল, নানা রসের শ্রেণিবিভাগ ও সকল প্রস্থানের মধ্যে রসপ্রস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারা যাবে।

২০.২ প্রস্তাবনা

ভারতীয় আলংকারিকেরা কাব্যাত্মার স্বরূপ সন্ধানে বিশেষ কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। সেজন্য একের পর এক নানা প্রস্থান গড়ে উঠেছে। কাব্যের বহিরঙ্গ বিচার ছেড়ে অন্তরঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন ধ্বনিবাদীরা। তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল, বাচ্য নয়, ব্যঞ্জনাই কাব্যের আত্মা এবং তাঁরা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন একই বিষয়বস্তু নিয়েও প্রতিভার তারতম্যে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতের কাব্য রচিত হচ্ছে। পরবর্তীকালে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, এই ব্যঞ্জনা কীসের ব্যঞ্জনা? রসবাদী আলংকারিকরা বললেন এ ব্যঞ্জনা রসের ব্যঞ্জনা। মনে রাখতে হবে, রসের প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে তুলেছিলেন আচার্য ভরত, যিনি ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের সূচনাকার ছিলেন বলে পণ্ডিতগণের অভিমত। তিনি 'নাট্যশাস্ত্র'-এ রস বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত করলেও এককালে তা অন্যান্য প্রস্থান-ভাবনার দ্বারা চাপা পড়ে যায়। অনেক পরে এই মতবাদটি শ্রেষ্ঠ কাব্যতত্ত্ব হিসেব স্বীকৃতি পায়।

২০.৩ মূল আলোচনা

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে রসপ্রস্থানের মূল্য অদ্বিতীয়। রসপ্রস্থানবাদীরা রসকেই কেবল কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেন। বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষায়—'বাক্যং, রসাত্মকং কাব্যম্'। রস বলতে এঁরা বুঝিয়েছেন সাহিত্যপাঠজনিত একপ্রকারের আনন্দ সংবেদনাকে যা সহৃদয় পাঠকচিত্তে অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হয়। লৌকিক বস্তুর নির্যাস হিসেবে যেমন অম্ল, তিক্ত, কটু, কষায়, মিষ্ট ও লবণাক্ত এই ছয় প্রকার রস জিহ্বায় আস্বাদিত হয়, তেমনি সাহিত্যবস্তুর নির্যাস হিসেব শৃঙ্গারাদি নয়টি রস রসলিপ্সু পাঠকহৃদয়ে অনুভূত হয়। অভিনবগুপ্ত তাই বলেন, রস হল একপ্রকার মানসিক অবস্থা। বিশ্বনাথের মতে, রস হল আত্মস্বরূপ। ইনি রস ও রসের আস্বাদের মধ্যে ভেদ করতে নারাজ। কারণ, রসের প্রতীতি বা অনুভূতিটিই হচ্ছে রস। একে কোনোমতেই লৌকিক বস্তুর মধ্যে ফেলা যায় না। রতি বাহ্যজগতের একটি ভাব, কিন্তু যখন তা কাব্যে কিংবা নাট্যে পরিবেশিত হয়, তখন তা থেকে যে শৃঙ্গার রসের উৎপত্তি ঘটে, সেটি কখনই লৌকিক নয়। এজন্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা'-য় মন্তব্য করেছেন—'কাব্য ও রসের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ।'

'রস' শব্দটি এসেছে √রস্ ধাতু থেকে, যার অর্থ আস্বাদন করা বা স্নেহার্দ্র করা। এই শব্দটি প্রথম উল্লেখ অবশ্য কাব্যশাস্ত্রে মেলেনি। এর আদি প্রয়োগ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় মণ্ডলের সপ্তম অধ্যায়ে। সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনায় উপনিষদের ঋষি লিখছেন—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' এখানে ব্রহ্মই হয়েছেন রস। একই সঙ্গে এই রস হল আনন্দের অভিব্যক্তি। অর্থাৎ কাব্য-উৎকৃষ্ট রসও আনন্দ-স্বরূপ। ব্রহ্ম আস্বাদনের যা ফল, কাব্যপাঠের ফলও তাই। এজন্য বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যপাঠজনিত আনন্দকে স্বপ্রকাশ, চিন্ময় ও ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলে মন্তব্য করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল, এই রসের অবস্থান কোথায় ও কীভাবে তা উৎপন্ন হয়? অনেকের ধারণা, কাব্যের ভিতর এমন কোনো কোনো উপাদান থাকে যা কিনা রস উৎপন্ন করে। অর্থাৎ কাব্যের উপকরণের মধ্যেই থাকে রসের উৎস। আবার ভিন্নপন্থীদের মতে, রসের আধার হল কবির হৃদয়। কিন্তু রসবাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলংকারিক অভিনব গুপ্ত বললেন, কাব্যের বিষয়বস্তুতে কিংবা কবির হৃদয় মধ্যে রসের অবস্থান নয়, রস থাকে সহৃদয় সামাজিক বা রসজ্ঞ পাঠকের মনে। সহৃদয় সামাজিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'যেষাং কাব্যানুশীলেন অভ্যাসবশাদ্‌বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয় তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়া।' অর্থাৎ দীর্ঘদিন কাব্য পাঠ করতে করতে যাঁর মনটি দর্পণের মতো স্বচ্ছ প্রতিফলকে পরিণত হয়েছে, যিনি কাব্যবর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হতে পারেন, তিনি সহৃদয় সামাজিক। এমন তন্নিষ্ঠ পাঠক যখন কাব্য পাঠে মনোনিবেশ করেন, তখন তাঁর সাংসারিক ও ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির চেতনা পরিলুপ্ত হয়। তাঁর মধ্য থেকে তিরোহিত হয় রজঃগুণ ও তমোগুণ। হৃদয়ে বিরাজ করে কেবল সত্ত্বগুণ। এই অবস্থাকে অভিনবগুপ্ত বলেছেন 'চিত্তবিশ্রান্তি'। অহংচেতনাশূন্য এই অবস্থায় পাঠকমনে শুরু হয় সুসংবিদের আনন্দবর্ণনা এবং তার আস্বাদন সূত্রে পাঠকহৃদয়ে উপনিত হয় রস।

রস যে একটি মানসিক অবস্থা এ বিষয়ে আলংকারিকদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এর যথার্থ স্বরূপ অভিনবগুপ্তের আগে আর কেউ বলতে সক্ষম হননি। তিনি রসের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন সেটা এইরকম—'শব্দসমর্প্যমাণ হৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিত-প্রাঙ্‌নিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগ-সুকুমার-স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ।' দেখা যাচ্ছে যে, এ সংজ্ঞায় রসকে কেবলমাত্র একটি মানসিক বিষয় বলে স্বীকার করেই নেওয়া হয়নি, বরং তা পাঠকের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার বলে মনে করা হয়েছে। রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'-য় রসকে কাব্যের আত্মা বলেছেন—'শব্দার্থৌ তে শরীরং... রস আত্মা।' রস যে কাব্যের আত্মা এবং ধ্বনিবাদীরা যে ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন তা যে রসেই ব্যঞ্জনা, এই মত শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হয়েছে।

২০.৪ রসের উপাদান

রস হল এক বিশেষ ধরনের অনুভূতি যা সাহিত্যপাঠের সূত্রে রসজ্ঞ পাঠকের মনে উদ্ভূত হয়। এই অনুভূতির জাগরণ ঘটাতে সাহায্য করে যে উপকরণ, সেগুলিই রসের উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। রস সম্পর্কিত ধারণা প্রথম দিয়েছিলেন আচার্য ভরত। তিনিই রসের উপাদান নির্দেশ করেছেন এভাবে—'তত্র বিভাবানুভাব-ব্যভিচারী-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।' ভারতের এই উক্তিকে কেউ কেউ রসবাদের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন। আসলে ভরত মুনি এখানে রসনিষ্পত্তির রহস্য জানিয়েছেন কয়েকটি আলংকারিক পরিভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে। এই উক্তি থেকে রসের তিনটি উপাদানের কথা জানা যায়। সেগুলি হল—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব। এরই পাশাপাশি তাঁর আর একটি সূত্র জানাচ্ছে—'ন ভাবহীনহস্তি রসঃ ন রসঃ ভাববর্জিতঃ।' অর্থাৎ রসহীন যেমন ভাব নেই, তেমনি ভাব রসবর্জিত হতে পারে না। এই ভাব বলতে তিনি কিন্তু সাধারণ কোনো আবেগ বা অনুভূতিকে বোঝাননি। পরবর্তীকালের আলংকারিকরা এই বিশেষ ভাবকে স্থায়ীভাব বলে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং পূর্বোক্ত তিনটি ভাবের সঙ্গে স্থায়ীভাবও রসোৎপত্তির উপাদান হিসেবে গণনীয় হয়। এখন এই চার উপাদান বিষয়ে এখানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

(ক) স্থায়ী ভাব : মানবমনে দিনরাত অসংখ্য ভাবের আনাগোনা হচ্ছে। তাদের মধ্যে যে ভাবগুলি শাশ্বত, অক্ষয়, উদয়-বিলয়হীন, ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-জাতি নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে চিরন্তন সংস্কার রূপে বর্তমান, সেগুলিকে স্থায়ী ভাব বলে গণ্য করা হয়। আচার্য ভরত এ ধরনের স্থায়ীভাব হিসেবে আটটিকে নির্দেশ করেছেন। এগুলি হল— রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। পরে সম্ভবত অভিনব গুপ্ত 'শমভাব'কে এদের সঙ্গে যুক্ত করে ভাবের সংখ্যা করেছেন নয়টি। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, 'ভাব' শব্দটিকে লৌকিক চিত্তবৃত্তি এবং সহৃদয় সামাজিকের মনে উদ্রিক্ত ভাব উভয় অর্থেই ব্যবহার করা হয়। বস্তুত 'ভূ' ধাতু থেকে ভাব শব্দের উৎপত্তি। যারা কাব্যার্থকে আস্বাদিত করায় বা যাদের জন্য কাব্যার্থের আস্বাদ গ্রহণ কতে সহৃদয় সামাজিক প্রবৃত্ত হয়, তাকে বলে ভাব। তবে বাস্তব কারণে ফলে উৎপন্ন ভাব এবং কাব্যজাত ভাব কখনই এক নয়। ভরত যেমন আটটি স্থায়ী ভাবের কথা বলেছেন, তেমনি

আটটি সাত্ত্বিক ভাবেরও উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ ও মূর্চ্ছা। যাইহোক, স্থায়ীভাবই বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রসে পরিণত হয়। মোট নয় প্রকার স্থায়ীভাব থেকে নয় প্রকার রসের উদয় ঘটে। পূর্বোক্ত, স্থায়ী ভাবগুলির সূত্রে যথাক্রমে রস উৎপন্ন হয়ে থাকে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। এছাড়া শম ভাব থেকে জন্ম নেয় শান্ত রস।

(খ) বিভাব : বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ'-এ বিভাবের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—'রত্যাদুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।' অর্থাৎ লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক, কাব্যে বা নাটকে নিবেশিত হলে সেটাই বিভাব বলে কথিত হয়। 'বিভাব' শব্দটি করণবাচ্যে নিষ্পন্ন হওয়ায় তা রসানুভূতির কারণকে বোঝায়। বাস্তব জগত মানবমনে সেব কারণে স্থায়ীভাবের উদ্রেক ঘটে, কবির সৃষ্ট কাব্যের জগতে সেইসব কারণগুলিই হল বিভাব। যেমন— বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে দুর্গার মৃত্যু আমাদের মনকে বিষন্ন কর। সাহিত্যের অলৌকিক জগতে দুর্গার এই মৃত্যুকে আমরা বলতে পারি বিভাব। আলংকারিকরা বিভাবকে বিভক্ত করেছেন দুই ভাগে—১. আবলম্বন ও ২. উদ্দীপন। যেসব বস্তু বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা বাহ্য কারণ স্থায়ী ভাবকে জাগিয়ে তুলে রসকে উদ্দীপিত করে তাদেরকে বলে উদ্দীপন বিভাব। যেন—'কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।' এখান 'কালো জল' উদ্দীপন বিভাব, যার কৃষ্ণবর্ণ রাধাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে তার প্রেমিক কৃষ্ণের কথা। ভাব জাগ্রত হওয়ায় পর মুখ্যভাবে যে বস্তুকে বা ব্যক্তিকে অবলম্বন করে রস পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাকেই বলে আলম্বন বিভাব। যেমন—

'আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই তুমি তাই গো—
তোমা ছাড়া এ জগতে মোর
কেহ নাই কিছু নাই গো।'

এখানে 'তুমি' বলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিই আলম্বন বিভাব হয়ে উঠেছে, তাকে কেন্দ্র করেই ভাব বিকশিত।

(গ) অনুভাব : বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে অনুভাবের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন—'লোকে যঃ কার্যরূপঃ সোহনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।' অর্থাৎ হৃদয়ে ভাব জাগ্রত হওয়ার পর যেসব বাহ্যিক কার্যের দ্বারা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের দ্বারা অথবা দৃশ্যমান লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, সাহিত্যে প্রযুক্ত সেই সেই কার্য, সঞ্চালন কিংবা লক্ষণ অনুভাব-নামে কথিত। সোজা কথায়, ভাবের আঙ্গিক বহিঃপ্রকাশ হল অনুভাব। এর মধ্য দিয়ে চিত্তে কী জাতীয় ভাবের আবির্ভাব ঘটেছে তা বোঝা যায়। অনুভাবের একটি দৃষ্টান্ত :

'কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি নয়নপাতে
স্নেহের সাথে।
শুনায়েছি তারে মাথা রাখি পাশে

কত প্রিয় নাম মৃদু মধুভাষে
গুঞ্জর তান করিয়াছি পান জ্যোৎস্নারাতে
যা কিছু মধুর দিয়েছিনু তার দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে।'

এখানে স্নেহ, সোহাগ প্রভৃতি ভাবের শারীরিক বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চুম্বন করা, পাশে মাথা রাখা, মৃদুভাষে প্রিয় নাম শোনানো, তান গুঞ্জরিত করা, দুখানি হাতে কিছু দেওয়া অনুভাবের প্রকাশক।

(ঘ) ব্যাভিচারী ভাব : 'বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ'— এই সংসার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, যে সমস্ত ভাব স্থায়ীর অভিমুখে বিচরণ করে তারাই ব্যাভিচারী। এরা স্থায়ীর মধ্যে একবার ডোবে, একবার ভাসে ('স্থায়িনি উন্মগ্ননিমগ্নাঃ')। বস্তুত স্থায়ীকে সমৃদ্ধ করার জন্য এরা আসে এবং কাজ শেষ হওয়ার পর চলে যায়। স্থায়ীভাবের স্থিরত্ব এদের মধ্যে বজায় থাকে না বলেই এরা ব্যভিচারী নামে অভিহিত। ব্যাভিচারীর অপর নাম সঞ্চারী। এক ভাব থেকে অন্যভাবে যথেচ্ছ সঞ্চারণ করার জন্য এদের এমন নাম। স্থায়ীভাবে যেমন রসে পরিণতি পায়, সঞ্চারীর ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটে না। এরা তাই স্থায়ীভাবেরই অধীন। রাজার অনুচররা তেমন রাজার পশ্চাদ্ধাবন করে, ব্যাভিচারীরাও তাই। এদের মোট সংখ্যা হল তেত্রিশটি ভাবকে ব্যাভিচারী বা সঞ্চারী ভাব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন— নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চাপল, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি, বিবোধ, অমষ, অবহিত্থা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বির্তক। এখানে একটি তথ্য উল্লেখ্য যে ভরত স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবের মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিভাজন-রেখা টানেননি এবং আটটি ভাব কী কারণে স্থায়ী সে ব্যাখ্যারও যুক্তি দেননি। এ বিষয়ে অভিনবগুপ্তই সর্বপ্রথম এই বিভাজনের মনোবিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি প্রদর্শন করেছিলেন। যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' কাব্যের 'সুপোত্থিতা' কবিতায় কবি ব্রীড়া শঙ্কা, ঔৎসুক্য, চিন্তা, চাপল্য, মোহ, স্মৃতি, হর্ষ ইত্যাদি কয়েকটি সঞ্চারী ভাবের সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন :

(ব্রীড়া) — খসিয়া পড়া আঁচলখানি বক্ষে তুলি নিল,
আপন পানে নেহারি, চেয়ে শরমে শিহরিল।
(ঔৎসুক্য) — গলার মালা খুলিয়া লয়ে ধরিয়া দুটি করে
সোনার সুতে যতনে গাঁথা লিখনখানি পড়ে।
(চপলতা) — বারেক মালা গলায় পরে বারেক লহে খুলি,
দুইটি করে চাপিয়া ধরে বুকের কাছে তুলি।
(স্মৃতি) — স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন এমনি মনে লয়,
তুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু - অসীম বিস্ময়।

২০.৫ রসসৃষ্টির কৌশল

প্রশ্ন হল, রসের উপরিউক্ত চতুর্বিধ উপাদান একত্রিত হলেই কি রস উৎপন্ন হয়? এমন একটা সহজ ধারণা তৈরি হতেই পারে আচার্য ভরতের পূর্বোক্ত রসসূত্রে, যেখানে তিনি বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে রস নিষ্পন্ন হওয়ার বিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল যে, এই উপাদানগুলি কোথায় মিলবে? অর্থাৎ একটি নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যবর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে? নাকি, ওই চরিত্রগুলিতে যাঁরা অভিনয় করছেন সেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে? অথবা, যাঁরা নাটকটি দেখছেন সেই দর্শকদের মনের মধ্যে? ভরত তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ দেননি। তাই রসনিষ্পত্তিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে চারটি মতবাদ গড়ে ওঠে। এগুলি ছিল—(অ) ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ (খ) ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ (ই) ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ ও (ঈ) অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ। নিচে এই মতবাদগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(অ) ভট্ট লোল্লটের উৎপত্তিবাদ : 'উৎপত্তি' বলতে বোঝায় যে বস্তু পূর্বে ছিল না, তার আবির্ভাব ঘটা বা নির্মিত হওয়া। যেমন মাটি থেকে ঘটের উৎপত্তি। ভট্টলোল্লটের মতে, নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যাঙ্কিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে রসের প্রকটে উৎপত্তি ঘটে। ধরা যাক, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকটির কথা। এ নাটকে নাটককার অঙ্কিত চরিত্রগুলি মূল চরিত্র। রসের যদি উৎপত্তি ঘটেই থাকে তাহলে নাট্যবর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যেই ঘটছে। এই নাটকটিকে দর্শক যখন রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ করেন, তখন নাটকটির পাত্র-পাত্রী রূপে যেসব নট-নটী অভিনয় করেন সহৃদয় দর্শক তাঁদের সঙ্গে নাট্যবর্ণিত চরিত্রের একাত্মতা অনুভব করেন। কোনো পুরুষ অভিনেতার ওপর দুষ্যন্ত চরিত্রের আরোপন কিংবা মহিলা অভিনেত্রীর ওপর শকুন্তলা চরিত্রের আরোপন কোনো রসের সঞ্চার ঘটায় না, বরং চরিত্রগুলি যদি বাস্তবে বহু পূর্বে থেকে থাকে তাহলে রসের উৎপত্তি ঘটেছে কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে তাদের মনে।

(আ) ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ : 'অনুমান' শব্দ থেকে অনুমিতি শব্দের সৃষ্টি। এই অনুমানটি করেন সহৃদয় সামাজিক। ভট্টশম্বুকের মতে, অভিনয় কালে নাটকের নট-নটীতে নায়ক-নায়িকাগত ভাবের অনুমান হয়। বিষয়টি বোঝাতে তিনি 'চিত্রতুরগন্যায়'-এর কথা বলেছেন। ছবির ঘোড়া বাস্তব বা জ্যান্ত ঘোড়া নয়, কিন্তু ছবিতে দেখে একজন দর্শক যেমন অশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, তেমনি প্রেক্ষাগৃহের দর্শক বাস্তবের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার স্থলে তাদের মতো সাজপোশাক পরা ও হাব-ভাবে দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দেখে তাদেরকেই মূল চরিত্র বলে অনুমান করে। এক্ষেত্রে দর্শক কর্তৃক স্থায়ীভাবের অনুমানই শঙ্কুকের মতে রসানুভূতি। অনুমানের সাহায্যে রস উৎপাদিত হয় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে অনুমিতিবাদ। এক্ষেত্রে রসের প্রকৃত সঞ্চার ঘটে মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে। দশক কেবল নট-নটীতে বাস্তব নায়ক-নায়িকার ভাবাদি অনুমান করেন। কিন্তু এই অনুমিতিবাদের বিরুদ্ধে অভিনব গুপ্ত বললেন, প্রতিটি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র, সেখানে এই ধরনের অনুমানের দ্বারা রসের উৎপত্তি মিথ্যা ও কষ্টকল্পনা।

(ই) ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ : 'ভোগ' শব্দটি রয়েছে 'ভুক্তি' শব্দটির মূলে। এঁর মতে, রস উৎপন্ন হয় না বা অনুমিতও হয় না, এমনকি অভিব্যক্তও হয় না, বরং রসের ভোগ বা আস্বাদন হয়। কিন্তু এই আস্বাদন করে কে? এর উত্তরে ভট্টনায়ক নায়ক-নায়িকাকে পরিত্যাগ করে পাঠকের দিকে তাকিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি নাট্যদর্শন বা কাব্যপাঠ কালে দুটি ক্রিয়ার উদ্ভবের কথা বলেছেন— একটি হল ভাবকত্ব ও অন্যটি ভোজকত্ব। যার দ্বারা রস ভাব্যমান হয় সেটি ভাবকত্ব এবং যার দ্বারা রসের ভুক্তি বা অনুভব ঘটে, সেটা হল ভোজকত্ব। ভাবকত্বের কাজ দুটি— সাধারণীকরণ এবং পার্থিব চিন্তাধারার ভার থেকে মুক্ত করে চিত্তে তন্ময়তা-বিধান। এই বিষয়টি সাহিত্যিকের দিক থেকে বিচার্য। সাধারণীকরণের ফলে দর্শকের সংকীর্ণ ব্যক্তিক বাধা লুপ্ত হয়ে যায়। এর পরের ধাপটি হল ভোজকত্ব। এই ব্যাপারটি সহৃদয় সামাজিকের, তথা পাঠক বা দর্শকের। ভোজকত্ব ক্রিয়ার দ্বারা সামাজিকগণ ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রসের নিষ্পত্তি ঘটান। এই নিষ্পতি একই বলা হচ্ছে ভোগ, যার প্রস্তুতি 'ব্রহ্মাস্বাদসবিধঃ'। ভোজকত্বের সূত্র ধর ভট্টনায়কই সর্বপ্রথম রসোৎপত্তির ক্ষেত্রে বিষয় থেকে দৃষ্টি ঘোরালেন বিষয়ীর দিকে। রসকে ইনি ব্যাখ্যা করেছেন কাব্যপাঠক বা নাট্যদর্শকের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিশ্লেষণের পথে। সাধারণীকরণকে রসোৎপত্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা এই মতবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক।

(ঈ) অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ : উপরে আলোচিত তিনটি মতবাদের ভ্রান্তি দেখিয়ে অভিব্যক্তিদের সূচনা করেছিলেন অভিনবগুপ্ত। ভ্রান্তি প্রদর্শনের অর্থ পুরোপুরি খণ্ডন নয়, সংশোধন। তাঁর মতে, রস হল একটি মানসিক ব্যাপার, যা রসিক চিত্তের পক্ষেই কেবল অনুভবগম্য। ইনি যেভাবে রসের সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যেই রয়েছে রসাভিব্যক্তির কৌশলগত পরম্পরা। সংজ্ঞাটি নিবিষ্ট ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাচ্ছে রসাভিব্যক্তির রয়েছে চারটি ধাপ। প্রথম ধাপ—লৌকিক ভাবের কারণ ও কার্যকে কবিরা সর্বদাই শব্দের মাধ্যমে রচনা করে সকল হৃদয়ের পক্ষে আবেদনযোগ্য করে তোলেন। এই রচনায় শুধু ভাবই অবস্থান করে না, থাকে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব, দ্বিতীয় ধাপে এই বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারী ভাব জাগিয়ে তোলে সহৃদয় সামাজিকের অন্তর্লোকে বাসা বেঁধে থাকা বাসনা বা সংস্কারকে। এরপর তৃতীয় ধাপে ঘটে সহৃদয় সামাজিকের সুসংবিদ আনন্দময় সৌকুমার্য লাভ, যার সঙ্গে থাকে পূর্বোক্ত বাসনার সংযোগ। আর সর্বশেষ ধাপে ঘটে আনন্দময় সংবিদের চর্বণা। এর ফলে পাঠক যা দর্শক হৃদয়ে উপচিত হয় 'রস'। ভট্টনায়ক যে ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব-এর কথা জানিয়েছিলেন অভিনবগুপ্ত তাকে মান্যতা দিয়েছেন। যিনি রচনাকার তিনি ভাবকত্বের অধিকারী, আর যিনি আস্বাদনকারী তিনি ভোজকত্বের অধিকারী। কিন্তু অভিনবগুপ্ত সহৃদয় সামাজিককে রসতত্ত্বের কেন্দ্রে রেখে Readers Respone Theory গড়ে তুলেছেন। এই তত্ত্বে সহৃদয় চিত্তই রসাভিব্যক্তির কেন্দ্র, যেখানে রসচর্বনায় সমস্ত উপাদানের একত্র সমবায় ঘটে। অভিনবগুপ্ত এইভাবে পাঠকের চৈতন্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পাঠকচিত্তেরা সাধারণীকরণে ভূমিকা গ্রহণ করেছে পূর্ব বাসনা বা সংস্কার। যে রসকে ভট্টনায়ক বলেছিলেন 'ভোজ্য', অভিনবগুপ্ত তাকে বললেন 'আস্বাদ্য', যাতে কামনা উপভাগের তুলনায় আস্বাদনজনিত তৃপ্তির কথাটাই মুখ্য হয়ে উঠল। রসের এই আস্বাদ্যমানতাকে অভিনব বললেন 'অভিব্যক্তি' 'অভিব্যক্তি'। স্থায়ীভাব ও

ব্যাভিচারী ভাব এবং বিভাব ও অনুভাব—এই চার উপাদানকে দুটি দুটি করে এক একটি বর্গে বিভক্ত করেছেন অভিনবগুপ্ত। এদের প্রথম দুটি রসচর্বনার আন্তর উপাদান এবং পরের দুটি বাহ্য উপাদান। রসাভিব্যক্তির কাছে বাহ্য উপাদানগুলি পরিণত হয় আন্তর উপাদানে। তখন বাহ্য যাবতীয় বস্তু দ্রষ্টার 'চিত্তসন্তানমাত্র'-এ পরিণত হয়। বিভিন্ন স্থায়ী ভাব থেকে যে বিভিন্ন রসের উৎপত্তি ঘটে তাদের আস্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হলেও উপলব্ধিতে তারা অভিন্ন—যেহেতু রসমাত্রেই আনন্দঘন চৈতন্যের পূর্ণতম প্রকাশ। শৈবতান্ত্রিক প্রত্যাশিকা দর্শনে যেমন সংবিৎ বা চৈতন্যের অভিব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, অভিনবগুপ্ত সেই দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জানিয়েছেন যে, কবির সৃষ্ট কাব্যের অপসারিত হয় এবং তখন হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের জাগরণ ঘটে। সহৃদয়ের চিত্ত হয়ে ওঠে দর্পণের মতো স্বচ্ছ, আর সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় সংবিৎ। আর এই সংবিদের চর্বনাই হল রস বা রসের আস্বাদন। রসের প্রকৃতি অলৌকিক এবং তার অনুভূতি অখণ্ড। কোনো লৌকিক কারণকে আশ্রয় করে কবি কাব্যে অলৌকিক চিত্র উপস্থাপন করেন। কাব্যপাঠকালে ওই অলৌকিক চিত্র সহৃদয়ের চিত্তে রসের অভিব্যক্তি ঘটায়, যা আর লৌকিক পর্যায়ে থাকে না। একইভাবে রসানুভূতির সময় তদ্গত অবস্থায় আত্মা অবস্থান করে পূর্ণ বা অখণ্ড অবস্থায়, তাই চিত্তে যে রসের জাগরণ ঘটে তার প্রকৃতি হয়ে ওঠে অখণ্ড।

২০.৬ সংক্ষিপ্তসার

আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এ রসবাদের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা, আর এর চূড়ান্ত স্থাপনা আচার্য অভিনবগুপ্তের 'অভিনব-ভারতী'তে। 'রস কী?'—এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন 'আস্বাদত্বোৎ' বলে। এর অর্থ যা আস্বাদনীয় সেটাই হল রস। ব্যঞ্জন দ্বারা পরিবেশিত খাদ্য যেমন ভোক্তার মনে আনন্দ সঞ্চার করে, তেমনি নানা ভাবের দ্বারা প্রস্তুত কাব্য রসিকের মনে রসের আস্বাদন জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এই আস্বাদন কীভাবে সম্ভব? তার উত্তরে ভরত বলেছেন—বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাবের সংযোগ ঘটলে রসনিষ্পন্ন হয়। তবে এই তিনের আগে আছে আর এক অত্যাবশকীয় উপাদান, যাকে ভরত বলেছেন স্থায়ীভাব। যে সমস্ত হৃদয়জাত ভাব বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির দ্বারা বিনষ্ট হয় না, যারা বিভাব-অনুভাবকে স্বীয়রূপতা প্রাপ্ত করায়, চিরকাল যারা চিত্তে অবস্থান করে ও রসপদবী প্রাপ্ত হয়, তারাই স্থায়ীভাব। ভরত স্থায়ীভাবের পরিমাণ আটটি নির্দেশ করলেও পরবর্তীকালে আরো একটি সংযুক্ত হয়ে মোট নয়টি স্থায়ীভাব অলংকারশাস্ত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে। এগুলি হল রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম। এরা যথাক্রমে রূপান্তরিত হয় শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, ভীবৎস, অদ্ভুত শান্ত রসে। স্থায়ীভাবের পরে উল্লেখ্য বিভাব। লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক, কাব্য ও নাটকে সেটাই বিভাব বলে কথিত। বিভাব প্রকৃতিভেদে দুই প্রকার। এরা যথাক্রমে উদ্দীপন আর আলম্বন। বাহ্যিক যেসব কারণ রসকে উদ্দীপিত করে সেগুলি উদ্দীপন বিভাব, আর যাকে অবলম্বন করে রস সৃষ্টি হয়, সেটি আলম্বন বিভাব। এভাবে মনে ভাবের উদয় ঘটলে যে সমস্ত স্বাভাবিক আঙ্গিক বিকারে ও উপায়ে তা

বাইরে প্রকাশিত হয়, ভাবরূপ কারণের সেইসব লৌকিক কার্যকেই কাব্যে এবং নাটকে বলা হয় অনুভাব। আর ব্যাভিচারী ভাব হল স্থায়ীভাবকে পরিপুষ্টি দানের জন্য যেসব ভাব তাৎক্ষণিক ভাবে মনে আনাগোনা করে। এরা স্থায়ীর অভিমুখে বিচরণ করে বলে এদের নাম দেওয়া হয়েছে ব্যাভিচারী বা সঞ্চারী। এদের মোট সংখ্যা তেত্রিশটি।

সহৃদয় সামাজিকের দিক থেকে কীভাবে রসের নিষ্পত্তি ঘটে, তা নিয়ে আচার্য ভরত কোনো পদনির্দেশ দিয়ে যাননি। সেজন্য পরবর্তী আলংকারিকরা এ বিষয়টি সম্পর্ক নানা জনে নানা মত দিয়েছেন এবং সেভাবে চারটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম মতবাদটির নাম উৎপত্তিবাদ। এর স্রষ্টা ভট্টলোল্লট। এর মতে, কাব্য বা নাট্যে যে-রস উৎপন্ন হয় তা আসলে বাস্তব চরিত্রের মধ্যেই ঘটে। দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রণয়োপাখ্যানে বাস্তবের দুষ্যন্ত ও বাস্তব শকুন্তলার হৃদয়ে রতিভাবের জাগরণ ঘটেছিল। তারপর নানা বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর সহায়তায় তারা শৃঙ্গার রসের আনন্দ উপভোগ করেছিল। দ্বিতীয় মতবাদটি হল ভট্টশঙ্কুরের অনুমিতিবাদ। ইনি অনুকার্য উক্ত দুই চরিত্র নয়, বরং অনুকর্তা নাটকের অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মধ্যে রসোৎপত্তির কথা বলেন। নাট্য অনুকৃতি থেকে সহৃদয়ের মনে স্থায়ীভাবের অনুমানই এঁর মতে রসানুভূতি। তৃতীয় মতবাদ ভুক্তিবাদ। এর প্রবক্তা ভট্টনায়ক। এই রসের আলোচনায় বিষয়ীকে প্রথম গুরুত্ব দেন। তাই সহৃদয় সামাজিকের চিত্তবৃত্তির প্রসঙ্গ উঠে আসে এঁর আলোচনায়। দর্শক কিংবা পাঠক ভোজকত্ব গুণের অধিকারী হয়ে ভোগ করেন রস। পরবর্তী আলংকারিক অভিনবগুপ্ত এই ভট্টনায়কের দ্বারাই সর্বাধিক পরিমাণে প্রভাবিত হন। তাঁর মতবাদের নাম অভিব্যক্তিবাদ। এই মতবাদে রসনিষ্পত্তির চারটি ক্রম স্তরের কথা বলা হয়েছে। লৌকিক ভাবের কারণ ও কার্যকে কবিরা প্রথম শব্দে সমর্পিত করে সকল হৃদয়ে সমবাদী ও সমতাধর্মী সুন্দর বিভাবানুবাদীর সৃষ্টি করেন। পরের ধাপে এইসব বিভাব-অনুভাব সহৃদয়ের চিত্তবাসনাকে জাগ্রত করে। এরপর বাসনা জাগৃতির দ্বারা চিত্তের সামাজিক সত্তার খণ্ডীকরণ অবস্থায় সৃষ্টি হয় এবং সর্বশেষ ধাপে চিত্তের রজোগুণ ও তমগুণ দূরীভূত হয়ে সত্ত্বগুণে অন্তঃকরণ অধিষ্ঠিত হলে স্বসংবিদের বর্ণনায় রসের আস্বাদনে চিত্ত আনন্দময় হয়ে ওঠে। এভাবে ভরতের রসসূত্রের ব্যাখ্যাতা হিসেবে অভিনবগুপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর অভিব্যক্তিবাদ এ বিষয়ক চূড়ান্ত মতবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

২০.৭ প্রশ্নাবলী

(ক) অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—বক্তব্যটি কার?

২. 'রস' শব্দের আদি প্রয়োগ কোথায় ঘটেছে?

৩. 'সহৃদয় সামাজিক' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

৪. 'চিত্তবিশ্রান্তি' কী?

৫. অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবগুলির নাম লিখুন।

৬. আলংকারিক রাজশেখরের গ্রন্থের নাম কী?

৭. 'ন ভাবহীনহস্তি রসঃ ন রসঃ ভাববর্জিতঃ।' —বক্তব্যটি কার?

৮. 'ভাব' শব্দটির ধাতুমূল কী?

৯. ব্যভিচারী ভাবগুলিকে সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে কে তুলনা করেছেন?

১০. 'চিত্রতুরঙ্গ ন্যায়' বলতে কী বোঝায়?

১১. বিশ্বনাথ কবিরাজের গ্রন্থের নাম কী?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১. ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রস্থান গড়ে ওঠার কারণ কী?

২. 'রস' কী? নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লিখুন।

৩. 'কাব্য ও রসের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ।' — কে একথা বলেছেন? কেন বলেছেন?

৪. রসের প্রকৃতি নির্দেশ করুন।

৫. রসের প্রকৃত অবস্থান কোথায়? এ বিষয়ে তোমার সুচিন্তিত অভিমত দিন।

৬. অভিনব গুপ্ত অনুসারে রসের সংজ্ঞা দিন।

৭. রসনিষ্পত্তি বিষয়ে আচার্য ভরতের সূত্রটি উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে দিন।

৮. বিভাব কী? বিভাব কত প্রকার? প্রতিটি বিভাবের পরিচয় দিন।

৯. অনুভাব কাকে বলে? দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করুন।

১০. স্থায়ীভাব কত প্রকার ও কী কী? স্থায়ীভাব সম্পর্কে তোমার ধারণা বিবৃত করুন।

১১. ব্যভিচারী ভাব সম্পর্কে টীকা লিখুন।

১২. ভট্ট লোল্লটের উৎপত্তি বাদ ব্যাখ্যা করুন।

১৩. অনুমিতিবাদের প্রবক্তা কে? তাঁর মূল বক্তব্য কী?

১৪. ভট্ট নায়ক 'ভুক্তি' বলতে কী বুঝিয়েছেন? তিনি যে দুই প্রকার ক্রিয়ার কথা বলেছেন সেগুলি কী কী?

১৫. অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ ব্যাখ্যা করো এবং এটিকে রসনিষ্পত্তি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মতবাদ বলা হয়েছে কেন যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

(গ) বিস্তৃত উত্তরাভিত্তিক :

১. রস সম্পর্কে তোমার ধারণা বিশদে লিখুন।

২. রসের চতুর্বিধ উপাদান বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৩. রসসৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে যে চারটি মতবাদ আছে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৪. সংক্ষেপে রসপ্রস্থান বিষয়ে আলোচনা করুন।

২০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. কাব্যতত্ত্ব বিচার—দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
২. প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা— বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
৩. রসসমীক্ষা—রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
৪. কাব্য পরিমতি—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
৫. ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব : একটি আলোকিত অধ্যায়— তরুণকুমার মৃধা।
৬. কাব্যালোক—সুধীরকুমার দাশগুপ্ত।
৭. সাহিত্যদর্পণ—বিশ্বনাথ কবিরাজ (বঙ্গানুবাদ—বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়)
৮. ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব—অবন্তীকুমার সান্যাল।

NOTE

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....